মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে অভিযোগের তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

২

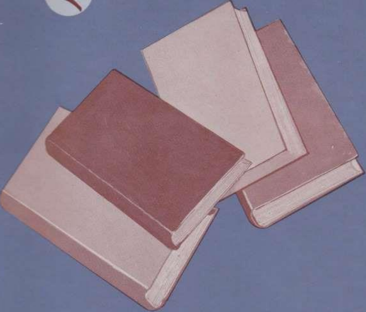

মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ ইউসুফ

www.pathagar.com

মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে অভিযোগের তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

২য় খণ্ড

মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ ইউসুফ

অনুবাদ ঃ মুহাম্মাদ আবদুল আযীয

সম্পাদনা ঃ আবু আশরাফ

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ১৭০

২য় প্রকাশ

রবিউস সানি	১৪২৫
জ্যৈষ্ঠ	১৪১১
মে	২০০৪

নির্ধারিত মূল্য : ৯০.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

مولانا مودودی پر اعتراضات کا علمی جائزہ -এর বাংলা অনুবাদ

MAOLANA MAUDUDIR BIRODDA OVEJOGAR TATTIK PORJALOCHONA by Maolana Mofti Mohammad Yousuf. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Fixed Price : Taka 90.00 Only.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমাদের কথা

কুরআন সুন্নাহে চিন্তা তথা ফিক্‌র ও তাফাক্‌কুরের প্রতি মুসলমানদের বিশেষভাবে তাকীদ করা হয়েছে। তাইতো দেখা যায়, সর্বযুগেই মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী চিন্তাবিদদের আবির্ভাব ঘটেছে। বিশেষভাবে, প্রাথমিক হিজরী শতাব্দীগুলো ছিল মুসলমানদের চিন্তা গবেষণার সোনালী যুগ।

কুরআন হাদীসকে ভিত্তি করেই সর্বযুগে চিন্তা গবেষণা হয়েছে। সকল মুসলিম মুজতাহিদ ও চিন্তাবিদদেরই চিন্তা গবেষণার মূল উৎস ছিল কুরআন ও সুন্নাহ। এ দুটোর ভিত্তিতেই তারা চিন্তা গবেষণা করে খুটিনাটি বিষয় সমূহ এবং সমকালীন সমস্যাবলীর সমাধান দিয়েছেন।

কিন্তু দেখা গেছে সাহাবায়ে কিরামের (রা) যুগ থেকেই খুটিনাটি ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ের চিন্তা গবেষণার ক্ষেত্রে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়ে আসছে। মতপার্থক্য বুনিয়াদী বিষয়ে হয়নি, হয়েছে প্রাসংগিক বিষয়ে। মতপার্থক্যের কারণে এসব খুটিনাটি বিষয়ে আমলের পার্থক্য হয়ে আসছে সেই প্রাথমিক যুগ থেকে।

কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীগণ কখনো মতপার্থক্যের জন্যে কাদা চোড়াচুড়ি করেননি। তাঁরা পরস্পরের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়ে বেড়াননি। বরং ইজতিহাদী মতপার্থক্যকে তাঁরা সবসময়ই কল্যাণকর (রহমত) হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

ইদানিং কালে মুসলমানদের মধ্যে পরমত সহিষ্ণুতা হ্রাস পেয়েছে। বিগত কয়েক শতাব্দী চিন্তাগবেষণার ক্ষেত্রে তাদের পিছিয়ে থাকাই এর মূল কারণ।

কুরআন সুন্নাহের আলোকে যুগ সমস্যার সমাধান পেশ করেছেন বর্তমান বিশ্বের সেরা ইসলামী চিন্তা নায়ক মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)। এ মহান কাজ করতে গিয়ে কারো কারো সাথে তাঁর মতের পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। আর এসব মতপার্থক্য নেহায়েতই খুটিনাটি ও প্রাসংগিক বিষয়ে। যেমনটি হয়েছিল অতীতের বুযুর্গদের মধ্যে।

www.pathagar.com

এসব মতপার্থক্যের কারণে কিছু লোক তাঁর বিরোধিতা করেছেন। কারো বিরোধিতার ধরন আবার চরম আকারে। মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের এই গ্রন্থটি থেকে বুঝা যাবে, এসব বিরোধিতার ধরন কি?

তাই যারা বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করেন না, বরঞ্চ ইসলামী কল্যাণই তাদের কাম্য–এমন সব শিক্ষিত সমাজকে গ্রন্থটি মনযোগের সাথে অধ্যয়ন করার আবেদন রইলো। আশা করি এর ফলে তাঁরা একটা সঠিক মত প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন।

৮–১২–৯০ইং

আবদুস শহীদ নাসিম

পরিচালক

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী ঢাকা।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

তাকলীদ প্রসংগ ১৭
প্রাসঙ্গিক আলোচনা ১৭
ঈমানের মূল দাবী ১৮
তাকলীদের ব্যাখ্যা ২৫
মাসআলার বিতর্কিত বুনিয়াদ ঃ মাফযূলের তাকলীদ ২৬
অজ্ঞ লোকদের তাকলীদ ২৯
উপরোক্ত ব্যাখ্যার সারমর্ম ৩১
পরিবর্তনের শর্তাবলী ও বিশদ বিবরণ ৩২
হানাফীগণের তত্ত্বপূর্ণ গবেষণা ৩৩
আবু বকর জওযজানীর (র) ফত্ওয়া ৩৩
আল্লামা শরনুলালীর (র) অভিমত ৩৫
তিনটি বিষয়ের প্রমাণ ৩৬
ইবনে হুমামের ব্যক্তিগত অনুরাগ ৩৭
একটি অভিযোগ ৩৯
জবাব ৪০
প্রথম জবাব ৪০
দ্বিতীয় জবাব ৪১
তালফীকের ব্যাখ্যা ৪৩
তৃতীয় জবাব ৪৫
চতুর্থ জবাব ৪৫
বিগত আলোচনার সারমর্ম ৪৬
একটি ব্যাখ্যামূলক নোট ৪৮
শাফঈ ও মালেকী আলেমগণের তত্ত্বভিত্তিক উপস্থাপনা ৪৯
ইমাম শা'রানীর দৃষ্টিতে মযহাবের পরিবর্তন ৪৯
মযহাব পরিবর্তন বিষয়ে ইমাম ইবনে আবদুল 'বার' এর অভিমত ৫১
মযহাব পরিবর্তন বিষয়ে ইমাম কিরাফীর (র) অভিমত ৫২
মযহাব পরিবর্তন ব্যাপারে ইমাম যিনাতীর (র) অভিমত ৫২
নির্দিষ্ট করণের দাবী ৫৩
ইমাম সুয়ুতির (র) বিস্তারিত ফত্ওয়া ৫৪
প্রথম প্রকার ৫৪
দ্বিতীয় প্রকার ৫৫
তৃতীয় প্রকার ৫৬
চতুর্থ প্রকার ৫৭

www.pathagar.com

পঞ্চম প্রকার ৫৮
ষষ্ঠ প্রকার ৫৯
মালেকী ও শাফেঈ মতাবলম্বীদের এ সম্পর্কিত দর্শণের সারমর্ম ৬০
মযহাব অনুসরণের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ৬১
একটি বিশ্লেষণধর্মী বিষয় ৬২
কুরআনের আয়াত ৬৩
তত্ত্বজ্ঞানী আলেমদের বিশ্লেষণ ৬৫
ইবনে ওমর (রাঃ) এবং একজন সিরিয় লোকের কথোপকথন ৬৬
দ্বিতীয় ঘটনা ৬৮
আল্লামা তীবীর (র) অভিমত ৭০
আল্লামা সিন্ধীর (র) অভিমত ৭১
জায়েয ও না-জায়েয তাকলীদ ৭১
হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহর (র) মন্তব্য ৭২
জায়েয ও না-জায়েয তাকলীদ ৭৩
ইবনে হযমের ফত্ওয়া এবং এর উপর শাহ্ সাহেবের পর্যালোচনা ৭৫
তাকলীদ প্রসংগে মাওলানা মওদূদীর (র) দৃষ্টিভংগী ৭৮
অজ্ঞ লোকের তাকলীদ ৭৯
আলেম লোকের তাকলীদ ৭৯
মযহাব পরিবর্তনের দৃষ্টিভংগী ৮১
না-জায়েয তাকলীদ ৮১
মাওলানার (র) রায়ের সারমর্ম ৮২
এ দৃষ্টিভংগী কি অপরাধমূলক ৮৪
ইনসাফের আজব মহড়া ৮৪
এটা কোনো নতুন কথা নয় ৮৫
হায় রে আক্ষেপ ৮৫
তাকলীদ প্রসংগে তিনটি দৃষ্টিভংগী ৮৭
সত্যের নিকটতম দৃষ্টিভংগী কোন্টি? ৮৮
শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার (র) অভিমত ৯১
দলীল প্রমাণ উদ্ভাবনে সক্ষম আলেমদের কর্তব্য ৯৪
কাংমল মুজতাহিদের কর্তব্য ৯৪
আলোচনার শেষ কথা ৯৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

রমযান মাসে সাহরীর সময় প্রসংগ ৯৬
পর্যালোচনা ৯৭
প্রথম অংশ ৯৭
দ্বিতীয় অংশ ৯৭

www.pathagar.com

সংখ্যা গরিষ্ঠতা এবং সংখ্যা লঘিষ্ঠতা ৯৮
অভিযোগটি ৯৯
অভিযোগ টি প্রাণবন্ত ও যথার্থ কি? ৯৯
মাসআলার শরঈ মর্যাদা ১০০
ঐক্যমতের (ইজমা) দাবী ১০৪
হানাফীদের দৃষ্টিভঙ্গি ১০৫
আল্লামা ইবনে আবেদীন শামীর ব্যাখ্যা ১০৬
ঈনায়া গ্রন্থকারের ব্যাখ্যা ১০৬
মোল্লা আলী কারীর (র) ব্যাখ্যা ১০৭
'খুলাসাতুল ফত্ওয়া' গ্রন্থকারের ব্যাখ্যা ১০৭
শায়খুল মাশায়েখ মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহীর (র) অভিমত ১০৮
আল্লামা ইবনে রুশ্দ মালেকীর প্রমাণ্য অভিমত ১১০
ইবনে রুশ্দের আলোচনার সারকথা ১১২
মতপার্থক্যের উৎসধারা ১১৪
প্রথম অভিমতের সমর্থন ১১৫
দ্বিতীয় মতের সমর্থন ১১৬
ইবনে ওমরের (রা) হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা আইনীর পর্যালোচনা ১১৯
ইবনে ওমরের হাদীস ১১৯
প্রশ্ন ১১৯
জবাব ১২০
দ্বিতীয় জবাব ১২১
জবাবের সারকথা ১২২
এরই নাম কি ইনসাফ ? ১২২
(নসখ্) রহিত হওয়ার দাবী ১২২
দলীল সমূহের সারমর্ম ১২৫
প্রথম দলীল ১২৫
দ্বিতীয় দলীল ১২৫
তৃতীয় দলীল ১২৫
'নখ্স' হওয়ার দাবীর পর্যালোচনামূলক সমীক্ষা ১২৬
একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাখ্যা ১২৮

তৃতীয় অধ্যায়

দু' সহোদরা বোনকে একত্রে বিবাহ করা প্রসংগ ১৩২
সতর্ক বাণী ১৩২
প্রকৃত ঘটনার স্বরূপ ১৩৩
মাওলানা মওদূদীর (র) জবাব ১৩৫
ব্যক্তিগত অভিমত ১৩৭

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ১৩৮
প্রথম তত্ত্ব ১৩৮
দ্বিতীয় তত্ত্ব ১৩৯
প্রথম তত্ত্বের ব্যাখ্যা ১৩৯
অপর একটি আয়াত ১৪০
একটি হাদীস ১৪১
দ্বিতীয় তত্ত্বের ব্যাখ্যা ১৪২
কুরআনী আহকাম এবং ব্যতিক্রম ১৪২
প্রথম উদাহরণ ১৪২
দ্বিতীয় উদাহরণ ১৪৪
ফকীহগণও এ নীতি সমর্থন করেছেন ১৪৫
প্রথম উদাহরণ ১৪৫
দ্বিতীয় উদাহরণ ১৪৭
দ্বিতীয় প্রকার ১৪৯
অভিযোগ ১৪৯
তিনটি জবাব ১৫০
দ্বিতীয় জবাব ১৫১
কারণ যুক্ত হুকুমের বিধান ১৫২
প্রথম উদাহরণ ১৫২
দ্বিতীয় উদাহরণ ১৫৩
তৃতীয় জবাব ১৫৭
উসুলে ফেকাহের একটি বিধান ১৫৭
দু'বোনকে একত্রে বিবাহ করা সম্পর্কে ইমামদের অভিমত ১৫৯
মতপার্থক্যের ব্যাখ্যা ১৬০
অভিযোগকারী হযরতগণের কাছে একটি আরজ ১৬২

চতুর্থ অধ্যায়

বিনা অজুতে তিলাওয়াতের ছিজদা করার প্রসঙ্গ ১৬৪
অভিযোগ ১৬৪
ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ১৬৫
অনুপ্রেরণা মূলক হাদীস ১৬৭
ফে'লি (বাস্তব) হাদীস সমূহ ১৬৮
বিনা ওযুতে সিজদায়ে তিলাওয়াতের হাদীস ১৭০
ব্যাখ্যা ১৭০
প্রথম কারণ ১৭১
দ্বিতীয় কারণ ১৭১
প্রথম যুগের বুযর্গদের মতে বিনা অযুতে সিজদায়ে তিলাওয়াত করা জায়েষ ১৭২

www.pathagar.com

হাদীস বিশারদদের ব্যাখ্যা সমূহ ১৭৩
উপরোল্লিখিত বাক্যের সারকথা ১৭৪
হযরত মাওলানা আনোয়ার শাহ সাহেবের (র) ব্যাখ্যা ১৭৫
হাদীস ব্যাখ্যাকারীগণের দৃষ্টিতে ইমাম বুখারীর অভিমত ১৭৬
জবাবের সারকথা ১৭৮
সাঈদ বিন মুসাইয়্যিবের (র) অভিমত ১৭৯
শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা কোনো মৌলিক মাসআলা নয় ১৮১
মৌলিক মাসায়েলের প্রকৃতি ১৮২
অভিযোগের জবাব ১৮৩
প্রথম ধারা ১৮৪
দ্বিতীয় ধারা ১৮৫
জবাব ১৮৫
তৃতীয় ধারা এবং তার জবাব ১৮৬
দাঁত ভাঙ্গা জবাব ১৮৮
চতুর্থ ধারা এবং তার জবাব ১৮৯
একটি সত্যের প্রকাশ ১৯১
শেষ নিবেদন ১৯২

পঞ্চম অধ্যায়

মুতআ প্রসংগ ১৯৪
মূল ঘটনা ১৯৫
সিরাতে মুস্তাকীম ২০১
মুতআ ২০২
মাওলানা মওদূদী সাহেবের (র) মূল বাক্য ২০৫
বাক্যের উদ্দেশ্য ২০৬
অপর একটি বিষয়তা ২০৭
উভয় কথাই ভুল ২০৮
প্রথম কারণ ২০৮
পর্যালোচনার সারমর্ম ২০৯
দ্বিতীয় কারণ ২১০
চোখ খুলে দেখুন ২১১

ষষ্ঠ অধ্যায়

মু'আল্লাকাতি কুলূব (মনের আসক্তি) প্রসংগ ২১২
পর্যালোচনা ও ব্যাখ্যা ২১৩
উপরোক্ত সমালোচনার ব্যাখ্যা ২১৪
লেখক সাহেবের মন্তব্যের ফলাফল ২১৬

www.pathagar.com

ইমাম আযমের (র) অভিমত ২১৭
ইমাম মালেকের (র) অভিমত ২১৮
একটি রেওয়ায়েত ২১৮
ইমাম আহমদের অভিমত ২১৮
ইমাম শাফেঈর (র) অভিমত ২১৮
ইমাম শাফেঈকে (র) ইজমা অস্বীকারকারী ঘোষণা করা হবে ? ২১৯
হাসান বসরী (র) এবং ইবনে শিহাব যাহরী (র) ২২০
পাঠকবর্গের কাছে অনুরোধ ২২২

সপ্তম অধ্যায়

'ঈলা' প্রসংগ ২২৪
'ইযাহে ফাতওয়া' রচইতা কর্তৃক সমালোচনা ২২৫
মালেকী মতাবলম্বী উক্তি সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য
বজায় রাখার একটি আযব ব্যাখ্যা ২২৮
মত পার্থক্যের সার কথা ২২৯
মাওলানা মওদূদীর অভিমত ২২৯
ইযাহে ফাতওয়ার লেখকের অভিমত ২২৯
কোন্‌টি হক এবং সত্য নির্ভর ২২৯
মালেকী আলেমের ফয়সালা ২৩০
ইবনে রুশদ মালেকীর ব্যাখ্যা ২৩২
ইযাহে ফাতওয়ার লেখকের ব্যাখ্যার সমালোচনা ২৩৩
এই ব্যাখ্যা দুর্বল ২৩৪
শাফেঈ (র) মতাবলম্বীদের ব্যাখ্যা সমূহ ২৩৫
ইমাম শা'রানীর (র) তাঁর রচিত গ্রন্থ 'মিযান' এ বলেছেন ২৩৬
ইমাম শা'রানীর কথা অধিক নির্ভরযোগ্য ২৩৬
ন্যায়পরায়ণ হযরতগণের উপর এর সঠিক ফয়সালার দায়িত্ব ২৩৭
মাওলানা মওদূদীর রায় ২৩৭
শেষ নিবেদন ২৩৮
একটি সম্পূরক নিবেদন ২৪০
দোয়া ২৪১

অষ্টম অধ্যায়

খোলা প্রসংগ ২৪২
প্রাথমিক বিষয় ২৪৩
খোলার ইদ্দতের বিশদ আলোচনা ২৪৪
সংখ্যা গরিষ্ঠের দলিল ২৪৬
সংখ্যা লঘুর দলীল ২৪৬

www.pathagar.com

নকলী দলীল ২৪৭
বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল ২৫০
দলীল সমূহের পর্যালোচনামূলক আলোচনা ২৫২
প্রথম কারণ ২৫২
দ্বিতীয় কারণ ২৫৩
একঃ যাদের সাথে স্বামী মিলিত হয়নি ২৫৪
দুইঃ না-বালেগ স্ত্রী ২৫৪
তিনঃ পূর্ণ বয়স্কা স্ত্রীলোক ২৫৪
চারঃ গর্ভবতী স্ত্রীলোক ২৫৫
পাঁচঃ বাদী বা ক্রীতদাসী স্ত্রী ২৫৫
তৃতীয় কারণ ২৫৬
হাদীসটির একটি ব্যাখ্যা ২৫৬
ব্যাখ্যাটি সহীহ নয় ২৫৭
প্রথম কারণ ২৫৭
দ্বিতীয় কারণ ২৫৮
তৃতীয় কারণ ২৫৯
আলোচনার সারমর্ম ২৬০
মাওলানা মওদূদীর (র) ব্যাখ্যা সমূহ ২৬১
প্রশ্ন ২৬১
জবাব ২৬২
এই কি ইনসাফের দাবী ? ২৬৩
ভুল এবং বিভ্রান্তি নিরূপণের একটি ভ্রমাত্মক মাপকাঠি ২৬৪
দ্বিতীয় কথা ২৬৫
শরীয়ত মেয়েদেরকে খোলার অধিকার দিয়েছে কি? ২৬৫
মূল বক্তব্যে প্রত্যাবর্তন ২৬৬
খোলা সম্পর্কে মাওলানা মওদূদীর (র) ব্যাখ্যা সমূহ ২৬৭
খোলার ক্ষেত্রে প্রথম যুগের উদাহরণ সমূহ ২৭২
খোলার আহকাম ২৭৬
খোলা মাসআলার মৌলিক ভুল ২৮৩
খোলার মাসআলায় কাযীর ক্ষমতা ২৮৫
ইসলামী ফকীহদের অভিমত সমূহ ২৮৮
ইমাম আবু হানিফা, শাফেঈ এবং ইমাম আহমদের (র) অভিমত ২৮৮
ইমাম মালেক (র), ইমাম আওযাঈর (র) ও ইমাম ইসহাকের (র) অভিমত ২৮৮
মতপার্থক্যের সারমর্ম ২৯০
আলোচ্য মাসআলার স্বপক্ষীয় দলীল সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ২৯২
প্রথম দলীল ২৯২

www.pathagar.com

দ্বিতীয় দলীল ২৯২
তৃতীয় দলীল ২৯৩
চতুর্থ দলীল ২৯৩
পঞ্চম দলীল ২৯৩
ষষ্ঠ দলীল ২৯৩
সংকলকের পক্ষ থেকে সপ্তম দলীল ২৯৪
সারকথা ২৯৬

নবম অধ্যায়

সাহাবায়ে কেরামের ভ্রান্তি প্রসংগ ২৯৭
হুযুর (সাঃ)–এর বাণী সমূহ বুঝতে সাহাবাগণ
ভুল করতে পারেন কি? ২৯৯
বিষয়াশ্রয়ী ব্যাখ্যা ৩০২
ভুল বুঝার প্রকার ৩০২
ইজতেহাদী ভুল বুঝা ৩০২
বক্তব্যের সারমর্ম অনুধাবন ভ্রান্তি ৩০৩
প্রথম উদাহরণ ৩০৩
হাদীসের অর্থ ও সারমর্ম ৩০৪
দ্বিতীয় উদাহরণ ৩০৬
তৃতীয় উদাহরণ [স্থান পরিবর্তনে ইখতিয়ার প্রসংগ] ৩০৯
নবীর কথা শুনতে ভুল করা ৩১২
প্রথম প্রকারের উদাহরণ [দু' ঈদের একত্রিত হওয়ার প্রসংগ] ৩১২
হাদীসের মূল শব্দাবলী কি? ৩১৪
হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহীর (র) ব্যাখ্যা ৩১৬
দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ ৩১৯
আলেমদের উক্তি সমূহ ৩২০
প্রথম ব্যাখ্যা ৩২০
দ্বিতীয় ব্যাখ্যা ৩২১
তৃতীয় ব্যাখ্যা ৩২১
সাহাবীদের প্রতি ভুল বুঝা সম্বোধন করার আরো একটি উপমা ৩২৪
আসহাবে কাহাফ ৩২৫
উপরোল্লিখিত আলোচনা সারাংশ ৩২৭
সমালোচনা ৩২৭
ফলাফল ৩২৮
শিক্ষণীয় বিষয় ৩২৯
অভিযোগকারী হুযুরানদের প্রতি একটি জিজ্ঞাসা ৩৩০

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

তাকলীদ প্রসংগ

যে সমস্ত খুটী-নাটি মাসআলায় মওলানা মওদূদী (র)-এর তাহ্‌কীক ও গবেষণার সাথে বিভিন্ন মহল থেকে মতবিরোধ প্রকাশ করা হয়েছে তন্মধ্যে তাক্লীদ প্রসংগ অন্যতম। এ ব্যাপারে অভিযোগের সুরে বলা হয় যে, তাকলাদ প্রসংগে মওলানা মওদূদীর (র) নীতি ও দৃষ্টিভংগী কেবল ভুলই নয় বিভ্রান্তিকরও বটে কারণ মওলানা মওদূদীর (র) রচনা ও গ্রন্থাবলীর আলোকে স্পষ্টত প্রমাণিত হয় যে, তাঁর মতে ওলামাদের জন্যে কোনো ইমামের তাকলাদ করা শুধুমাত্র নাজায়েজই নয়, বরং প্রকাশ্য শির্কেরও অন্তর্ভুক্ত। অথচ আহলে হাদীসের একটি ক্ষুদ্র অংশ ব্যতীত অবশিষ্ট গোটা আলেম সমাজ প্রচরিত চার মজহাবের তাকলীদ করা কেবল জায়েযই মনে করেন না, তাঁরা বরং কোনো না কোনো ফিকাহ্‌ভিত্তিক মজহাবের সাথে কার্যত জড়িতও। এমতাবস্থায় তাকলীদ করা যদি না-জায়েয হয় কিংবা শির্ক সাব্যস্থ হয়, তাহলে যেসকল আলেম ও মাশায়েখ কোনো না কোনো ইমামের অনুসারী এবং ফিকহী মযহাবের সাথে সম্পৃক্ত তাঁদেরকে একটি না-জায়েয কাজের অপরাধী এমনকি মুশরিক গণ্য ব্যতীত উপায় থাকে না। আর এটা এমনি এক অবাঞ্ছিত দুঃসাহস যা কোন আল্লাহ্‌ভীরু আলেম তো দূরের কথা একজন সাধারণ মুসলমানের কাছ থেকেও আশা করা যায় না। উপরন্তু মাওলানার মযহাবগত ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গিও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়; যেহেতু তিনি না আহ্‌লে হাদীস, না মুকাল্লিদ। এটা দুই কারণে। প্রথমত, যাবতীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ আহ্‌লে হাদীস মসলক তিনি সহীহ শুদ্ধই মনে করেন না। দ্বিতীয়ত, তাঁর দৃষ্টিতে তাক্লীদ করা নাজায়েযই নয়; বরং সর্বনাশা শিরকেরও পর্যায়ভুক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য অপবাদ সারগর্ভ ও ন্যায়নিষ্ঠ কি না, নাকি এটি মাওলানা মওদূদীর মহান ব্যক্তিত্ব ঘায়েল করা, তদুপরি মযহাবের নামে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত একটি দ্বীনী জামায়াত যোগদান বা সমর্থন থেকে জনমনে

www.pathagar.com

বিভ্রান্তির ধূম্রজাল সৃষ্টির অন্তরালে উত্তেজনাকর প্রচারণার এক শাণিত হাতিয়ার সে আলোচনার পূর্বে মযহাবী তাকলীদের হাকীকত তথা স্বরূপ এবং এর শরঈ মর্যাদার বিষয়ে আলোকপাত করা আমরা জরুরী মনে করি। উপরন্তু চার মযহাবের সাথে সংশ্লিষ্ট অতীতের বরণীয় আলেম সমাজের তাকলীদ সম্পর্কিত উক্তি ও সিদ্ধান্তের অবতারণাও এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হওয়ার কথা নয়। অতপর তাঁদের সুস্পষ্ট ফয়সালার আলোকে মাওলানা মওদূদীর (র) ফিক্হী মসলক যা তাঁর নিজস্ব রচনাবলী থেকে উদ্ভাসিত হয় তুলনামূলক বিশ্লেষণ হওয়া দরকার যে, সেসব ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত। এর পরই সহজ সরল গতিতে ফুটে উঠবে আজ পর্যন্ত মাওলানার বিরুদ্ধে এ সম্পর্কিত রটানো অপবাদ-অভিযোগের সারবত্তা কতটুকু এবং সে সবের তত্ত্ব ও তথ্যগত মানই বা কোন্ পর্যায়ের।

ঈমানের মূল দাবী

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা আমরা এটাও পরিষ্কার করে দিতে চাই যে, একজন মুমিন যখন ঈমান নামার সম্পদ ও নেয়ামত লাভ করেন, তখন দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসাবে তাঁর ওপর সর্ব প্রথম যে বিষয়গুলো আরোপিত হয় এবং ঈমানের পর প্রথম স্তরে যা আদায় করা জরুরীরূপে পরিগণিত হয় তা নিম্নরূপঃ

একঃ মুমিন সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ ও রসূলের আহকামের অনুসরণ করবে। ঈমানের দাবীর খেলাফ যা আল্লাহর সাজা প্রাপ্তিরকরণ ঘটে এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের পরিবর্তে অসন্তুষ্টি ও গজব নাযিলের আশংকা থাকে সর্বাবস্থায় এ জাতীয় কার্যকলাপ, আচার আচরণ পরিহার করে চলবে। এটাই ঈমানের মূল দাবী এবং মুমিনের অবশ্য কর্তব্য। আর যথাযথ কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে সে দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়া তার জন্য অপরিহার্য।

দুইঃ মুমিনের সে দায়িত্ব সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করার লক্ষ্যে প্রয়োজন হলো সর্বাগ্রে কুরআন, হাদীস ও অন্যান্য শরঈ ইল্‌ম যথেষ্ট পরিমাণে অর্জন করা। ইল্‌ম হাসিল করার পর জীবনের প্রতিক্ষেত্রে কুরআন হাদীসের পথ নির্দেশনা অনুসন্ধান করা। কুরআন হাদীসের যা কিছু নির্দেশনা জীবনক্ষেত্রে পাওয়া যাবে তা পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করা। এর মুকাবিলায় অন্য কারো নির্দেশনাকে অনুসরণ যোগ্য মনে না করা, সে হুকুম চা যার তরফ থেকেই আসুকনা কেন।

www.pathagar.com

তিনঃ অবস্থা যদি এমন হয় যে, কোনো ব্যাপারে কুরআন হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া গেল না, এমতাবস্থায় গভীর জ্ঞানের অধিকারী এবং এ ব্যাপারে ইজতিহাক করার যোগ্য হলে সাহাবাগণের অনুসৃত আমল, উক্তি ও কর্মনীতির অন্তরালে এর তালাশ করবে। এখানেও যদি ঈপ্সিত সমাধানটি পাওয়া না যায় তবে ইজতিহাদের যোগ্যতা, শর্তাবলী পূরণ এবং এর সীমায় অবস্থান সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্যে কুরআন ও হাদীস থেকে হুকুম উদ্ভাবন করতে হবে। আর যদি তিনি নিজে ইজতিহাদ করার যোগ্যতা না রাখে না, তবে প্রথম যুগের ওলামা ও মুজতাহিদ ইমামগণের উদ্ভাবিত সমাধানের স্মরণাপন্ন হবে। এরপর যে ইমাম ও যে মুজতাহিদের উদ্ভাবিত ফয়সালা কুরআন–হাদীসের সাথে সংগতিপূর্ণ বিবেচিত এবং অধিকতর বিশুদ্ধ মনে হবে সে ফয়সালা অনুযায়ী আমল করতে হবে।

চারঃ প্রনিধানযোগ্য একথা ইসলামী শরীয়তের সাথে আদৌ সংগতিপূর্ণ হতে পারে না যে, আল্লাহ্ ও রসূল ছাড়া অন্য কারো ব্যক্তিগত উক্তি ও ইজতিহাদী ফয়সালা দ্বীনের ব্যাপারে কুরআন–হাদীসের সমপর্যায়ের দলীল সাব্যস্থ হবে। সে ব্যক্তির কথা বা ফয়সালা আল্লাহ্ ও রসূলের হুকুম মুতাবিক হোক বা হোক সর্বাবস্থায় উম্মতের জন্য তার অনুসরণ অপরিহার্য, বিনা দ্বিধায় তা পালনযোগ্য–এহেন বিধান ইসলামসম্মত নহে। আল্লাহ্ ও রসূল ব্যতীত এ জাতীয় মর্যাদা অপর কারো বেলায় কল্পনাই করা যায় না। কারণ মহান আল্লাহ্ই আনুগত্য পাওয়ার প্রকৃত হকদার। রসূলের নির্দেশ মূলত আহকামে ইলাহী হওয়ার কারণেই বিনা দ্বিধায় অবশ্য পালনীয়। যথা– আল–কুরআনের ভাষায়ঃ من يطع الرسول فقد اطاع الله যে রসূলের আনুগত্য করলো সে যেনো আল্লাহরই আনুগত্য করলো" সুতরাং অন্য কোনো লোক আনুগত্য পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হওয়ার কল্পনাই করা যায় না। যদিনা তার আনুগত্যের অন্তরালে আল্লাহ্ ও রসুলের আনুগত্য নিহিত থাকে। অর্থাৎ আল্লাহ্ ও রসুলের হুকুম সাপেক্ষেই কেবল কারো আনুগত্য–অনুসরণ গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট ঘোষণা অনুযায়ী এটাই ঈমানের প্রকৃত দাবী। উপরোক্ত দাবীর সমর্থনে নিম্নোক্ত আয়াত সমূহ উদাহরণ স্বরূপ লক্ষ্যণীয়ঃ

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰى
رَسُوْلِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ (التغابن: ١٢)

www.pathagar.com

"আর আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর রসূলের। কিন্তু আনুগত্য করা থেকে তোমরা বিরত থাকলে (স্মরণ রাখবে) যথাযথ হুকুম পৌছে দেয়াই আমার রসূলের দায়িত্ব।" (সূরা তাগাবুনঃ ১২ আয়াত)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ
الْكَافِرِينَ - (آل عمران: ٣٢)

"(হে রসূল!) তাদেরকে বল (তোমরা) আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য কর। কিন্তু যদি তারা আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়ে যায়, তাহলে স্মরণ রাখবে! আল্লাহ্ তো কাফিরদের ভালই বাসেন না।"

(সূরা আলে ইমরানঃ ৩২ আয়াত)

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ ও রসূলের আহকামের আনুগত ঈমানের নিদর্শন চিহ্নিত করা হয়েছে। আর আল্লাহ্ ও রসূল নির্দেশিত কোন হুকুম ঈমানের দাবীদারের পালন করা বা না করার স্বাধীনতা থাকা কোনো না সেই ঈমানের সাথে সংগতিপূর্ণ হতে পারে না এ জাতীয় কর্মপদ্ধতি ঈমানের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়, এটাকে বরং ঈমানের পরিপন্থী গণ্য করা উচিত। এ প্রসঙ্গে কুরআনের ঘোষণা প্রনিধানযোগ্য যথা ইরশাদ হচ্ছেঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا - (النساء: ٦٥)

"তোমার রবের কসম! ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মুমিন বলে স্বীকৃতই নহে, যতক্ষণ নিজেদের সমুদয় বিতর্কিত সমস্যা সমাধানে তোমাকে তারা চূড়ান্ত ফয়সালাকারী মেনে না নেবে, অতপর তোমার ফয়সালা সম্পর্কে নিজেদের অন্তরে দ্বিধা সংকীর্ণতা অনুভব না করে বরং পুরোপরি তা মেনে নেয়।"

(সূরা নিসাঃ ৬৫ আয়াত)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ
أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ الآية (الاحزاب: ٣٦)

www.pathagar.com

"আর আল্লাহ্ ও রসূলের পক্ষ থেকে কোন বিষয়ে নির্দেশ পাওয়ার পর কোনো ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে নির্দেশ অমান্য করার অধিকার মাত্রই থাকতে পারে না। বরং সে আদেশ কার্যকর করা ওয়াজিব হয়ে যায়।" (সূরা আহযাবঃ ৩৬ আয়াত)

আল্লাহ্ ও রসূলের মুকাবিলায় অন্য কারো নির্দেশের আনুগত্য করা কুরআনের দৃষ্টিতে প্রকাশ্য বিদ্রোহী এবং মুনাফিকের স্পষ্ট আলামতরূপে গণ্য করা হয়েছে। সুতরাং কুরআনের ভাষায়ঃ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ
رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا - (النساء: ٦١)

"আর তাদেরকে যখন বলা হয় এস আল্লাহ্ যা কিছু নাযিল করেন সেদিকে এবং এস তাঁর রসূলের দিকে। তখন মুনাফিক লোকদেরকে তুমি দেখতে পাবে রয, তোমার থেকে তারা দূরে সরে যাচ্ছে।" (সূরা নিসাঃ ৬১ আয়াত)

যাহোক, কুরআনের আলোকে এ বিষয়ে কোনো অবকাশ নেই যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন মুমিনের ওপর সর্বাগ্রে যে কর্তব্য ও দায়িত্ব অর্পিত হয়, তাহলো জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্ ও রসূলের হুকুম-আহকামের সে পরিপূর্ণ অনুসরণ করবে এথেকে এবং চুল পরিমাণ অবাধ্যতার সুযোগ একে দেয়া হয়নি। আল্লাহর আহকামের মুকাবিলায় গাইরুল্লাহর নির্দেশের আনুগত্যকে সে জায়েযই মনে করবে না, সে যেই হোক না কেন। অন্যথায় সঠিক অর্থে সে পূর্ণ মুমিনই থাকতে পারেনা।

ইহুদী জনসাধারণ যখন শরঈ আহকামের মোকাবিলায় নিজেদের আলেম ও পীর মাশায়েখদের মনগড়া বিধি বিধানকে অনুসরণযোগ্য মনে করতে শুরু করলো এবং কার্যত অনুসরণ করতেও লাগলো, তখন সে অনুসরণের করার ভিত্তিতে কুরআন তাদেরকে মুশরিক ঘোষণা করে দেয়। যার কারণে দ্বীনে ইলাহীর সাথে তাদের ঈমানের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। কুরআনের বর্ণনায়ঃ

اِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ
اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ - (التوبة: ٣١)

www.pathagar.com

"আহলে কিতাবরা আল্লাহ্ ছাড়া নিজেদের আলেম ও পীর মাশায়েখদের আপন রব বানিয়ে নিয়েছে। (তদ্রূপ) মসীহ্ বিন মরিয়মকেও তারা রব বানিয়েছে।" (সূরা তওবাঃ ৩১ আয়াত)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বিভিন্ন বাণীর অন্তরালে এ তথ্যই ব্যক্ত করেছেন যে, আল্লাহ্ ও রসূলের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত আহকামের অনুসরণ করাই একজন মুমিনের প্রধান ও কর্তব্য। দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ এরি মাধ্যমে নসীব হতে পারে। এর মুকাবিলায় কারো আনুগত্য গ্রহণযোগ্য নহে। নিম্নে এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত কয়েকটি মর্ম লক্ষ্যণীয়। যথাঃ

عن ابی هريرة قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم
كل امتی يدخلون الجنة الا من ابی قيل ومن ابی يا
رسول الله قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی
فقد ابی - (بخاری)

"আবু হোরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ "যারা অস্বীকার করেছে তারা ব্যতীত আমার সমগ্র উম্মত বেহেশতে প্রবেশ করবে।" আরজ করা হলো ইয়া রসূলুল্লাহ! অস্বীকারকারী কারা? তিনি উত্তরে বললেনঃ "যে আমার অনুসরণ করবে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে; আর যারা আমার অবাধ্যতা করবে তারাই অস্বীকারকারী।" (সহীহ্ বুখারী)

অপর এক হাদীসের ভাষায়ঃ

من اطاع محمداً فقد اطاع الله ومن عصى محمدا فقد
عصى الله ومحمد فرق بين الناس (بخاری)

"যে মুহাম্মদের অনুসরণ করলো সে যোনো আল্লাহরই অনুসরণ করলো। আর যে মুহাম্মদের অবাধ্য হলো প্রকারান্তরে সে আল্লাহরই নাফরমানী করলো। মুহাম্মদই লোকদের জন্যে সত্যের মানদন্ড।" (সহীহ্ বুখারী)

আল্লাহর কিতাব ও রসূলের হাদীস এমন দু'টি পথ নির্দেশিকা যা প্রত্যেক যুগে নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতার স্রোতধারা এবং গোমরাহীর বিপজ্জনক উত্তেজনা পরিবেশেও জাতিকে সম্পূর্ণভাবে সঠিক পথের সন্ধান দিতে সক্ষম।

www.pathagar.com

যাবতীয় ধ্বংস ও বিনাশ থেকে জাতিকে বাঁচাতে পারে। বস্তুত কুরআন-হাদীসের অনুসরণের মধ্যেই মুক্তির দিশা নির্ভরশীল আর হেদায়াত এর সাথেই সম্পৃক্ত। তাই কুরআন ও হাদীসের আনুগত্য ছেড়ে অন্যান্যদের অনুসরণ ও অনুকরণের মাধ্যমে নিষ্কৃতি কিভাবে আর্জিত হতে পারে এবং হেদায়াতই বা কিরূপে হাসিল হতে পারে সে কথা আমাদের বোধের অগম্য। অপর এক হাদীসের মর্ম নিম্নরূপঃ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم
أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة
رسوله - (موطا امام مالك)

"রসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ "তোমাদের মাঝে আমি দু'টি জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি। যতোক্ষণ পর্যন্ত সে দু'টিকে তোমরা আঁকড়িয়ে থাকবে ততোক্ষণ পর্যন্ত তোমরা গুমরাহ ও পথভ্রষ্ট হবে না। প্রথমটি আল্লাহর কিতাব (কুরআন) অপরটি রাসূলের সুন্নত (হাদীস)।"

[মু'আত্তা ইমাম মালেক (র)]

মোটকথা কুরআন ও হাদীসের উপস্থিতিতে আনুগত্যের দিক থেকে আসমানী কিতাবসমূহের কোনো মর্যাদা অবশিষ্ট নেই এবং সেসব কিতাবের বাহক পয়গাম্বরগণের অনুসরণেরও আমরা মুখাপেক্ষী নই। ঘটনার বিবরণে প্রসিদ্ধ আছে যে, একবার হযরত ওমর (রাঃ) তাওরাতের একটি কপি নিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু ওয়া আলাইহি সাল্লামের সামনে পড়তে শুরু করেন। তাতে তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললেনঃ "আল্লাহর কসম; এ সময় হযরত মুসা (আঃ) স্বয়ং জীবিত থাকলে অজিয় অনুসরণ ও অনুকরণ ব্যতীত তাঁরও গত্যান্তর থাকতো না।" হাদীসের ভারা নিম্নরূপঃ

ان عمر بن الخطاب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
بنسخة من التوراة فقال يا رسول الله هذه نسخة
من التوراة الخ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
والذى نفسى بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه و
تركتمونى لضللتم عن سواء السبيل ولو كان موسى

www.pathagar.com

حيًا وادركت نبوتي لا تبعني — (دارمي)

"একবার ওমর (রাঃ) তাওরাতের একটি কপি সহ হুজুরের কাছে এসে বললেনঃ এটা তাওরাতের একটি কপি। [অতপর হযরত ওমর (রাঃ) কপিটি পড়তে শুরু করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে লাগলেন] মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই সত্ত্বার কসম; এ সময় যদি মূসা (আঃ) স্বয়ং উপস্থিত থাকতেন আর তোমরা তাঁকে অনুসরণ করে আমাকে পরিত্যাগ করতে তাহলে তোমরাও পথহারা হয়ে যেতে। যদি মূসা (আঃ) জীবিত থাকতেন এবং আমার নবূয়্যত কাল পেতেন, তাহলে আমার অনুসরণ করা ছাড়া তাঁরও কোনো উপায় থাকতো না।" (দারেমী)

আলোচ্য বর্ণনা এবং হাদীসের কিতাব সমূহে এ জাতীয় আরো বহু রেওয়ায়েত লক্ষ্য করা যায় যাদ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, সর্বাবস্থায় কুরআন ও হাদীসের আহকামের অনুসরণ করা একজন মুমিনের অপরির্য কর্তব্য। কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট আহকামের মুকাবিলায় অন্য কারো আনুগত্য করা মুমিনের জন্যে জায়েজ নেই। তদুপরি কুরআন হাদীসের পথ নির্দেশনা থেকে সে কোনো অবস্থায় মুক্ত ও বেপররয়াও হতে পারে না। অবশ্য কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া না গেলে তখন অন্যান্যদের ইজতিহাদ দ্বারা উপকৃত হওয়া এবং নিজের মধ্যে ইজতিহাদের যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে নিজেই ইজতিহাদ করা স্বতন্ত্র কথা।

যারা কুরআন-হাদীসের মুকাবিলায় ইমামদের ইজতিহাদী ফায়সালার অনুসরণ করাকে অনিবার্য মনে করে প্রকৃতপক্ষে তারা একথারই প্রমাণ দিচ্ছে যে, তাদের অন্তরে ঈমান এখনো বদ্ধমূল হয়নি। অথবা তারা নবুয়্যতের মর্যাদা ও ইজতিহাদের মর্যাদা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবচেতন ও অজ্ঞাত। অথবা তাদের হৃদয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অপেক্ষা অপরের মহত্ত্বের মাত্রা পরিমাণে অধিক। এ জাতীয় লোকদের সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করছেনঃ

لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده
وولده والناس اجمعين (متفق عليه)

www.pathagar.com

"নিজের পিতা-সন্তান এবং সমগ্র মানুষ অপেক্ষা আমার মহব্বত অধিকতর গভীর না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের কেউ মুমিনরূপে সাব্যস্তই হতে পারে না।"

(বুখারী-মুসলীম)

তিনি অপর এক রেওয়ায়েতে বলেছেনঃ

لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به

"নিজের প্রবৃত্তিকে আমার আনীত শরীয়তের অধীন না করা পর্যন্ত তোমাদের কেউ পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না।"

উপরোক্ত প্রাথমিক আলোচনার পর এতক্ষণে আসল প্রসংগ তাকলীদ বিষয়ে আলোচনার অবকাশ পাওয়া যেতে পারে এ পর্যায়ে আমরা যে সকল আলেম চার মযহাবের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং চার ইমামের কোনো না কোনো একজনের তাককলীদের বিশ্বাসী তাদের প্রামাণ্য উক্তিসমূহের আলোকে তাকলীদের ব্যাখ্যা পেশ করা যাচ্ছে।

তাকলীদের ব্যাখ্যা

প্রনিধানযোগ্য ফকীহদের পরিভাষায় কোনো ইমামের অজ্ঞাত প্রমাণ একজন উক্তির অনুসরণ করাকে 'তাকলীদ' বলা হয়। যে মতটির দলীল তার জানা নেই।

وعرف الفقهاء التقليد بانه العمل بقول من

لا يعرف دليله-

"ফকীহদের মতে কারো এমন উক্তির অনুসরণ করাকে তাকলীদ বলা হয়, যার দলীল অনুসরণকারীর জানা নাই।"

(তাফসীর মানার, ১২ খঃ ২২০ পৃষ্ঠা)

বলা বাহুল্য তাকলীদ সম্পর্কে ওলামা সমাজের সর্বসম্মত কথা হলো যে ব্যক্তি নিজেই মুজতাহিদ তার পুণ্যে এ অর্থে অন্যের তাকলাদ করা জায়েয নেই। বরং নিজের ইজতিহাদ অনুযায়ী আমল করই তার উপর ওয়াযিব। উসূল শাস্ত্রবিদ মুহাক্কিক আলেমগণ তাদের রচনাবলীতে বিষয়টির বিশদ আলোচনা করেছেন।

www.pathagar.com

কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি ইজতিহাদ করার যোগ্য না হয়, কিন্তু কুরআন-হাদীস সম্পর্কে কেবলমাত্র আলেমই নয়, বরং হাদীস শাস্ত্রে জ্ঞান পারদর্শিতা অধিকারী এবং সাথে সাথে বিভিন্ন মযহাবের ফিকাশাস্ত্রীয় খুঁটিনাটি বিষয়ে গবেষণা করা ও প্রাধান্য দেয়ার যোগ্যতাও রাখে, এমতাবস্থায় এ ধরনের আলেমের জন্য মযহাব ইমামদের তাকলীদ করার উপায় কি হবে? তিনি কি সর্বাবস্থায় কোনো নির্দিষ্ট মযহাবের সাথে অনিবার্যরূপে সম্পৃক্ত থাকবেন এবং কোনো অবস্থাতেই অন্য কোনো মযহাবের অনুসরণ করা তার জন্য জায়েয নেই যদিও সেটা একটি মাসআলায় হোক। অথবা তার জন্য এমন করাও জায়েয যে, বিভিন্ন মযহাবের ফিকহী ছোট খাটো বিষয়ের ওপর পর্যালোচনা দ্বারা জ্ঞানগর্ভ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ সংশ্লিষ্ট শাখা-প্রশাখা সমূহের মধ্যে যে মাসআলাটিই কুরআন-হাদীসের সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল মনে হবে তারই উপর আমল করবেন?

উদাহরণত, প্রথম থেকেই তিনি যদি নির্দিষ্ট কোন মযহাবের সাথে সম্পৃক্ত থাকেন এবং সম্পৃক্ততার পর অন্য মযহাবের ফিকহী মাসআলায় সার্বিক বা আংশিকভাবে তার মত পরিবর্তন সঙ্গত হবে কি-না? অথবা সে প্রথম থেকেই যে মযহাবের সাথে সংশ্লিষ্ট তার সাথেই একীভূত হয়ে থাকবে? অধিকন্তু কুরআন-হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞ সাধারণ লোকের তাকলাদ এবং মযহাব থেকে অন্য মযহাবে স্থানান্তরিত হওয়ার হুকুম কি হবে? উল্লেখিত বিষয়গুলি তাকলীদের মাসআলার সাথে সংশ্লিষ্ট যে সকল আলেম ও মাশায়েখ নিজেরাই মুকাল্লিদ এবং কোনো না কোনো মযহাবের সাথে জড়িত তাদের উক্তিসমূহের আলোকে প্রথমত আমরা এসবের ব্যাখ্যা করতে আগ্রহী অতপর এরি আলোকে মওলানা মওদূদীর (র) ফিকহী মসলক যা এযাবৎ তাঁর রচনাবলীতে প্রকাশ পেয়েছে সে নীতি উক্ত আলেমদের গবেষণার দর্পণে সঠিক কি বেঠিক তাও আমরা বিশ্লেষণ করব। কিন্তু 'মাযহাব পরিবর্তন' করার মৌলিক ভিত্তি ফকীহদের মতে বিভিন্ন হওয়ার কারণে প্রথমত সে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা জরুরী মনে করেছি।

মাসআলার বিতর্কিত বুনিয়াদঃ মাফযূলের তাকলীদ

মযহাব চতুষ্টীয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আলেমগণ এ বিষয়ে মতানৈক্য প্রকাশ করেছেন যে, দু'জন ইমামের মধ্যে একজন আফযল অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে

www.pathagar.com

ইলম ও ফজীলতে অধিকতর মর্যাদাবান এবং অপরজন মাফযূল অর্থাৎ, তুলনামূলকভাবে নিম্নমানের হলে দু'য়ের মধ্যে যে কোনো একজনকে তাকলীদের জন্যে মনোনীত করা হবে কি, নাকি সমভাবে উভয়ের তাকলীদ জায়েয সাব্যস্ত হবে? অর্থাৎ, যাকে ইচ্ছা তার তাকলীদ বৈধ হবে। একদলের মতে তাকলীদের জন্য আফযলকেই বাছাই করতে হবে। আফযলের বর্তমানে মাফযুলের তাকলীদ জায়েয হবে না। এর উপর ভিত্তি করেই 'মযহাবের পরিবর্তন' বিষয়ে তারা মত পোষণ করেন যে, ফিকার এক মযহাব থেকে অপর মযহাবে প্রত্যাবর্তন করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কারণ প্রত্যাবর্তনকারী ব্যক্তি যে মযহাব থেকে প্রত্যাবর্তন করতে চায় সেটি তো অন্যান্য ইমাম ও মযহাবের তুলনায় আফযুল ইওয়াতেই সে এর অনুসারী হয়েছিল। এখন তার অনুকরণীয় মযহাব ছেড়ে অন্য মযহাবে ফিরে যাওয়া মূলত আফযলের বর্তমানে মাফযুলকে প্রাধান্য দেয়ার নামান্তর, যা অবৈধ ও নাজায়েযের পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং একারণে মযহাবে পরিবর্তন করা মূলত জায়েযই হবে না। যে মযহাবের সাথে সে প্রথম থেকে জড়িত ছিল যে মযহাবের যা নেই তাকে সব সময় সম্পৃক্ত থাকতে হবে। এ নীতির প্রেক্ষিতে আলোচ্য পক্ষের দাবী হলোঃ

المنتقل من مذهب الى مذهب باجتهاد وبرهان

اثم يستوجب التعزير- (طحاوى)

"ফিকার এক মযহাব থেকে অন্য মযহাবে প্রত্যাবর্তনকারী শাস্তিযোগ্য অপরাধী এবং গুনাহগার, যদিও তার এই প্রত্যাবর্তন ইজতিহাদ ও দলিলের ভিত্তিতেই হোক না কেন।" (তাহাবী)

আবার কেউ কেউ এর মধ্যে অন্য ধরনের সংশোধনী এনেছেন এভাবে যে, হানাফী মযহাব ছেড়ে অন্য মযহাবে প্রত্যাবর্তন করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বটে; কিন্তু অন্য মযহাব ছেড়ে হানাফী মযহাবে দাখিল হওয়া অপরাধ যোগ্য নহে দূরে মুখতার ৩য় খন্ডের ২৬৩ পৃষ্ঠার এক ফতওয়ায় উল্লেখ করা হয়েছে।

ارتحل الى مذهب الشافعى يعزر اه "কেউ হানাফী মযহাব পরিত্যাগ করে শাফেঈ মযহাবে প্রত্যাবর্তন করলে তাকে অপরাধী হিসেবে সাজা দেয়া হবে।"

পক্ষান্তরে আলেমদের বৃহত্তর এক দলের মতে আফযুলের বর্তমানে মাফযুলের তাকলীদ করা নিষেধ নয় বরং জায়েয। সুতরাং গবেষণা ও

www.pathagar.com

ইজতিহাদের ভিত্তিতে ফিকহী মযহাবের পরিবর্তন নিষিদ্ধ নহে। এ অভিমতটিই সবেদক আলেমদের কাছে অধিকতর সহীহ ও প্রাধান্যোপযোগী। হানাফী, শাফেঈ, মালেকী এবং অধিকাংশ হাম্বলী মতাবলম্বীগণের এ মতের সমর্থক বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লামা শামী এ ব্যাপারে আলেমদের নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। যথাঃ

اعلم انه ذكر فى التحرير وشرحه ايضًا انه يجوز
تقليد المفضول مع وجود الافضل - وبه قالت الحنفية
والمالكية واكثر الحنابلة والشافعية - اه (ج ١ ص ٤٦)

"তাহরীর' এবং তার ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, আফযুলের বর্তমানে মাফযূলের তাকলীদ করা জায়েয। হানাফী, মালেকী এবং অধিকাংশ হাম্বলী ও শাফেঈ আলেমগণ এতে ঐক্যমত পোষণ করেছেন।"

ثم ذكر انه لو التزم مذهبا معينا كابى حنيفة والشافعى
فقيل يلزمه وقيل لا - وهو الاصح اه (شامى ج ١ ص ٤٥)

"তাহরার গ্রন্থকার ইবনে হুমাম একথাও উল্লেখ করেছেন যে, আবু হানীফা এবং শাফেঈ মযহাবের ন্যায় কোনো নির্দিষ্ট মযহাবের অনুসরণ যদি বাধ্যতামূলক করা হয়, হবে এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কারো মতে তাকে নির্দিষ্ট মযহাবেরই অনুসরণ করতে হবে। কারো মতে তার অনুসরণ করা অপরিহার্য নয়। শেষোক্তি মতই অধিকতর বিশুদ্ধ।"

(শামী ১ম খন্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা)

ফিকাহবিদ আলেমগণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দ্বারা একথা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়যে, আফযুলের বর্তমানে মাফযলের তাকলীদ করা সেহেতু জায়েয, কাজেই একটি ফিকহী মযহাবের পরিবর্তে অন্য একটি মযহাবের তাকলীদ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে অপরাধ নয়। প্রথম থেকেই নির্দিষ্ট কোন মযহাবের অনুসরণ অনিবার্যরূপে গ্রহণ করা সত্ত্বেও সে মযহাবের স্থায়ীভাবে অনুসরণ করতে বাধ্যতামূলক নয়। বরং অন্য মযহাবের অনুসরণও তার জন্য জায়েয। ফিকাহবিদগণ এমতকেই অধিকতর সঠিক বলেছেন। আর এর বিপরীত মত আফযুলের বর্তমানে মাফযুলের অনুসরণ এবং নির্দিষ্ট মাযহাবের তাকলীদ করা অবস্থায় অন্য মাযহাবের তাকলীদ না-জায়েয হওয়ার উক্তি যয়ীফ ও অশুদ্ধ

www.pathagar.com

বলেছেন। এমত কেবল ইবনে হুমাম হানাফীর নয়, বরং ইবনে হজর মককী শাফঈও (র) এমত সমর্থন করেছেন। ইমাম নসফীর (র) মন্তব্যের–

اذا سئلنا عن مذهبنا ومذهب غيرنا قلنا وجوبا مذهبنا صواب يحتمل الخطاء ومذهب غيرنا خطأ يحتمل الصواب

(অর্থাৎ, আমাদেরকে যখন নিজের ও অন্যের মযহাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে তখন আমাদের জবাব অবশ্যই এটা হবে যে, আমাদের মযহাব সত্য ও ন্যায়। ভুল কিছু থাকলে তা কেবল সন্দেহ পর্যায়ের। আর অন্যান্য মযহাব বাতিল। তাদের মধ্যে নির্ভুল কিছু থাকলে তা কেবল সন্দেহের পর্যায়ে) প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে জবাবে তিনি বললেনঃ

ان ذالك مبنى على الضعيف من انه يجب تقليد الاعلم دون غيره - والاصح تقليد اىّ شاء ولو مفضولا - اهـ

"কেবল শীর্ষমানের ইমামের তাকলীদ করাই ওয়াজিব, অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের ইমামের তাকলীদ করা জায়েয নহে এমত দুর্বল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাকলীদ করা জায়েয, যদিও তিনি মাফযলেই হোন না কেন। বস্তুত এমতই অধিকতর বিশুদ্ধ।" (শামী, ১ম খন্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা)

এতক্ষণ শায়খ ইবনে হুমাম হানাফী ও আল্লামাই ইবনে হজর মক্কী শাফেঈর এ সম্পর্কিত অভিমত ব্যক্ত করা হল। এবার আল্লামা শামীর (র) অভিমত লক্ষ্যণীয়।

অজ্ঞ লোকদের তাকলীদ

وقد شاع ان العامى لا مذهب له اذا علمت ذالك ظهر لك ان ما ذكر عن النسفى من وجوب اعتقاد ان مذهبه صواب يحتمل الخطأ مبنى على انه لا يجوز تقليد المفضول وانه يلزمه التزام مذهبه وذالك لا يتأتى فى العامى

(رد المحتار - ج ١ ص ٤٥)

"একথা প্রসিদ্ধ যে, অজ্ঞ লোকের জন্য কোনো মাযহাবের অনুসরণ করা জরুরী নয়। নিজের মযহাব সত্য ও ন্যায়, ভুলের অবকাশ কেবল সন্দেহ

www.pathagar.com

পর্যায়ের আপন মযহাব সম্পর্কে ইমাম নসফীর (র) এ অভিমত যে, 'মযফমূলের তাকলীদ করা নাজায়েয এবং আপন মযহাবের ওপর সব সময় দৃঢ় থাকা অনিবার্য' নীতির উপর নির্ভরশীল। অথচ এ নীতি অজ্ঞ লোকের পক্ষে আমল এবং গ্রহণযোগ্য নহে।" (রদ্দুল মুহতার, ১ম খন্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা)

কারণ অজ্ঞ লোকের ব্যাপারে আলেমদের সিদ্ধান্ত হলো সে যাকে ইচ্ছা তার তাকলীদ করবে, কোনো নির্দিষ্ট মযহাবের অনুসরণ করা তার জন্যে জরুরী নয়। খুঁটিনাটি ব্যাপার সে কেবলমাত্র কোনো ইমাম বা মুজতাহিদের অনুসরণ করবে; সে ইমাম আবূ হানীফা, শাফেঈ, মালেক কিংবা আহমদ বিন হাম্বর যেই হোন না কেন। মোটকথা, চার মযহাবের সীমা অতিক্রম করা তার জন্য বৈধ নহে। এদের মধ্যে যাঁকে ইচ্ছা সে তাকলীদ বা অনুসরণ করবে এ ব্যাপারে ইবনে হজর মক্কীর (র) বরাত দিয়ে আল্লামা শামী (র) ইবনে হুমামের (র) নিম্নোক্ত উক্তি উল্লেখ করেছেনঃ

ان اخذ العامی بما یقع فی قلبه انه اصوب اولی۔ وعلی
هٰذا اذا استفتی مجتہدین فاختلفا علیه الاولیٰ ان یاخذ
بما یمیل الیه قلبه منہا۔ وعندی لو اخذ بقول الذی لا
یمیل الیه قلبه جاز لان میله وعدمه سواً والواجب
علیه تقلید مجتہد وقد فعل اھ (شامی ج ۱ ص ۴۵)

"অজ্ঞ লোকের জন্য যে ফত্ওয়া অধিক বিশুদ্ধ মনে হবে তার অনুসরণ করাই উত্তম। সে যদি দু'জন মুজতাহিদের কাছ থেকে বিরোধপূর্ণ একাধিক ফত্ওয়া হাসিল করে, এমতাবস্থায় যার প্রতি তার মনের আকর্ষণ প্রবল তার উপর আমল করাই তার জন্য উত্তম। কিন্তু তার মনের আকর্ষণহীন ফতোয়ার উপর আমল করাও আমার মতে জায়েয এ জন্য সে, তার মনের আকর্ষণ বা আকর্ষণহীনতা উভয় সমান যথা। বস্তুত একদল মুজতাহিদের তাকলীদ করাই তার উপর ওয়াজিব ছিল, যা সে আদায় করেছে।

(শামী, ১ম খন্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

উপরোক্ত ব্যাখ্যার সারমর্ম

উপরোল্লেখিত ফকীহগণের পেশকৃত উক্তি ও বিশ্লেষণের আলোকে যে বিষয়গুলো প্রমাণ হয়, তার সারমর্ম নিম্নরূপঃ

একঃ শীর্ষস্থানীয় এবং আফযুলের বর্তমানে তুলনামূলক নিম্নমান তথা মাফযলের তাকলীদ করা জায়েয। যেসব আলেম ও ফকীহ এ মতের সমর্থক নন তাদের মত মযহাবের আলোকে সবল নয় দুর্বল। সবল ও বিশুদ্ধ মতে তাকলীদ করা জায়েয।

দুইঃ এ মত কেবলমাত্র হানাফীদের নয়। বরং মালেকী এবং অধিকাংশ হাম্বলী ও শাফেঈ মতাবলম্বী আলেমগণও হানাফীদের এমত পোষণ করে থাকেন।

তিনঃ নির্দিষ্ট কোন ইমামের তাকলীদ এবং বিশেষ কোন ফিকহী মযহাবের অনুসরণে অবিচল থাকা ওয়াজিব নয়। তদ্রুপ কোনো মযহাব গ্রহণ করার পর সে মযহাবে সর্বাবস্থায় আকড়ে থাকা অনিবার্য নয়; বরং ছোট খাটো ব্যাপারে অন্যান্য মযহাবের অনুসরণও জায়েয। ফকীহগণের দৃষ্টিতে এতে ক্ষতির কিছু নেই।

চারঃ শাখা-প্রশাখাগত মাসআলার ব্যাপারে মুজতাহিদ ইমামগণের বিভিন্ন মযহাবের একাধিক ফত্ওয়ার ওপর বিভিন্ন সময়ে আমল করা যদিও জায়েয তথাপি যে মযহাবের মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখায় মনের প্রশান্তি অধিক পরিমাণে অনুভূত হয় তার উপর আমল করাই উত্তম।

ফকীহগণের আলোচ্য বিশ্লেষণ মযহাব পরিবর্তন প্রসংগটি মোটামোটি স্পষ্ট হলো। কিন্তু তাদের বর্ণনায় সে পরিবর্তনের শর্তাবলী এবং প্রয়োজনীয় তফসীলী বিবরণ এখনো বাকী। কাজেই বিষয়টিকে সন্দেহমুক্ত করার উদ্দেশ্যে হানাফী ও শাফেঈ মতালম্বী আলেমগণের রচিত গ্রন্থ উল্লেখিত পরিবর্তনের শর্তাবলী ও প্রয়োজনীয় তফসীল বর্ণনা করা জরুরী। যাতে এ ব্যাপারে কোন অস্পষ্টতার ছোঁয়া না থাকে। বলা বাহুল্য জানা দরকার যে, মযহাব পরিবর্তন বিষয়ে হানাফী ও শাফেঈ ইমামগণ পরস্পর ঐক্যমতের ধারক। মূল বিষয়ে তাদের মধ্যে পারস্পরিক মতবিরোধ নাই বললেই চলে।

www.pathagar.com

পরিবর্তনের শর্তাবলী ও বিশদ বিবরণ

হানাফী, শাফেঈ এবং মালেকী মযহাবের কিতাবে এ সম্পর্কিত যা কিছু তত্ত্ব পাওয়া যায়, এর প্রতি দৃষ্টি দিলে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মযহাবের পরিবর্তন করতঃ অন্য মযহাব অনুসরণ করা সর্ব সম্মতিক্রমে জায়েয। কারো মতে এটা না-জায়েয নয়। অবশ্য এর জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে স্বীয় গ্রন্থাবলীতে ওলামাগণ যার উল্লেখ করেছেন। পরিবর্তনের সময় এসব শর্ত পাওয়া গেলেই উহা জায়েয, অন্যথায় না-জায়েযই থেকে যাবে। প্রথম শর্ত হলো-প্রবৃত্তি ও আবেগের তাড়না কিংবা বৈষয়িক স্বার্থ চরিতার্থ করার অভিপ্রায় না থাকা। দ্বিতীয় শর্ত- পরিবর্তনের অন্তরালে মযহাবের সাথে তামাশা বা তাচ্ছিল্যের ভাব না থাকা এবং ইমামগণের প্রতি বিদ্রুপ কিংবা তাঁদের হেয় করার সামান্যতম গন্ধ পর্যন্ত না থাকা। তৃতীয় শর্ত হল, সে পরিবর্তন কপটতা ও মিথ্যাচার বর্জিত হওয়া। এসব নেতিবাচক শর্তাবলীর সাথে সাথে ইতিবাচক শর্ত থাকাও জরুরী। যথা- পরিবর্তন ইলমী দলীল জ্ঞানগর্ভ প্রমাণ, বিশুদ্ধ চিন্তা এবং ইজতিহাদের অধীনে শরঈ উদ্দেশ্য ও দ্বীনের খাতিরে হতে হবে। এসব শর্ত যার মধ্যে পুরাপুরি পাওয়া যাবে তার পরিবর্তন সম্পূর্ণ জায়েয। আর সে পরিবর্তনের উদ্দেশ্য প্রনোদিত ও অসৎ উদ্দেশ্যে পরিচালিত তা নিষিদ্ধ এবং কোনো অবস্থাতেই জায়েয হতে পারে না। বিষয়টাকে অধিকতর ফুটিয়ে তোলার লক্ষ্যে হানাফী ও শাফেঈ ইমামগণের তত্ত্ব সমৃদ্ধ অভিমত নিম্নে উল্লেখ করা হল।

www.pathagar.com

হানাফীগণের তত্ত্বপূর্ণ গবেষণা

আবু বকর জওযজানীর (র) ফত্ওয়া

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (র) তাতারখানীয়া সূত্রে আবূ বকর জওযজানীর (র) মাযহাব পরিবর্তন সম্পর্কীত যে ফত্ওয়া পেশ করেছেন তা উপরোক্ত দাবীর সমর্থনে একটি অকাট্য দলীল। ফত্ওয়াটিতে একদিকে পরিবর্তন সম্পর্কে যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে, অপরদিকে কতিপয় শর্তের বিস্তারিত বিবরণ তাতে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং নিম্নে ফত্ওয়াটি হুবহু পেশ করা হলঃ

في التاترخانية حكى ان رجلا من اصحاب ابى حنيفة
خطب الى رجل من اصحاب الحديث ابنته فى عهد ابى بكر
الجوزجانى فابى الا ان يترك مذهبه فيقرأ خلف
الامام ويرفع يديه عند الانحطاط ونحو ذلك فاجابه فزوجه
فقال الشيخ بعد ما سئل عن هذه واطرق رأسه - النكاح جائز
ولكن اخاف عليه ان يذهب ايمانه وقت النزع لانه ترك
المذهب الذى هو حق عنده واستخف به لاجل جيفة
منتنة ولو ان رجلا برئ من مذهبه باجتهاد وضح له كان
محمودا ماجورا اما انتقال غيره من غير دليل بل لما يرغب
من عرض الدنيا وشهوتها فهو المذموم الآثم المستوجب
للتاديب والتعزير لارتكابه المنكر فى الدين واستخفافه
بدينه ومذهبه - اهـ (رد المحتار ج ٣ - ص ٢٤٣)

'আতারখানীয়া' শীর্ষক গ্রন্থে একটি ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, "ইমাম আবূ বকর জওযজানীর (র) সময়ে জনৈক হানাফী লোক আহলে হাদীস পন্থী এক লোকের নিকট তার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়। প্রস্তাব

www.pathagar.com

অগ্রাহ্য করে আহলে হাদীস পন্থী লোকটি উত্তরদেয় মেয়ের বিয়ে দিতে পারি এই শর্তে যে, হানাফী মযহাব বর্জন করে আহলে হাদীস পন্থা অবলম্বন করতে হবে এবং ইমামের পিছনে কেরাত পাঠ আর রফেইয়াদাইনের উপর আমল দ্বারা এর প্রমাণ দিতে হবে। শর্ত কবুল করে ছেলেটি হানাফী মযহাব ছেড়ে রফে ইয়াদাইন ও ইমামের সাথে কিরাত পড়ার নীতি গ্রহণ করলে যথারীতি তার বিয়ে হয়ে যায়। ইমাম জওযজানীকে আবূ বকর (র) এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে কিছুক্ষণ মৌন থাকার পর তিনি বললেনঃ বিয়ে তো জায়েয, কিন্তু মৃত্যুর সময় তার ঈমান বাকী থাকে কি–না, এ ব্যাপারে আমার দারুণ আশংকা। কেননা তার দৃষ্টিতে এ যাবৎকাল যে সমহাব ছিল সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক আক তাকে সে বর্জন করেছে পার্থিব লোভ–লালসা ও তুচ্ছ নারীর মোহে। তদুপরি এদ্বারা সত্য মযহাবকে সে অবজ্ঞা করেছে এবং তাচ্ছিল্য মনে প্রত্যাখ্যান করেছে। অবশ্য কেউ যদি নির্ভুল ইজতিহাদ ও পরিশুদ্ধ গবেষণার ভিত্তিতে নিজের অনুসৃত মযহাব পরিত্যাগ করে, তবে এটা এক প্রশংসনীয় পদক্ষেপ এবং এর জন্য আল্লাহর কাছে তিনি পুরস্কৃত হবেন। দলীল ও সঠিক ইজতিহাদ ছাড়া নিছক বৈষয়িক লালসা ও প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে মযহাব পবির্তন করা অবশ্যই ঘৃণিত ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ, কেননা এ ধরনের তৎপরতা দ্বীনকে অস্বীকার করা, হেয় প্রতিপন্ন করা এবং দ্বীনের সাথে বিদ্রূপ করারই নামান্তর।" যা আদৌ জায়েয হতে পারে না এবং এ জাতীয় আচরণ সহ্য করার মতও নহে। (রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ২৬৩ পৃষ্ঠা)

ইমাম আবূ বকর জওযজানীর উপরোক্ত ফত্ওয়া দ্বারা তিনটি বিষয়ে সুস্পষ্টরূপে জানা গেল। এক, প্রবৃত্তির তাড়না কিংবা পার্থিব সম্পদ লাভের আশায় মযহাব পরিবর্তন করা মারাত্মক গুনাহ এবং নিকৃষ্টতম অপরাধ। দুই, সঠিক চিন্তা ও নির্ভুল ইজতিহাদের ভিত্তিতে শরঈ ও দ্বীনী উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন ও পরিপূরণের যাতরে যদি এ জাতীয় পরিবর্তন করা হয়, তবে সেটা শুধূ জায়েযই নয়, মোস্তাহাসানও বটে। যার বিনিময়ে বিরাট প্রতিদান পাওয়ারও আশা করা যায়। তিন, একজন আলেমের জন্য শরঈ দলীলের ভিত্তিতে সঠিক চিন্তা ও ইজতিহাদের অধীনে দ্বীনী উদ্দেশ্য হাসিল ও পরিপূর্ণ করার অভিপ্রায় এ জাতীয় পরিবর্তন বৈধ ও জায়েয। শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা কোনো অপরাধ কিংবা গুনাহের কাজ নহে। এ প্রসঙ্গে – ولو ان رجلا برئ من مذهبه

www.pathagar.com

باجتهاد وضح له (অর্থাৎ, পরিশুদ্ধ ইজতিহাদ ও পরিমার্জিত উদ্ভাবনী পারদর্শিতা বলে প্রয়োজনে কারো মযহাব পরিবর্তন দোষণীয় নহে।) বাক্যটি উপরোক্ত মন্তব্যের সমর্থনকারী। কিন্তু অজ্ঞ লোকের বেলায় একথা প্রযোজ্য নহে। যেহেতু তাদের মধ্যে ইজতিহাদ ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার আশা করা অর্থহীন চিন্তা। অতপর উপরোক্ত ফতওয়ার উপর মন্তব্য কিংবা তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন।

আল্লামা শরম্বুলালীর (র) অভিমত

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী মযহাব পরিবর্তন ব্যাপারে আল্লামা শরম্বুলালীর (র) একটি ফয়সালা উল্লেখ করেছেন। উপস্থাপনার দিক থেকে যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণসহ প্রায় সবগুলি দিক এতে বর্ণিত হয়েছে বলা যায়। হানাফী চিন্তাবিদ আলেমগণের দৃষ্টিতে তাকলীদ ও মযহাব পরিবর্তনের তত্ত্বগত হাকীকত এবং এ সম্পর্কে তাঁদের অভিমত জানার অভিপ্রায় ফয়সালাটির উল্লেখ আমরা এখানে প্রয়োজন মনে করি। যা নিম্নরূপঃ

قال العلامة الشرنبلالى بعد ذكر فروع من المذهب
صريحة بالجواز- فتحصل مما ذكرناه انه ليس على الانسان
التزام مذهب معين وانه يجوز له العمل بما
يخالف ما عمله على مذهبه مقلدا فيه غيره مستجمعا
شروطه- ويعمل بامرين متضادين فى حادثتين لا
تعلق لواحدة منهما بالاخرى- وليس له ابطال عين
ما فعله بتقليد امام آخر- وقال ايضا- ان له التقليد
بعد العمل كما اذا صلى ظانا صحتها على مذهبه ثم
تبين بطلانها فى مذهبه وصحتها فى مذهب غيره
فله تقليده- ويجتزأ بتلك الصلوة على ما قال فى
البزازية- انه روى عن ابى يوسف انه صلى الجمعة
مغتسلا من الحمام ثم اخبر بفارة ميتة فى بير الحمام

www.pathagar.com

فقال اذًا ناخذ بقول اخواننا من اهل المدينة اذا بلغ

الماء قلتين لم يحمل خبثا۔ (شامی ج ۱ ص ۷۰)

"আল্লামা শরম্বুলালী মযহাবের কতিপয় খুঁটিনাটি বিষয় উল্লেখ করেছেন। যদ্বারা মযহাব পরিবর্তনের বৈধতা স্পষ্টত প্রমাণ হয়। অতঃপর তার বিবরণের সারমর্ম হলোঃ (১) নির্দিষ্ট মযহাব আঁকড়ে ধরে রাখা কারো জন্যে জরুরী নয় (২) নিজের মযহাবের খেলাফ অন্য মযহাবের ছোটখাটো বিষয়ে তাকলীদ করা জায়েয তবে শর্ত হলো সে মযহাবের সমস্ত শর্ত বিবেচনায় রাখতে হবে। (৩) ভিন্ন ভিন্ন দু'টি ঘটনায় পরস্পর বিরোধী দু'টি হুকুমের (যা দু'টি মযহাবের সাথে সংশ্লিষ্ট অনুসরণ করা জায়েয। (৪) সাবেক ইমামের তাকলীদে যে আমল করা হয়েছে অন্য ইমামের তাকলীদ করাতে সে আমল বাতিল গণ্য হবে না। (৫) এক মযহাবের অনুসরণে আমল শুরু করার পরও অন্য মযহাবের তাকলীদ করা জায়েয। যেমন– একজন লোক স্বীয় মযহাব মতে নামায সহীহ হওয়া ধারণা করে নামায আদায় করে নিল। পরে সে জানতে পারল তার আদায়কৃত নামায অন্য মযহাব মতে শুদ্ধ কিন্তু তার নিজের মযহাব মতে তা ঠিক নয়। এমতাবস্থায় অন্য মযহাবের অনুসরণে নামায সহীহ মনে করা তার জন্য জায়েয এবং একে শুদ্ধ মনে করাই যথেষ্ট, সুতরাং বাযাযিয়ার ইমাম আবূ ইউসুফ (র) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, এবার তিনি হাম্মাম খানার পানি দ্বারা গোসল করে জুমার নামায আদায় করেন। পরে তাঁকে খবর দেয়া হল যে, হাম্মামের কূপে ইঁদুর পড়ে মরে গিয়েছিল। তিনি বললেন, কোনো ক্ষতি নেই, আজো আমাদের মাদানী ভাইদের মতানুযায়ী আমল করবো। আর তা হলো পানি কুল্লী (বড় মটকা) পরিমাণ হলে নাপাক হতে পারে না। (শামী, ১ম খন্ড, ৭০ পৃষ্ঠা)

তিনটি বিষয়ের প্রমাণ

আল্লামা শরম্বুলালীর (র) উক্ত ভাষ্যে তিনটি বিষয় স্পষ্টত ফুটে উঠে। এক, কোনো একটি নির্দিষ্ট ফিক্হী মযহাবের তাকলীদ করা কারো জন্য এ ধরনের ওয়াযিব নয় যে, খুঁটিনাটি শাখাগত বিষয়ে অন্য মযহাব অনুযায়ী আমল করার অবকাশই থাকবে না। এ পর্যায়ে অনুসরণে আমল করাটাই মূলত ওয়াজিব চার ইমামের যে কোনো একদিনের অনুসরণে আমল করাটাই মূলত ওয়াজিব

www.pathagar.com

নির্দিষ্ট করণ অনিবার্য নহে উক্ত চারজনের যিনিই হোননো কেন।

ليس على الإنسان التزام مذهب معين (নির্দিষ্ট কোন মযহাবের ানুসরণ করা ব্যক্তির জন্য অনিবার্য নহে) এই নীতিবাক্য দুই, সঠিকভাবে এক মযহাব পরিবর্তন করে অন্য মযহাব গ্রহণ করার ন্যায় আংশিকভাবে কোনো কোনো মসআলায় এর সমুদয় শর্তসহ পরিবর্তন করা জায়েয। তিন, একজন অজ্ঞ লোকের মযহাব পরিবর্তন জায়েয হওয়ার ন্যায় কুরআন-হাদীসে অভিজ্ঞ লোকের জন্যও পরিবর্তন জায়েয হবে। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবূ ইউসুফের (র) إذا نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة الخ। (তাহলে এখন আমাদের মদানী ভাইদের মতানুসারে আমরা আমল করব।) মন্তব্য উপরোক্ত কথার সুস্পষ্ট দলীল।

ইবনে হুমামের ব্যক্তিগত অনুরাগ

'মাফযুলের তাকলীদ প্রসংগে ইমাম ইবনে হুমামের কতিপয় ব্যাখ্যা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। মযহাবের পরিবর্তন সম্পর্কে ও তাঁর ব্যক্তিগত ঝোঁক প্রবণতা আমরা মুসাল্লামুস্ সুবূত গ্রন্থ থেকে এখানে একটি উদ্ধৃতি পেশ করছি।

মুসাল্লামুস্ সুবূত গ্রন্থকার বলেনঃ

ولو التزم مذهبا معينا كمذهب أبي حنيفة أو غيره
فهل يلزم عليه الاستمرار؟ فقيل نعم وقيل لا - إذ لا
واجب إلا ما أوجب الله ولم يوجب على أحد أن يتمذهب
بمذهب رجل من الأئمة وفي التحرير وهو الغالب
على الظن لعدم ما يوجبه شرعا - اهـ (مسلم الثبوت ص ٢٩٢)

"যদি কেউ ইমাম আবূ হানীফা (র) বা অন্য কোনো নির্দিষ্ট ইমামের অনুসরণ করা নিজের উপর অনিবার্য করে নেয়, তাহলে সে অনুসরণে সর্বদা তার অটল থাকা কি ওয়াজিব? কারো মতে ওয়াজিব, কারো মতে ওয়াজিব নয়। কেননা ওয়াজিব তো আল্লাহর পক্ষ থেকে নিধারিত হয়ে থাকে, আর আল্লাহ তায়ালা কাউকে কোনো মযহাবের সাথে সদা সর্বদা সম্পৃক্ত থাকা ওয়াজিব করে দেননি। আল্লামা ইবনে হুমাম তাঁর তাহ্রীর

www.pathagar.com

গ্রন্থে বলেন, আমিও এই মত পোষণ করি যে, নির্দিষ্ট কোনো মযহাবের উপর সর্বদা অনিবার্যরূপে সম্পৃক্ত থাকা জরুরী নয়। কেননা জরুরী বা ওয়াজিব হওয়ার জন্য কোনো শারঈ দলীল বর্তমানে নেই।"

(মুসাল্লামুস্ সুবূত, ২৯২ পৃষ্ঠা)

'মুসাল্লামুস্ সুবূত' গ্রন্থাকারের উপরোক্ত মন্তব্য দ্বারা কয়েকটি বিষয় স্পষ্টত জানা যায়। এক, নির্দিষ্ট মযহাবের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার পর অন্য মযহাব গ্রহণ করার ব্যাপারটি বিতর্কিত। কারো মতে সংশ্লিষ্ট মযহাবের সাথে সম্পৃক্ত থাকা জরুরী। কোনো অবস্থাতেই পরিবর্তন করা জায়েয নয়। কানো মতে পরিবর্তন জায়েয। সংশ্লিষ্ট মযহাবের সাথে সব সময়ের জন্যে জড়িত থাকা আবশ্যক নয়। দুই, দলীলের ভিত্তিতে প্রাধান্য প্রাপ্ত অভিমত হলো–পরিবর্তন করা জায়েয। কারণ নির্দিষ্ট মযহাবে অটল থাকা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের কোনো দলীল নেই। আর দলীল ছাড়া কোনো বিষয়কে ওয়াজিব কিংবা হারাম বলা যুক্তিসংগত নয়। আনাহ্ হাকাম অথবা ওয়াজিব গোষণা করেছেন কেবলমাত্র সেটাকেই হারাম বা ওয়াজিব বলা সঙ্গত। আল্লাহ তায়ালা চার ইমামের কোনো একজনকে অনুসরণ করা ওয়াজিব করেননি। তদ্রূপ কোনো ইমামের অনুসরণ ত্যাগ করে অন্য ইমামের অনুসরণ করাকে হারামও ঘোষণা দেননি। তিন, শীর্ষস্থানীয় তত্ত্ববিদ ইবনে হুমামের ব্যক্তিগত ঝোঁকও এদিকে যে, নির্দিষ্ট মযহাবের অনড় থাকা ওয়াজিব নয়; বরং অন্য মযহাবও গ্রহণ করা যায়। মুসাল্লাম গ্রন্থকারের মতেও এজাতীয় পরিবর্তন নিষেধ নয়; বরং জায়েয। সুতরাং তার নিজের ভাষায়ঃ

ثم الاشبه ان عمل بتحرى قلبه فلا يرجع عنه ما دام
ذالك وهل يقلد غيره فى غيره؟ المختار نعم لما علم
من استفتائهم مرة واحدا واخرى غيره - اه
(مسلم الثبوت ص ٢٩٢)

"ভারসাম্য নীতি এটাই যে, চিন্তা–ভাবনা ও মনের প্রসন্নতাসহ কোনো বিষয়ে আমল করা। যতক্ষণ পর্যন্ত মনের এই প্রবণতা বাকী থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে অনুসায়ী আমল করা উত্তম। অন্যান্য মাসআলায় অপরাপর ইমামের তাকলীদ করা পসন্দনীয়, মত অনুযায়ী জায়েয। কেননা দ্বীনী মাসাআলার ব্যাপারে পূর্ববর্তী আলেমগণের কর্মনীতি এই ছিল যে, কখনো একজন

www.pathagar.com

আলেম থেকে আবার কখনো অন্যান্যদের থেকে ফত্ওয়া জিজ্ঞেস করে তার উপর আমল করতেন। (মুসাল্লামুস্ সুবূত, ২৯২ পৃষ্ঠা)

তাকলীদ ও মযহাব পরিবর্তন সম্পর্কিত হানাফী মতালম্বী প্রামাণ্য আলেমগণের এই হলো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। এ ব্যাখ্যায় যে তত্ত্ব আমাদের সামনে দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয় তা এই ছোটখাটো ও খুঁটিনাটি বিষয়ে কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে মযহাব চতুষ্টয়ের যার ওপর অধিক নির্ভরতা থাকে তারই অনুসরণ করা যাবে। শরীয়তের নির্দিষ্ট কোনো মযহাবের অনুসরণ করা ওয়াজিব কিংবা জরুরী নয় এবং তার সাথে স্থায়ীভাবে জড়িত থাকাও অনিবার্য নয় বরং ফিকাহ্র অন্য মযহাবে সম্পৃক্ত হয়ে আমল করাও জায়েয। একইভাবে যদি কেউ নির্দিষ্ট কোনো মাযহাবের সাথে সম্পৃক্ত থাকা অবস্থায় অন্য মযহাবের এমন একটি মাসআলার অনুসরণ করতে চায়, যা কুরআন-হাদীসের সাথে অধিকতর সুসামঞ্জস্যশীলরূপে প্রমাণিত তাহলে তার জন্যে সেটাও জায়েয। তবে শর্ত হলো এ পরিবর্তন সঠিক চিন্তা ও গবেষণার ভিত্তি, দ্বীনী উদ্দেশ্যে ও শরীয়তের স্বার্থে হতে হবে। বৈষয়িক সম্পদ কিংবা জাগতিক উদ্দেশ্য সাধন অথবা মযহাবের সাথে হাসি-তামাশা করা উদ্দেশ্য না হওয়া। অন্যথায় এরূপ করা মস্তবড় অপরাধ ও নিকৃষ্টতম পাপ বিবেচিত হবে।

একটি অভিযোগ

এখানে একটি জোরালো সন্দেহের উদ্রেক হয় যার প্রতিকার সঠিক ও যুক্তিসংগত উপায়ে না হওয়া পর্যন্ত মাসআলা অস্পষ্ট থেকে যায়। প্রশ্নটি হলো বিগত আলোচনায় ফকীহ্দের পেশকৃত ব্যাখ্যায় সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, এক মযহাব পরিবর্তন করে অন্য মযহাব গ্রহণ করা জায়েয এবং ফকীহ্দের মতে এটা কোনো গুনাহ বা অপারাধ নয়। অথচ অন্যত্র তাঁদেরই ভাষ্য হলোঃ

الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا وهو المختار فى المذهب

"এক মযহাব অনুযায়ী আমল করার পর অন্য মযহাবে চলে যাওয়া সর্বসম্মতিক্রমে বাতিল। মযহাবের দৃষ্টিতে এটাই স্বীকৃত কথা।" আর তাঁদের লেখায় একথাও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে ঃ ارتحل الى مذهب الشافعى يعزر ام

"হানাফী মযহাব পরিত্যাগ করে শাফঈ মযহাব গ্রহণ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে।" এরূপ স্ববিরোধী উক্তি ও ফত্ওয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের উপায় কি? শাস্তির স্বরূপই বা কি ধরনের হবে?

www.pathagar.com

জবাব

ফকীহগণ নিজেরাই এই সন্দেহ অনুধাবন করেছেন এবং মযহাব পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা পর্বে বিভিন্ন জবাবের মাধ্যমে তা নিরসনেরও চেষ্টা করেন। আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী তাঁর প্রখ্যাত রদ্দুল মুহতার (দুরুল মুখতারের টীকা) গ্রন্থের যেখানেই এ বিষয়ের আলোচনা করেছেন সেখানেই তিনি এর একাধিক জবাবও দিয়েছেন। পাঠকদের চিন্তার সুবিধার্থে নিম্নে সেগুলোর উদ্ধৃতি পেশ করা হলঃ

প্রথম জবাব

আলোচ্য প্রশ্নের এক উত্তর এই দেয়া হয়েছে যে, মযহাব পরিবর্তন এবং তাকলীদ থেকে ফিরে আসা বা তাকলীদ পরিত্যাগ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ তখনই গণ্য হবে, যখন দ্বীনী স্বার্থ কিংবা শরীয়তের লক্ষ্যে নয়; বরং পরিবর্তন বা পরিত্যাগের উদ্দেশ্য হয় প্রবৃত্তির অনুসরণ, বৈষয়িক উদ্দেশ্য সাধন অথবা মযহাবের সাথে হাসি-তামাশা করা। মযহাবের এ জাতীয় পরিবর্তন বা পরিত্যাগ অবশ্যই বাতিল ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ গণ্য হবে। কেননা এতে দ্বীনের সাথে হাসি-ঠাট্টা ও ব্যংগ-বিদ্রূপ করা প্রমাণ হয়। এ জাতীয় আচরণ যার দ্বারাই সংঘটিত হোক শাস্তি তাকে পেতেই হবে।

কিন্তু পরিবর্তনের উদ্দেশ্য যদি সৎ ও মহৎ হয়, অসৎ ও অসংগত না হয়, বরং দ্বীনী উদ্দেশ্য সাধন ও পরিপূর্ণ করণ হয় এবং শরীয়তের মাপকাঠি ও দলীলের ভিত্তিতে হয় তাহলে এ পরিবর্তন নিঃসন্দেহে জায়েয এবং নেক কাজ হিসেবে পসন্দনীয় গণ্য হবে। এ ধরনের পরিবর্তনের জন্য সওয়াবের আশা করাও অমূলক নহে। আবু বকর জওযজানীর (র) নিম্নোক্ত ভাষ্যে এরি প্রতি ইঙ্গিত ব্যক্ত হয়েছেঃ

ولو ان رجلا برئ من مذهبه باجتهاد وضح له
كان محمودا ماجورا-

"যদি কেউ সুস্পষ্ট ইজতিহাদের ভিত্তিতে স্বীয় মযহাব থেকে মুক্ত হওয়া গ্রহণ করে তাহলে এটা হবে তার শুভ তৎপরতা এবং প্রতিদানযোগ্য আচরণ।"

এ জবাব দ্বারাই ফকীহগণের বিভিন্ন মন্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা সহজ এবং শাস্তিমূলক ফতওয়ার ক্ষেত্র ও পাত্র নির্ধারণ করা সম্ভব। শাস্তি

www.pathagar.com

দেয়ার ফত্ওয়ার বিরূপ এমন হতে পারে, যে পরিবর্তনের উদ্দেশ্য হবে অসৎ এবং প্রবৃত্তি তাড়িত সে পরিবর্তন অবশ্যই ঘৃণিত, অবজ্ঞেয় ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আর যা হবে শরীয়ত ভিত্তিক ও মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত অবশ্যই তা প্রশংসিত ও গ্রহণীয়। এরূপ কর্মের প্রতিদানে সওয়াবের আশা করাও অমূলক নহে।

উপরোক্ত জবাবের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে ارتحل الى مذهب الشافعى يعزر বাক্যের ব্যাখ্যায় আল্লামা শামী লিখেছেন–

ای اذا كان ارتحاله لا لغرض محمود شرعا. اه

"অর্থাৎ, সে পরিবর্তন শরীয়তের দৃষ্টিতে সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্যে সংঘটিত না হওয়া অবস্থায় অবশ্যই তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিবেচিত হবে।"

আল্লামা শামী তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে তাতারখানীয়ায় উল্লেখিত আল্লামা আবূ বকর জওযজানীর বিস্তারিত ফতওয়া উদ্ধৃত করেছেন। যার আলোচনা আগেই করা হয়েছে যে, বৈষয়িক স্বার্থ হাসিল, মযহাবের সাথে উপহাস করা এবং আবেগ তাড়িত হয়ে মযহাব পরিবর্তন করা হলে অবশ্যই তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে। পক্ষান্তরে সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত পরিবর্তন অবশ্যই গ্রহণীয় ও প্রশংসিত। এর বিনিময়ে প্রতিদানের আশা করাও অসঙ্গত নহে।

মোটকথা, বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধারের অভিপ্রায়ে মযহাব পরিবর্তন করা না-জায়েয বা হারাম। সঠিক ইজতিহাদ ও দ্বীনের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে মযহাবের পরিবর্তন জায়েয এবং প্রতিদানযোগ্য বস্তুত পরিবর্তনের মাধ্যমে মাযহাবের সাথে উপহাস বা ব্যংগ করার প্রবণতা রোধ করার কৌশল হিসেবে শাস্তির কথা বলা হয়েছে উপরন্তু পরিবর্তনের অবাধ গতি প্রবাহিত না হওয়া, মযহাবের প্রতি উপহাস করার সুযোগ সৃষ্টি না হওয়া ও ফতওয়ার অন্যতম লক্ষ্য। যেহেতু পরিবর্তন মূলত– নাজায়েয ও হারাম। অতএব দ্বীনী উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও বাস্তবে মযহাব পরিবর্তন করা অপরিহার্য না হওয়া ইত্যাদির অভিপ্রায়ে সাধারণভাবে ফতওয়া দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় জবাব

প্রশ্নের দ্বিতীয় জবাবে বলা হয়েছে, যে পরিবর্তন ও তাকলীদ করা থেকে ফিরে থাকার কারণে 'তালফীকের[১] সৃষ্টি হয় সে পরিবর্তনকেই বাতিল বলা

---

১. একই কর্মে দ্বৈত নীতি গ্রহণ করা

www.pathagar.com

হয়েছে। কেননা, তালফীক সর্ব সম্মতিক্রমে না–জায়েয। সুতরাং যে পরিবর্তনের মধ্যে 'তালফীক' পাওয়া যাবে তা না–জায়েয হবে। আল্লামা শামী এ জবাব ইবনে হযর, রমলী এবং ইবনে কাশিম প্রমুখ থেকে উদ্ধৃত করেছেন। সুতরাং দুরে মুখতারের ان الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا اھ (১ম খন্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা) ভাষ্যের ব্যাখ্যায় তিনি লিখেন–

وهو محمول كما قال ابن حجر والرملي وابن قاسم على ما
اذا بقي من آثار الفعل السابق اثر يؤدي الى تلفيق العمل
بشيء لا يقول به كل من المذهبين كتقليد الشافعي في
مسح بعض الرأس ومالك في طهارة سؤر الكلب في
صلوة واحدة اھ (رد المحتار ج ١ ص ٧٧)

"ইবনে হযর, রমলী এবং ইবনে কাসেমের মতে তাকলীদের পরিবর্তন বাতিল বলে সে সময় গণ্য হবে, যখন পূর্ববর্তী মযহাব অনুসৃত কাজের অবশিষ্ট চিহ্ন এমন কর্মের সাথে একত্রিত হবে যা কোনো মযহাব মতেই সহীহ নয়। যেমন, এক ব্যক্তি ইমাম শাফেঈর (র) মতানুসারে অযু করতে গিয়ে মাথার কিছু অংশ মসেহ করলো এবং ইমাম মালেকের (র) মাযহাব অনুসরণ করে কুকুরের ব্যবহৃত পানি দ্বারা অযু করতঃ সে অযু দ্বারাই নামায পড়লো।" (রদ্দুল মুহতার, ১ম খন্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা)

এমতাবস্থায় কারো মতেই অযু শুদ্ধ হয়নি ইমাম শাফেঈর (র) মতে নাপাক পানি ব্যবহার করার দরুন আর ইমাম মালেকের মতে সমস্ত মাথা মসেহ না করার দরুন অযু শুদ্ধ হয়নি। অযু যখন কারো মতেই সহীহ হয়নি তখন সে অযুতে নামায অশুদ্ধ হওয়া বলাই বাহুল্য।

এ ধরনের কাজের মধ্যে 'তালফীক' বর্তমান। কেননা এই অযুতে ইমাম মালেক (র) বা ইমাম শাফঈ (র) কারোই পূরাপুরি অনুসরণ করা হয়নি। বরং পানির ব্যবহারে ইমাম শাফঈর (র) অনুসরণ ত্যাগ করে ইমাম মালেককে (র) অনুসরণ করা হয়েছে। অপর দিকে, মাথা মসেহের ব্যাপারে ইমাম মালেকের (র) অনুসরণ ত্যাগ করে ইমাম শাফঈকে (র) অনুসরণ করা হয়েছে। এভাবে অযু এবং নামায উভয় কাজে দু' মাযহাবের মধ্যে 'তালফীক' দ্বৈতনীতি গ্রহণ

www.pathagar.com

করা হয়েছে যা সকলের মতেই না-জায়েয। 'তালফীক' না হলে মযহাব পরিবর্তন করা নিষিদ্ধ নয় বরং জায়েয।

'তালফীকের' ব্যাখ্যা

'তালফীক' হলো কোনো কাজে এমন দু'টি বিষয় একত্রিত হওয়া যার একটি একজন মুজতাহিদের দৃষ্টিতে সে কাজের জন্য অনিষ্টকর কিন্তু অপর মুজতাহিদের দৃষ্টিতে অনিষ্টকর নয়। আর দ্বিতীয় বিষয়টি প্রথম মুজতাহিদের দৃষ্টিতে কাজের অনিষ্টকর নয় কিন্তু দ্বিতীয় মুজতাহিদের দৃষ্টিতে অনিষ্টকর। এভাবে এমন ধরনের দু'টি নির্দেশের সমাহারপূর্ণ কাজ কোনো মুজতাহিদের মতেই সহীহ হতে পারে না। এমতাবস্থায় যদি কেউ একজন মুজতাহিদের মতে জায়েয কোনো কাজের অনুসরণ করে আবার সে অবস্থায় অপর একজন মুজতাহিদের মতে জায়েয অপর একটি কাজের অনুসরণ করে তাহলে এটা 'তালফীক' হবে। বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে আল্লামা শামী এভাবে ব্যক্ত করেছেনঃ

مثاله متوضئ سال من بدنه دم ولمس امرأة ثم صلى
فان صحة هذه الصلوٰة ملفقة من مذهب الشافعي
والحنفي والتلفيق باطل فصحتها منتفية (شامی ج ۱ ص ۶۹)

"তালফীকের উদাহরণ হলো-একজন লোক অযু করার পর তার শরীর থেকে রক্ত বের হলো। সে ব্যক্তি কোনো মহিলাকেও যৌন কামনাসহ স্পর্শ করলো। এরূপ করার পর সে নামায পড়লো। এই নামাযকে সহীহ গণ্য করলে শাফঈ ও হানাফী উভয় মযহাবের সাথে 'তালফীক' দ্বৈতনীতি গ্রহণ করা হবে যা কারো মতেই জায়েয নয়। সুতরাং নামাযও শুদ্ধ হবে না।" (শামী, ১ম খন্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা)

এখানে কথিত ব্যক্তির অযুর মধ্যে দু'টি বিষয় সমাহার ঘটেছে। একটি হলো তার শরীর থেকে রক্ত বের হওয়া, যা ইমাম শাফঈর (র) মতে অযু ভংগকারী না হলেও ইমাম আবু হানীফার (র) মতে অযু ভংগকারী। দ্বিতীয়টি হলো-কামভাবসহ নারী স্পর্শ করল, যা ইমাম আবূ হানীফার (র) মতে অযু ভংগকারী না হলেও ইমাম শাফঈর (র) মতে অযুভংগকারী। এ অযু দ্বারা কারো মতেই নামায সহীহ হবে না। এই লোকটিই রক্ত বের হওয়ার ব্যাপারে

www.pathagar.com

ইমাম শাফঈর (র) অনুসরণ করে এবং ইমাম আযমের অনুসরণ ত্যাগ করে, অপরদিকে কামভাবসহ নারী স্পর্শ করার ব্যাপারে ইমাম শাফঈর (র) অনুসরণ ত্যাগ করতঃ ইমাম আবূ হানীফাকে (র) অনুসরণ করে নামায সহীহ হওয়ার দাবী করলে এটাই হবে 'তালফীক' তথা দ্বৈতনীতি। কেননা এ ক্ষেত্রে তার একই কাজে দু'জন ইমামের অনুসরণ করা, না করা উভয়ই বর্তমান পাওয়া গেল। এরূপ আমল সর্ব সম্মতিক্রমে না জায়েয। কারণ এ ধরণের তৎপরতায় কোনো ইমামেরই পরিপূর্ণ অনুসরণ করা প্রমাণিত হয় না। বরং এতে প্রবৃত্তির গোলাম হওয়াই বুঝায়। আর দ্বীনের ব্যাপারে প্রবৃত্তিপূজারী হওয়া সম্পূর্ণ না-জায়েয। অতএব, এ ধরনের তাকলীদ ও পরিবর্তন জায়েয নয়।

দ্বিতীয় জবাবের সারকথা হল- 'তালফীক' দোষে দোষণীয় পরিবর্তন বাতিল ও না-জায়েয। এরূপ না-জায়েয কাজের দ্বার রুদ্ধ করার অভিপ্রায়েই শাস্তিযোগ্য অপরাধের ফত্ওয়া দেয়া হয়েছে। যে পরিবর্তনে 'তালফীক' নেই তা নিষিদ্ধ বা না-জায়েয নয়।

তৃতীয় জবাব

কথিত সন্দেহের তৃতীয় জবাব হলো-আগের অনুসরণীয় মযহাবের অনুসরণে কৃত সমস্ত কাজ কর্মকে নব গৃহীত মযহাবের আলোকে অশুদ্ধ বা বাতিল মনে করে মযহাব পরিবর্তন করাকে ফকীহগণ বাতিল বা নিষিদ্ধ বলেছেন। এর অর্থ সেই পরিবর্তন যদ্বারা আগের মযহাবের অনুকরণেকৃত সমস্ত কাজকে নিষ্ফল ও বেকার মনে করার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে لاتبطلوا اعمالكم ("তোমাদের আমলসমূহ নষ্ট করে দিওনা।") আয়াতের আলোকে এরূপ মনে করা না-জায়েয।

এ ধরনের মনোভাব নিয়ে মযহাব পরিবর্তন করা উক্ত ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে বিধায় ফকীহগণ এরূপ পরিবর্তন থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আগের মযহাব অনুসরণে কৃত আমল যদি বাতিল বা অশুদ্ধ মনে না করা হয়; বরং মোত্তলিকে সঠিক গণ্য করে বহাল রাখা হয় এবং বিশুদ্ধতার অধিকতর উদ্দেশ্যে মযহাবের পরিবর্তন করা হয়, তাহ'লে সেটা না-জায়েয বা নিষিদ্ধ নয়। ইমাম সুবকী (র) ও তাঁর অনুসারীগণ এ জবাবই দিয়েছেন। আল্লামা শামী (র) বলেনঃ

او هو محمول على منع التقليد فى تلك الحادثة بعينها

www.pathagar.com

لا مثلها كما صرح به الامام السبكي وتبعه جماعة وذالك
كما لو صلى ظهرا بمسح ربع الراس مقلدا للحنفي فليس
له ابطالها باعتقاد لزوم مسح الكل مقلدا للمالكي - واما
لو صلى يوما على مذهب واراد ان يصلي يوما اخر على غيره
فلا يمنع منه اه (رد المحتار ج ا ص ٧٠)

"অথবা আগের তাকলীদের অনুসারে কৃত কাজ বাতিল মনে করে নতুন তাকলীদ করাকে নিষিদ্ধ বলা হয়েছে। যেমন ইমাম সুবকী ও তাঁর একদল অনুসারী বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, একজন লোক ইমাম আযমের মতানুসারে মাথার এক-চতুর্থাংশ মসেহ করে সে অযু দ্বারা জোহর নামায আদায় করলো। অতপর ইমাম মালেকের মতানুসারে সমস্ত মাথা মসেহ করা ফরয মনে করে সে লোকটির জোহর নামায শুদ্ধ হয়নি ধারণা করা না-জায়েয। কিন্তু সে একদিন এক মযহাব অনুসারে নামায পড়ার পর দ্বিতীয় দিন অন্য মযহাব মতে নামায পড়ার ইচ্ছা করলে তাকে কিছুতেই বারণ করা যাবে না।" (রদ্দুল মুহতার, ১ম খন্ড, ৭০ পৃষ্ঠা)

মোটকথা, আগের তাকলীদ অনুযায়ী কৃত আমল সহীহ গণ্য করে নতুন মযহাব গ্রহণ করাতে কোনো বাধা নেই। বস্তুত নতুন মযহাবের দৃষ্টিতে পূর্ব আমল বাতিল বা অশুদ্ধ মনে করতঃ অনুসৃত পরিবর্তনই কেবল না-জায়েয।

চতুর্থ জবাব

আলোচ্য প্রশ্নের চতুর্থ জবাব এই দেয়া হয়েছে যে, এক মযহাব পরিত্যাগ করে অন্য মযহাব গ্রহণে নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে ফকীহগণ একমত নন, বরং প্রসংগটি বিতর্কিত। বিতর্কিত বিষয়ে দু'টি মতের যে কোন একটির উপর আমল করা জায়েয। সুতরাং বৈধপন্থীদের মযহাব অনুসরণও দোষণীয় হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে ইবনে আবেদীন শামী আল্লামা শরম্বুলালী সূত্রে নিম্নোক্ত জবাব উদ্ধৃত করেছেন যথাঃ

على ان في دعوى الاتفاق نظرا فقد حكى الخلاف فيجوز
اتباع القائل بالجواز - كذا افاده العلامة الشرنبلالي في العقد
الفريد . (رد المحتار ج ا ص ٧٠)

www.pathagar.com

"তাছাড়া এ ব্যাপারে ঐক্যমতের দাবী ভিত্তিহীন। কেননা মাসআলায় মতবিরোধও উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং জায়েয পন্থীদের অনুসরণও সঙ্গত হতে পারে। আল্লামা শরম্বুলালী (র) ইকদুল ফরীদে এজাতীয় মন্তব্যই করেছেন।" (রদ্দুল মুহতার, ১ম খন্ড, ৭০ পৃষ্ঠা)

মযহাব পরিবর্তনের ব্যাপারে যদিও মতবিরোধ বিদ্যমান তথাপি এ ব্যাপারে সাধারণভাবে জায়েয হওয়ার মতই অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও সঠিক আংশিক বা সার্বিক যেভাবেই হোক না কেন। একথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। তবে শর্ত হলো পরিবর্তনের শর্তাবলী যথাযথ অনুসৃত হতে হবে, যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। অর্থাৎ, প্রবৃত্তি তাড়িত, আবেগ প্রসূত, পার্থিব স্বার্থোদ্ধার কিংবা মাযহাবের প্রতি অবজ্ঞার মনোবৃত্তি নিয়ে নয়, বরং পরিবর্তন হতে হবে পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জিত ইজতিহাদ প্রসূত। ইতিপূর্বে আলোচিত আবূ বকর জওযজানী, ইবনে হুসাম ও আল্লামা শরম্বুলালীর বিশ্লেষণ এ বিষয়ে আইনগত মর্যাদার দাবীদার।

বিগত আলোচনার সারমর্ম

আগের আলোচনায় হানাফী মতাবলম্বী শাস্ত্রজ্ঞ আলেমগণের যে মতামত উল্লেখ করা হয়েছে তার সারমর্ম নিম্নরূপঃ

একঃ মযহাবের ইমামগণ নিজেরা আইনদাতা নন। তাঁদের বিশেষ কোনো মযহাবের তাক্লীদ করা দ্বীনের মূল বিষয় নয়। আর মৌলিক সত্ত্বগতভাবে ইহা ওয়াজিবও নহে বরং আমল দ্বীনের উপর আমল করার ইহা একটি নির্ভরযোগ্য উপায় বিশেষ।

এর প্রমাণ, ফকীহগণের বিশুদ্ধতর মতে মযহাব পরিবর্তন করা জায়েয। যাকেই ইমামগণ তাঁদের দৃষ্টিতে আইনদাতা আর তাঁদের মযহাবের অনুসরণ দ্বীনের মৌলিক বিষয় হলে এর পরিবর্তন কোনো অবস্থাতেই জায়েয ছিলনা। বরং সর্বাবস্থায় একই ইমামের অনুসরণ করা অপরিহার্য সাব্যস্ত হতো। কারণ, দ্বীনের মূল অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া কোন অবস্থায়ই স্বীকৃত হতে পারে না।

দুইঃ মযহাবকে দ্বীনের মূল এবং ইমামকে স্বতন্ত্র আইনদাতা বা একমাত্র অনুকরণীয়-বরণীয় মনে না করা অবস্থায়ই কেবল তাক্লীদ করা জায়েয হতে পারে। দ্বীনী বিধানের ব্যাপারে কুরআন-হাদীসের অকাট্য দলীল পাওয়া গেলে তাক্লীদী মত তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করে অকাট্য প্রমাণ ভিত্তিক আমল করা

www.pathagar.com

অপরিহার্য স্বীকার করতে হবে। প্রত্যেক মযহাবের শাস্ত্রজ্ঞ আলেমগণের বর্ণনা মতে স্বয়ং ইমামগণের বিশ্লেষণের আলোকে মযহাবের এ মর্যাদা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই প্রমাণ হয়। যেমন বলা হয়েছেঃ

لا يحل لاحد ان يعمل بقولنا مالم يعلم من اين قلناه

"আমাদের মতের উৎস জ্ঞাত না হওয়া পর্যন্ত এর অনুসরণ করা কারো পক্ষে জায়েয হবে না।"

অথবা কোনো ইমাম বলেছেনঃ اذا صح الحديث فهو مذهبي

অর্থাৎ, "মযহাবের খেলাফ কোনো সহীহ হাদীস পাওয়া গেলে সে অনুযায়ী আমল করাই হলো আমার মযহাব।"

এ ধরনের বিশ্লেষণ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম ও মুজতাহিদগণ নিজেদেরকে আইনদাতা কিংবা নির্দেশদাতা রূপে পেশ করেননি। বরং একজন মুখপাত্র, ব্যাখ্যাতা বা বিবৃতকারী হিসেবে পেশ করেছেন। নিজেদের তাকলীদকে আসল দ্বীন নয় বরং আসল দ্বীন পালন করার একটি নির্ভরযোগ্য মাধ্যম বলেছেন। তাঁরা সকলেই নিজেদের সমস্ত অনুসারীদের নির্দেশ দিয়ে গেছেন আমাদের মতের খেলাফ সহীহ ও নির্ভুল অকাট্য ও সন্দেহাতীত কুরআন-হাদীসের নির্দেশ পাওয়া গেলে সেটাই হবে অবশ্য গ্রহণীয় এবং আমাদের মত হবে পরিত্যাজ্য ও বর্জনীয়।

তাকলীদ সম্পর্কে উপরে যে দৃষ্টিভংগী ব্যাখ্যা করা হয়েছে শাস্ত্রজ্ঞ ফকীহগণ সে নীতিই পালন করেছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই তাঁরা মযহাবী ইমামগণের তাকলীদ করেছেন। সুতরাং আবূ বকর জওযজানীর (র) নিম্নোক্ত ভাষ্য যা-ইতিপূর্বে ফত্ওয়ার অন্তরালে ব্যক্ত হয়েছে প্রনিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন-

ولو ان رجلا برئ من مذهبه باجتهاد وضح له كان محمودا ماجورا

(অর্থাৎ, পরিশুদ্ধ ইজতিহাদের ভিত্তিতে কারো স্বীয় মযহাব পরিবর্তন করা প্রশংসিত ও প্রতিদানযোগ্য আমল।।)

শরঈ দলীল ও সঠিক ইজতিহাদের ভিত্তিতে তাকলীদের পরিবর্তন কেবল জায়েয নয়, বরং আবূ বকর জওযজানীর মত প্রাজ্ঞ আলেমের মতে প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এমতাবস্থায় কুরআন ও হাদীসের মুকাবিলায় তাকলীদ পরিত্যাগ করা

www.pathagar.com

ফরয সাব্যস্ত হওয়া উচিত। কারণ, ليس لاحد مع الله ورسوله كلام আল্লাহ ও রসূলের মুকাবিলায় কারো কথা গ্রহণযোগ্য নয় বরং দৃষ্টিপাত যোগ্যও না হওয়া একটি স্বীকৃত ও মৌলিক নীতি। সাইরুল্লাহর তাকলীদ করা মূলত اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله (অর্থাৎ, আল্লাহকে বর্জন করে নিজেদের আলেম ও ধর্ম যাজকদের তারা প্রভু বানিয়ে নিয়েছে।) আয়াতেরই নামান্তর নয়তো আর কি।

তিনঃ ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) সম্পর্কে শ্রুতি রয়েছে যে, তাঁরা স্বীয় উস্তাদ ইমাম আবূ হানীফার (র) সাথে মতপার্থক্য থাকার দরুন প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মাসআলায় নিজেদের ইমামের তাকলীদ-মুক্ত আমল করেছিলেন। এভাবে প্রত্যেক মযহারের শাস্ত্রজ্ঞ আলেমগণ ছোটখাটো ব্যাপারে উদ্ভাবনও ইলমী গবেষণার ভিত্তিতে স্বীয় মযহাব ছাড়া অন্যান্য মযহাবের অনুসরণ করতেন। কিন্তু কেউ তাদেরকে গোমরাহ মনে করতো না এবং মযহাবের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারীও আখ্যা দিত না।

চারঃ অবশ্য ফকীহগণের মতে চার মযহাবের গন্ডী অতিক্রম করা জায়েয নয়। যে নিজে ইজতিহাদ করার যোগ্যতা রাখে না, যেই হোন তার জন্য যে কোনো ইমামের অনুসরণ করা কর্তব্য।

পাঁচঃ পরিবর্তন অবস্থায় পূর্বের মযহাব অনুসারে কৃত আমল বাতিল বা মূল্যহীন হবে না; বরং বিশুদ্ধ ও বহাল থাকবে। নবগৃহীত মযহাবের দৃষ্টিতে পূর্ব মযহাব অনুসারে কৃত আমলসমূহ বাতিল, এ কথা জায়েয কিংবা আদৌ গ্রহণযোগ্য নহে।

ছয়ঃ এ পরিবর্তন আলেম অনালেম উভয়ের জন্যই জায়েয। কিন্তু শর্ত হলো-পরিবর্তনের উদ্দেশ্য হতে হবে সৎ ও দ্বীনী স্বার্থ সংরক্ষণ। বাতিল ও অসৎ উদ্দেশ্যে অনুসৃত পরিবর্তন অস্বীকৃত ও না-জায়েয বৈ-নয়।

একটি ব্যাখ্যামূলক নোট

বলাবাহুল্য বর্তমান যুগ চরম ব্যক্তিস্বাধীনতা ও লাগামহীন মানসিকতার প্রবাহকাল। কাজেই সাধারণ লোক ও যেসকল আলেমদের জন্য মযহাব পরিবর্তন করা নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়া উচিত, যাদের মধ্যে ইজতিহাদের যোগ্যতা বলতে নাই এমনকি কুরআনী জ্ঞান পারদর্শিতা এবং হাদীস

www.pathagar.com

সম্পর্কেও সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী নয়। কেননা এ জাতীয় আলেম সাধারণ লোকের মধ্যেই শামিল। অবশ্য যে সকল আলেম কুরআন–হাদীসের জ্ঞান প্রাজ্ঞ–পারদর্শী, শরীয়তের যাবতীয় হুকুম–আহকামের সূক্ষ্ম ও তত্ত্ব জ্ঞানের ব্যুৎপত্তিশীল, উপরন্তু ফুকাহা ও মুজতাহিদগণের উদ্ভাবন নীতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী, এ জাতীয় জ্ঞান তাপস ও মনীষী আলেমগণ স্বীয় প্রজ্ঞা ও উদ্ভাবন শক্তি বলে আধুনিক যুগ সমাস্যার সমাধানে যদি ফকীহদের তত্ত্ববহুল অভিমতের সাহায্য নেন অথবা দু'টি ভিন্ন ফিক্হী মযহাবের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ সাপেক্ষে শাখাগত বিষয়ে কুরআন–হাদীসের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যশীল মযহাবের অনুসরণ করে, তাহলে এতে আপত্তির কিছু থাকতে পারে না এবং তাঁরা গায়র মুকাল্লিদও সাব্যস্ত হবেন না।

উপরে হানাফী মতাবলম্বী আলেমগণের ব্যাখ্যা পেশ করা হয়েছে। এবার মযহাব পরিবর্তন বিষয়ে শাফঈ (র) ও মালেকী (র) মযহাবের তত্ত্ব ও তথ্যমূলক আলোচনায় প্রয়াস নেয়া হবে।

শাফঈ ও মালেকী আলেমগণের তত্ত্বভিত্তিক উপস্থাপনা

তাক্লীদ ও মযহাব পরিবর্তন বিষয়ে হানাফী আলেমদের সাথে শাফঈ ও মালেকী আলেমদের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য নেই। উদ্দেশ্য সৎ ও শরীয়তসম্মত হলে পরিবর্তন করা সবার নিকট জায়েয অসৎ উদ্দেশ্য, পার্থিব স্বার্থ ও মযহাবের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনমূলক হলে সর্বসম্মতি ক্রমে হারাম ও না–জায়েয।

ইমাম শা'রানীর দৃষ্টিতে মযহাবের পরিবর্তন

'যেসব মাসআলায় মুজতাহিদগণের মতপার্থক্য চলে আসছে এতে তাঁরা সকলেই কি হকপন্থী, নাকি তাঁদের একজন মাত্র সত্যাশ্রয়ী বাদবাকী সকলের মত ভ্রান্তিপূর্ণ? –এ প্রশ্নে ওলামাদের মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়। এ সম্পর্কে ইমাম শা'রানী ও অপরাপর বহু মুহাক্কিক আলেমের মত হলো– كل مجتهد مصيب "সকল মুজতাহিদই হকপন্থী। কোনো মুজতাহিদের ইজতেহাদী রায় ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। স্বমতের সমর্থনে তিনি যেসব দলীল পেশ করেছেন সেক্ষেত্রে মযহাব পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয় দ্বারাও তিনি অনুকূল আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। সুতরাং ইমাম শা'রানী লিখেনঃ

www.pathagar.com

وممايؤيد هذا الميزان عدم انكار اكابر العلماء فى
كل عصر على من انتقل من مذهب الى مذهب الامن
حيث يتبادر الى الاذهان من توهم الطعن فى ذالك الامام
الذى خرج من مذهبه لاغير - بدليل تقريرهم لذالك
المنتقل على المذهب المنتقل اليه اذ المذاهب كلها
عندهم طريق الى الجنة فكل من سلك طريقا منها او
صلته الى الجنة - اه (ميزان ص ٣٩)

পূর্ববর্তী শীর্ষস্থানীয় আলেমগণের কেউ কোনো সময়ই এক মযহাব ছেড়ে অন্য মযহাব গ্রহণকারী ব্যক্তির একাজে অস্বীকার করেননি একথাটি আলোচ্য মিযানের (প্রত্যেক মুজতাহিদ হকপন্থী হওয়ার প্রসংগ) সমর্থনকারী। তবে শর্ত হলো আগের ইমামকে হেয় বা অবজ্ঞা করার উদ্দেশ্য না থাকা অপরিহার্য। যে নব মযহাবকে সে গ্রহণ করলো সে মযহাব আকড়ে থাকার অনুমতিই প্রকারান্তরে বাধা না দেয়ার প্রমাণ। কারণ আলেমগণের মতে সমস্ত মযহাবই জান্নাত লাভের উপায়। তন্মধ্যে মানুষ যে রাস্তারই পথযাত্রী হবে সে পথ ধরেই সে বেহেশ্‌তে পৌছতে সক্ষম হবে।" (মীযান, ৩৯ পৃষ্ঠা)

ইমাম শা'রানী (র) শাফঈ মতাবলম্বী একজন শীর্ষপর্যায়ের আলেম ও তত্ত্ববিশারদ ছিলেন। তিনি ইলমে তাসাউফেরও একজন স্বীকৃত ইমাম হিসেবে গণ্য ছিলেন। উপরোক্ত ভাষ্যে দু'টি বিষয় তিনি স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। এক, পূর্ববর্তী ওলামাগণের যুগ থেকেই ফিকার এক মযহাব ছেড়ে অন্য মযহাব গ্রহণ করার প্রবণতা অব্যাহত ছিল। কিন্তু অনুকরণীয় আলেমগণ একে অবজ্ঞা করেননি, কাউকে বাধা দেননি কিংবা পূর্বেকার মযহাবে ফিরে যাওয়ার জন্যে কোনো প্রকার নির্দেশও দেননি। এতে প্রমাণ হয় যে, তাঁদের মতে মযহাব পরিবর্তন না-জায়েয নহে। দুই, পূর্ববর্তী আলেমদের মতে ফিক্‌হী মযহাবের সবগুলিই ইসলামী শরিয়ত সম্মত এবং জান্নাত প্রাপ্তির উপায় বিশেষ। কেননা, ইসলামই সকলের জন্যে হেদায়াত প্রাপ্তির উৎস ও প্রস্রবণ। ইমাম সাহেবের উক্তিতে তৃতীয় যে বিষয়টি জানা যায় তাহলো-মযহাব পরিবর্তনের উদ্দেশ্য প্রবৃত্তির কামড় কিংবা প্রথম ইমামের প্রতি উপহাস করা

www.pathagar.com

হলে ইহা হারাম ও না–জায়েয। কারণ এ দ্বারা মযহাবের সাথে উপহাস–অবজ্ঞা করার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

মযহাব পরিবর্তন বিষয়ে
ইমাম ইবনে আবদুল 'বার' এর অভিমত

ইতিপূর্বে ইমাম শা'রানী মযহাব পরিবর্তন বিষয়ে অন্যান্য তত্ত্ববিশারদ আলেমগণের মতামত উদ্ধৃত করেছেন। যদ্বারা كل مجتهد مصيب ام لا অর্থাৎ সকল মুজতাহিদ হকপন্থী কি–না? তার মতের সমর্থন পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ এদ্বারা তাকলীদ ও মযহাব পরিবর্তন বিষয়ের ব্যাখ্যা লক্ষ্য করার মত। সুতরাং এ সম্পর্কে তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় মালেকী ইমাম ইবনে আবদুল 'বার' এর অভিমত উল্লেখ করেছেনঃ

وكان الامام ابن عبد البر رحمه الله يقول ولم يبلغنا
عن احد من الائمة انه امر اصحابه بالالتزام مذهب
معين لا يرون صحة خلافه بل المنقول عنهم تقريرهم
الناس على العمل بفتوى بعضهم بعضا لانهم كلهم على
هدى من ربهم ـ وكان يقول ايضا لم يبلغنا فى حديث
صحيح ولا ضعيف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
امر احدا من امته بالتزام مذهب معين لا يرى خلافه
وما ذالك الا لان كل مجتهد مصيب ـ اه (ميزان ص ٣٩)

"ইমাম ইবনে আবদুল 'বার' (র) বলতেনঃ কোনো ইমাম অন্য মযহাব আদৌ সঠিক নয় এ ধারণা পোষণ করে নিজের সংগী ও সাগরিদদেরকে নির্দিষ্ট মযহাব অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন–এমন কথা আমরা শুনিনি। বরং তাঁরা বিভিন্ন মযহাবের ফত্ওয়া অনুযায়ী আমল করার অনুমতি দেয়ার বহু উদ্ধৃতি লক্ষ্য করা যায়। কারণ ইমামগণ সকলেই আল্লার হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি একথাও বলতেন যে, আমরা রসূলের এমন কোনো সহীহ কিংবা যঈফ হাদীস পাইনি যাতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উম্মতের কাউকে বিপরীত মযহাবের বিশুদ্ধতা অস্বীকার করে নির্দিষ্ট মযহাব অনুসরণ করার অনিবার্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর কারণ এটাই যে, সকল মুজতাহিদই সঠিক ও হকপন্থী ছিলেন।" (মীযান, ৩৯ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

ইমাম শা'রানীর আরো কতিপয় প্রখ্যাত আলেমের মন্তব্য লক্ষ্যণীয়, যা মীযানে উল্লেখিত হয়েছে।

মযহাব পরিবর্তন বিষয়ে ইমাম কিরাফীর (র) অভিমত

ونقل القرافی رحمه الله الاجماع من الصحابة على
ان من استفتى ابا بكر وعمر وقلدهما فله بعد ذالك
ان يستفتي غيرهما من الصحابة ويعمل به من غير
نكير- واجمع العلماء على ان من اسلم فله ان يقلد
من شاء من العلماء بغير حجة ومن ادعى دفع هذين
الاجماعين فعليه الدليل - اه (ميزان ص ٣٩)

"ইমাম কিরাফী (র) সাহাবাগণের ইজমারূপে বর্ণনা করেছেন সাহাবীদের যুগে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমরের (রাঃ) ফত্ওয়া অনুসরণকারী ব্যক্তি অন্য সাহাবীর ফত্ওয়া অনুসরণ করার ব্যাপারে অনুমতিপ্রাপ্ত ছিলেন। কেউ তা অস্বীকার করেন নি। আলেমগণ একথায়ও একমত যে, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে সে বিনা দলীলে আপন ইচ্ছানুযায়ী যে কোন আলেমের অনুসরণ করতে পারবে। আর যে এ দু'টি ইজমার বিপরীত কিছু দাবী করবে তাকে তার দাবীর স্বপক্ষে অবশ্যই দলীল উপস্থিত করতে হবে।" (মীযান, ৩৯ পৃষ্ঠা)

মযহাব পরিবর্তন ব্যাপারে ইমাম যিনাতীর (র) অভিমত

'মিযানে' তাঁর মন্তব্য এভাবে ব্যক্ত হয়েছে–

وكان الامام الزناتي من المالكية يقول يجوز تقليد كل
من المذاهب فى النوازل وكذالك يجوز الانتقال من مذهب
الى مذهب - (ميزان ص ٣٩)

"ইমাম যিনাতী মালেকীর (র) মন্তব্য করতেন, আচার-আচরণ ও লেনদেনের ব্যাপারে কোন দিনের ব্যাপারে যেকোন মযহাবের তাকলীদ করা জায়েয। অনুরূপ এক ফিকহী মযহাবের পরিবর্তে অপর ফিকহী মযহাবের তাকলীদ করাও জায়েয কাজ।" (মীযান, ৩৯ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

ইমাম শা'রানী (র) অতপর ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতির (র) বরাত দিয়ে এমন অনেক আলেমের কথা উল্লেখ করেছেন যারা এক মযহাব পরিবর্তন করে অন্য মযহাব গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে এমনও রয়েছেন যিনি প্রথম মালেকী ছিলেন পরে শাফঈ মযহাব গ্রহণ করেন। কেউ প্রথমে হানাফী ছিলেন পরে শাফেঈ, শাফেঈ থেকে হানাফী পরে হানাফী থেকে পুনরায় শাফেঈ মযহাবে ফিরে যান। বহু আলেম এমনও আছেন যারা শাফেঈ মযহাব বর্জন করে হানাফী মত গ্রহণ করেন এবং এমতে আজীবন স্থির ছিলেন। তন্মধ্যে ইমাম তাহাভীর (র) নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রথমত ইমাম শাফঈর (র) মতাবলম্বী ছিলেন। পরে তিনি সে মত পরিবর্তন করে আমৃত্যু হানাফী মযহাব অনুসরণ করেন। এই পরিবর্তনের দরুন কেউ তাদের সমালোচনা কিংবা অস্বীকার করেছেন বলে জানা যায় না অনুরূপ বর্জনকারীদের পূর্ব মতে ফিরে আসার কেউ নির্দেশ দিয়েছেন এমন প্রমাণও পাওয়া যায় না। এতে প্রতীয়মান হয় যে, সমসাময়িক আলেমগণের দৃষ্টিতে মযহাব পরিবর্তন অপরাধ কিংবা গুনার বিষয় নহে; বরং সম্পূর্ণ জায়েয এবং এ ধারা তখন থেকেই চালু আছে। অন্যথায় আলেমগণ নীরব না থেকে এর বিরোধিতায় অসৎকর্মে নিষেধের দায়িত্ব অবশ্যই পালন করতেন।

নির্দিষ্ট করণের দাবী

'শাফঈ মযহাব পরিবর্তন করে হানাফী মযহাব গ্রহণ করাতে দোষ নেই কিন্তু হানাফী মযহাব ত্যাগ করে কারো শাফেঈ মত গ্রহণ করা বৈধ নহে কোন কোন আলেমের এ ধরনের দাবী অমূলক যার কোন ভিত্তি নাই আর দলীল পাওয়ার আশা করাও অর্থহীন। আলেমগণ এ জাতীয় অমূলক দাবী স্বীকারই করেননি। সুতরাং ইমাম শা'রানী (র) মিযানে কুবরায় এ সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন –

قال بعضهم يجوز للشافعى ان يتحول حنفيا ولا عكس قال
السيوطى هذه دعوى لا برهان عليها وقد ادركنا علماءنا لا
يبالغون فى النكير على من كان مالكيا ثم عمل حنفيا او
شافعيا ثم تحول بعد ذالك حنبليا ثم رجع بعد ذالك الى
مذهب مالك وانما يظهرون النكير على المنتقل لايهامه

التلاعب بالمذاهب وجزم الرافعي بجوازه وتبعه

النووي-اه (ميزان ص٤٠)

"কোন কোন আলেম বলেন, একজন শাফঈ মতালম্বী লোকের হানাফী হওয়া জায়েয; কিন্তু হানাফী ব্যক্তির শাফঈ হওয়া বৈধ নহে। ইমাম সুয়ূতির (র) মতে এটা দলীল বিহীন দাবী। অপর দিকে সমকালীন আলেমদের আমরা লক্ষ্য করেছি মালেকী মযহাব বর্জন করে হানাফী কিংবা শাফেঈ মত গ্রহণকারী, পরে হাম্বলী মতের অনুসারী ব্যক্তিকে অস্বীকার করতেন না এমনকি অবশেষে মালেকী মযহাবে ফিরে যাওয়া সত্ত্বেও তাঁরা সে লোকের প্রতি কটাক্ষ কিংবা বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য করেননি। অবশ্য ব্যংগ-বিদ্রুপ করার অভিপ্রায়ে যারা মযহাব পরিবর্তন করত আলেমগণ কেবল তাদেরই বিরূপ সমালোচনা করেছেন। ইমাম রাফেঈ (র) মযহাব পরিবর্তন করা দৃঢ়কণ্ঠে সমর্থন করতেন। ইমাম নববী (র) এ মতেই সমর্থন করেছেন।" (মীযান, ৪০ পৃষ্ঠা)

অতপর ইমাম শা'রানী (র) তাকলীদ ও মযহাব পরিবর্তন সম্পর্কীত ইমাম সুয়ূতির (র) একটি বিস্তারিত ফত্ওয়ার উল্লেখ করেছেন, যাতে পক্ষ-বিপক্ষ, বৈধ-অবৈধ সবদিক পূর্ণাঙ্গ বিবেচিত হয়েছে। উদ্দেশ্যের সাথে সুসনামঞ্জস্যশীল হওয়ায় আমরা ফত্ওয়াটি হুবহু পেশ করছি।

ইমাম সুয়ূতির (র) বিস্তারিত ফত্ওয়া

মযহাব পরিবর্তন করা জায়েয হওয়া না হওয়া সম্পর্কে ইমাম সুয়ূতিকে (র) কেউ প্রশ্ন করলে তিনি তার বিস্তারিত জবাব দেন এভাবে-

প্রথম প্রকার

الذى اقول به ان للمنتقل احوالا احدها ان يكون الحامل له على الانتقال امراً دنيويا اقتضته الى الرفاهية اللائقة به كحصول وظيفة او مرتبة او قرب من الملوك واكابر الدنيا۔ فهذا حكمه حكم مهاجر ام قيس لانه الاعزمن مقاصده

'এ সম্পর্কে আমার কথা হলো, পরিবর্তনকারীদের কয়েকটি অবস্থা হতে পারে। মর্যাদা বা আর্থিক সুবিধার মতো কিছু বৈষয়িক উদ্দেশ্য সাধন করা অথবা রাজা বাদশাহ বা দুনিয়াদার লোকদের নৈকট্য লাভ করা। এ ধরনের লোকদের অবস্থা মুজারিদরে উম্মে কয়েসের মতো।[১]

প্রথম প্রকার-পরিবর্তনের অন্তরালে কল্যাণের দিক গৌণ বরং বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে দ্বীন ও মযহাবকে ব্যবহার করার দরুন এ ধরনের পরিবর্তন শাস্তিযোগ্য অপরাধ সাব্যস্ত হওয়া বিচিত্র নহে।

দ্বিতীয় প্রকার

الثاني أن يكون الحامل له على الانتقال أمرا دنيويا
لكنه عامي لا يعرف الفقه وليس له من المذهب سوى
الاسم فمثل هذا أمره خفيف إذا انتقل عن مذهبه
الذي كان يزعم أنه متقيد به ولا يبلغ إلى حد التحريم
لأنه إلى الآن عامي لا مذهب له فهو كمن أسلم جديدا
له التمذهب بأي مذهب من مذاهب الأئمة - اه

"দ্বিতীয় প্রকার হলো-পরিবর্তনের কারণ বৈষয়িক কিন্তু লোকটি অজ্ঞ, আলেম নয়। মযহাব বলতে একটি নাম ছাড়া আর কিছুই সে অবহিত নয়। এ ধরনের লোক নিজের ইচ্ছামতো গৃহীত মযহাব ত্যাগ করে অন্য মযহাব গ্রহণ করাতে হারাম পর্যায়ের অপরাধী হবে না। তার এই পরিবর্তন খেলাফ আওলা (অনুত্তম) পর্যায়ের লঘু দৃষ্টিতে দেখা হবে। কেননা সে একজন অজ্ঞ লোক। নও মুসলিমের ন্যায় তার জন্য নির্দিষ্ট মযহাবের অনুসরণ করা জরুরী নয়। বরং সে তার পসন্দমতো যে কোন ফিকহী মযহাব অনুসরণে স্বাধীন এবং এটা তার জন্য জায়েয।"

---

১. মককা থেকে একদল লোক মদীনায় হিজরত করে বলে আসেন। এই দলের একজন লোক উমেন কয়েসনামী জনৈকা মহিলার উদ্দেশ্যে হিজরত করেন বাহ্যতঃ এটা যদিও হিজরত নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য কি উদ্দেশ্যগত দিক থেকে একে হিজুর আখ্যা দেয়ার প্রশ্নই আসেনা। কাজেই সে লোকটি মুহাজির উন্মে কয়েস অর্থাৎ, উন্মে কয়সের মুহাজির নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় প্রকার পরিবর্তনে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো গুনাহ্ নেই। কেননা পরিবর্তনকারী লোকটি আলেম নয়, বরং অজ্ঞ লোক। কোনো নির্দিষ্ট মযহাবের পরিবর্তে যে কোনো মযহাব অনুসরণ করার তার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু পরিবর্তনের কারণ বৈষয়িক হওয়াতে কাজটি উত্তম নয়।

তৃতীয় প্রকার

الثالث ان يكون الحاصل له امراً دنيويا كذالك و
لكنه من القدر الزائد عادة على ما يليق بشانه وهو
فقيه فى مذهبه واراد الانتقال لغرض الدنيا الذى هو
من شهوات نفسه المذمومة فهذا امره اشد وربما يصل
الى حد التحريم لتلاعبه بالاحكام الشرعية لمجرد غرض الدنيا
مع عدم اعتقاده فى صاحب المذهب الاول انه على كمال
هدى من ربه اذ لو اعتقد ذالك ما انتقل عن مذهبه-

"তৃতীয় প্রকারের পরিবর্তন হলো–এর কারণ বৈষয়িক ঠিকই, তবে বাহ্যিক অবস্থার সাথে যথাযথ হওয়ার চেয়ে পরিমাণে বেশী। পরিবর্তনকারী স্বীয় মযহাব সম্পর্কে সম্যক অবগত ও সম্পূর্ণ অবহিত। কিন্তু পরিবর্তনের একমাত্র উদ্দেশ্য প্রবৃত্তির দাসত্ব করা। এ ধরনের পরিবর্তন খুবই নাজুক ও সংগীন। অনেক সময় এটা হারামের পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ এ ধরনের পরিবর্তনে একদিকে বৈষয়িক স্বার্থ থাকার দরুণ মাযহাবের সাথে উপহাস করা বুঝায়, অপর দিকে আগের ইমাম পরিপূর্ণভাবে হেদায়াত প্রাপ্ত না হওয়ার ফাসিদ ও বাতিল আকিদা পোষণ করাও বুঝায়। অন্যথায় তার পরিবর্তন করার আদৌ প্রয়োজন হতো না।"

এটা পরিবর্তনের তৃতীয় প্রকার। এর হুকুম সম্পর্কে বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তির মযহাব সংক্রান্ত জ্ঞান ও পারদর্শিতা অর্জনের পরও কেবল প্রবৃত্তির দাসত্ব, বৈষয়িক উদ্দেশ্য ও মযহাবের সাথে উপহাস করার উদ্দেশ্যে ভিন্ন মযহাব গ্রহণ করা জায়েয নহে। বিশেষত তার পূর্ব ইমাম পূর্ণ হেদায়েত প্রাপ্ত না হওয়ার অমূলক ধারণা পোষণ করা অবস্থায় তো ইহা মারাত্মক না-জায়েয। এমতাবস্থায় অপরাধের মাত্রা অধিক হওয়া স্বাভাবিক।

www.pathagar.com

চতুর্থ প্রকার

الرابع ان يكون الانتقال لغرض ديني ولكنه كان فقيها
في مذهبه وانما انتقل لترجيح المذهب الآخر عنده
لما راه من وضوح ادلته وقوة مداركه فهذا يجب عليه
الانتقال او يجوز له وقد اقر العلماء من انتقل الى
مذهب الشافعي حين قدم مصر وكانوا خلقا كثيرا
مقلدين للامام مالك - اه

"চতুর্থ প্রকার হলো–পরিবর্তনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বৈষয়িক নয় দ্বীনী। পরিবর্তনকারী স্বীয় মযহাব সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান কার, তবে অপর মযহাবটি দলীলের ভিত্তিতে অধিকতর সঠিক ও যথার্থ বলে তার ধারণা। এরূপ পরিবর্তন করা ওয়াজিব, কিংবা তার জন্য অন্তত জায়েয। কারণ, ইমাম মালেকের (র) এমন অসংখ্য মুকাল্লিদের শাফেঈ মযহাবে পরিবর্তনকে সমকালীন আলেমগণ সমর্থন করেছিলেন এবং তাদের সে মতে কায়েম থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন, ইমাম শাফেঈর (র) মিসর আগমনের পর যারা তাঁর মযহাব গ্রহণ করেছিল।"

চতুর্থ প্রকারের পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট ফত্ওয়ার এ অংশে স্পষ্টত বর্ণিত হয়েছে যে, একজন আলেম ব্যক্তির মাযহাবী তাকলীদের তত্ত্বগত দর্শন হবে তিনি তার পূর্বতম ফিকহী মযহাবের উপর ততক্ষণ প্রতিষ্ঠিত থাকবেন এবং এর দেয়া ফত্ওয়ায় ততক্ষণ আমল করে যাবেন, দলীল–প্রমাণের ভিত্তিতে অপর মযহাবের ফতওয়া যতক্ষণ পর্যন্ত মজবুত ও প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত না হয়। আর যখনই সে জানবে যে, তার অনুসরণীয় মযহাব দুর্বল এবং অন্য মযহাব দলীলের ভিত্তিতে সবল ও প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য তখনই তাঁকে আপন মযহাব পরিত্যাগ করে সবল মযহাব গ্রহণ করা ওয়াযিব অথবা অন্তত জায়েয স্বীকার করে নিতে হবে। এটা শুধু পুথিগত কথা নয়। বরং পূর্ববতী আলেমগণ এর উপর বাস্তব আমলও করেছেন। উপরন্তু সমকালীন প্রখ্যাত আলেমগণ এর বিরোধিতা না করে বরং নব গৃহীত মযহাবের ওপর লোকদের অবস্থান করার অনুমতিও দিয়েছেন।

www.pathagar.com

পঞ্চম প্রকার

الخامس ان يكون انتقاله لغرض ديني لكنه كان عاريا
عن الفقه وقد اشتغل بمذهبه فلم يحصل له منه
شيء ووجد مذهب غيره اسهل عليه بحيث يرجو
سرعة ادراكه والتفقه فيه فهذا يجب عليه الانتقال
قطعا ويحرم عليه التخلف لان تفقهه مثله على مذهب
امام من الائمة الاربعة خير من الاستمرار على الجهل
واظن ان هذا هو السبب في تحول الطحاوي حنفيا بعد
ان كان شافعيا۔

"পঞ্চম প্রকার হলো-পরিবর্তনের উদ্দেশ্য দ্বীনি এবং পরিবর্তনকারী কোনো ফকীহ নয়। আপন মযহাবী পরিসরে জ্ঞান চর্চায় মগ্ন থাকা সত্ত্বেও তার পক্ষে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু অন্য মযহাব সে তুলনায় সহজ মনে হয় এবং ঐ পরিসরে যথাশীঘ্র অভিজ্ঞতা অর্জন করতঃ ফকীহ ও আলেম হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান। এহেন ব্যক্তির মযহাব পরিবর্তন করা ওয়াজিব এবং সাবেক মযহাবের সাথে জড়িত থাকা হারাম। কারণ অজ্ঞতা ও জাহেলিয়াতের সাথে সব সময় সম্পৃক্ত থাকার তুলনায় মযহাব চতুষ্টয়ের কোনো একটির পরিসরে ইলম ও তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করা উত্তম। আমার ধারণা, এ কারণেই ইমাম তাহাভী (র) শাফঈ মযহাব ছেড়ে হানাফী মত গ্রহণ করেছিলেন।"

পঞ্চম প্রকার পরিবর্তনের সারকথা হলো-কোনো মযহাবের সাথে জড়িত থাকা যদি নামে মাত্র হয় ইলম ও ফিকহী জ্ঞান অর্জনের আশা যদি না থাকে বরং অন্য মযহাবের সাথে জড়িত হলে সে সম্ভাবনা উজ্জল দেখা যায়, তাহলে তার জন্য মযহাব পরিবর্তন করা ওয়াজিব এবং আগের মযহাব পরিত্যাগ করা জরুরী। কারণ চার মযহাবের নির্দিষ্ট কোনো একটির অনুসরণ দ্বীনের আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নহে। মূল লক্ষ্য বরং মযহাবের অনুসরণের মধ্য দিয়ে দ্বীনের যাবতীয় হুকুম আহকাম সম্পর্কে অবগত হয়ে সঠিক পদ্ধতি ও শরীয়তের বিধি-নিষেধ পালন করা। কোনো নির্দিষ্ট মযহাবকে আঁকড়িয়ে ধরে

www.pathagar.com

যখন এই উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ার আশা না থাকে এবং অপর কোনো মযহাব অবলম্বন করলে সে আশা পূরণ হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, তখন ইলম ও ফিকহী জ্ঞানার্জনের বৃহত্তর স্বার্থে মযহাব পরিবর্তন করা অপরিহার্য। অন্যথায় একথা সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, নির্দিষ্ট কোনো মযহাবের তাকলীদ ও অনুসরণ করাই তার দ্বীন চর্চার মূল উদ্দেশ্য।

ষষ্ঠ প্রকার

السادس ان يكون انتقاله لا لغرض ديني ولا دنيوى
بان كان مجردًا عن القصدين جميعًا فهذا يجوز للعامى
اما الفقيه فيكره له او يمنع عنه لانه قد حصل فقه
ذالك المذهب الاول ويحتاج الى زمن اخر يحصل فيه
فقه المذهب الآخر فيشغله ذالك عن العمل بما تعلمه
قبل ذالك وقد يموت قبل تحصيل مقصوده من المذهب
الآخر فالاولى لمثل هذا ترك ذالك ـ اه (ميزان ص٤٢)

"এ প্রকার পরিবর্তনের উদ্দেশ্য বৈষয়িক বা দ্বীনি কোনোটাই নয়। অর্থাৎ, উদ্দেশ্য বিহীন পরিবর্তন। এ ধরনের পরিবর্তন অজ্ঞ লোকের জন্যে জায়েয; কিন্তু ফকীহদের জন্যে সঙ্গত নয়। কারণ, ফকীহ ব্যক্তি পূর্ব মযহাবের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ইলম ও জ্ঞান আহরণ করেছেন। এখন অন্য মযহাবের ইলম হাসিল করতে সময়ের দরকার। এদিকে পূর্বের মযহাব অনুসরণে আমল দ্বারা পরিবর্তনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় মযহাব অনুসারে জ্ঞান-বুদ্ধি ও ইলম হাসিল করার আগেই তার ইহ-জীবন সমাপ্ত হওয়া বিচিত্র নয়। ফলে নতুন মযহাবে পারদর্শিতা অর্জনের সুযোগ না হওয়ারই সম্ভাবনা। অতএব, এ জাতীয় লোকের পক্ষে মযহাব পরিবর্তন না করাই শ্রেয়।" (মীযান, ৪২ পৃষ্ঠা)

এই হলো ইমাম সুয়ূতির (র) পরিবর্তন সম্পর্কিত বিস্তারিত ফত্ওয়া যা তিনি এতদসংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে লিখেছেন। এ দ্বারা শরীয়তের পূর্ববর্তী তত্ত্বজ্ঞানী আলেমগণের দৃষ্টিতে তাকলীদের স্বরূপ সহজেই আন্দাজ করা যায়। তদুপরি এ ব্যাপারে তাঁদের কর্মনীতির অবগতি লাভ করাও কার্যকর নহে।

www.pathagar.com

অপরদিকে তাকলীদ সম্পর্কে মর্তমান আলেমগণের ধারণা কি এবং খুটিনাটি বিষয়ই হোক না কেন মযহাব পরিবর্তন ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কোন পর্যায়ের সে কথাও এ দ্বারা অবগত হওয়া যায়। কবির ভাষায়ঃ

ببیں تفاوت راہ از کجا است تا بکجا জানহে সুজন, লক্ষ্য পথের কত যে ব্যবধান।

মালেকী ও শাফেঈ মতালম্বীদের
এ সম্পর্কিত দর্শনের সারমর্ম

তাকলীদ ও মযহাব পরিবর্তন সম্পর্কে শাফেঈ ও মালেকী মতালম্বীদের ইতিপূর্বে পেশকৃত তত্ত্ব ও তথ্যের আলোকে উপস্থাপিত আলোচনার মর্ম কথা নিম্নরূপঃ

একঃ যুগ বিবর্তন সাপেক্ষে ও স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ছোটখাটো ব্যাপারে প্রত্যেক মযহাবের তাকলীদ করা জায়েয। এমনিভাবে যে কোনো ফিক্হী মযহাব ত্যাগ করতঃ অন্য কোনো ফিকহী মাযহাব গ্রহণ করাও জায়েয। তবে শর্ত হলো-প্রবৃত্তির দাসত্ব না করা, বৈষয়িক উদ্দেশ্য চরিতার্থ না করা এবং মযহাবের সাথে উপহাস ও ব্যঙ্গ করা উদ্দেশ্য না হওয়া।

দুইঃ উদ্দেশ্য অসৎ না হলে বিজ্ঞ ও অজ্ঞ সর্বস্তরের লোকের জন্যে মযহাব পরিবর্তন করা জায়েয। অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত পরিবর্তন ঘৃণিত ও নিষিদ্ধ। তবে অজ্ঞ লোকের পরিবর্তন অপেক্ষাকৃত কম দোষণীয়। কিন্তু বিজ্ঞ ও জ্ঞানী লোকের জন্যে এ ধরনের পরিবর্তন বিপজ্জনক, এমনকি হারাম পর্যন্ত সাব্যস্ত হতে পাবে। বিশেষত প্রথম ইমাম পরিপূর্ণ হেদায়াত প্রাপ্ত ছিলেন না, কিংবা তার মযহাব বাতিল, এ জাতীয় ধারণা পোষণমূলক পরিবর্তন হারামের পর্যায়ভুক্ত।

তিনঃ কুরআন-হাদীসে পারদর্শী ব্যক্তির দৃষ্টিতে আপন মযহাবের তুলনায় অপর মযহাব প্রাধান্য পাওয়ার অকাট্য দলীল সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হলে নিজের মযহাব পরিত্যাগ করতঃ প্রাধান্যো পযোগী মযহাব গ্রহণ করা ওয়াজিব অথবা অন্তত জায়েয হবে।

চারঃ প্রাধান্য পাওয়ার দলীলের ভিত্তিতে বহু খ্যাতনামা আলেম মযহাব ছেড়ে অপর মযহাব গ্রহণ করেছেন। কেউ এর বিরোধিতা বা অস্বীকৃতি জানাননি।

www.pathagar.com

পাঁচঃ কোনো মযহাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যদি দ্বীন সম্পর্কে ফিক্হী জ্ঞান হাসিল না হয় অপরদিকে অন্য মযহাব সহজ হওয়ার কারণে ফিকহী জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা উজ্জ্বল দেখা যায়, তাহলে পূর্ব মযহাবের সাথে জড়িয়ে থাকা জায়েয নেই; বরং দ্বিতীয় মযহাবের অনুসরণ অনিবার্য হয়ে যাবে।

মযহাব অনুসরণের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

হানাফী, শাফেঈ এবং মালেকী আলেমদের উপরোক্ত বিশ্লেষণের আলোকে তাক্লীদে মযহাবের তত্ত্ব কথা মোটামুটি নিম্নরূপে পেশ করা যায়ঃ

একঃ মুজতাহিদ ইমামগণ নিজেদের দূরদর্শীতা, ইলমী চিন্তা-ভাবনা এবং আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান-বুদ্ধির সাহায্যে কুরআন-হাদীস থেকে এমন কতগুলি মূলনীতি উদ্ভাবন করেছেন যে সবের আলোকে তারা শরীয়তের সুস্পষ্ট ও প্রমাণসিদ্ধ আহকামের ওপর ইজতিহাদ করতঃ শাখাগত অস্পষ্ট বিষয়ের হুকুম নির্দেশ করেছেন এবং পুরাপুরি যাচাই বাছাই করার পর স্বীয় ইজতিহাদী দূরদৃষ্টি বলে ফিকাহের মাসআলায় বিভিন্ন ফিকহী নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করেছেন। ফলে অনাগত ভবিষ্যতের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা শরঈ মাসআলায় ফিকাহের বিভিন্ন নিয়ম-কানুন বিন্যস্ত আকারে পেয়ে যায়। এই সুবিন্যস্ত নীতিমালাই পরবর্তীকালে চার মযহাব নামে গোটা ইসলামী জগতে খ্যাতি লাভ করে। এরি ভিত্তিতে মুসলিম উম্মতের বাস্তব জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপ, আচার-আচরণ সম্পাদিত হতে থাকে।

দুইঃ যারা কুরআন-হাদীস থেকে সরাসরি বিধি বিধান নির্ধারণে যোগ্যতা রাখে না তদুপরি মূলনীতি অবলম্বনে শাখাগত মাসআলা উদ্ভাবনে নিজেরা সক্ষম নয়, তাদের জন্যে শরঈ আহকাম ও দ্বীনী মাসআলায় বাস্তব আমলের নির্ভরযোগ্য উৎস হলো এসব মযহাব। এ সমস্ত মযহাবের যেটির নিয়ম-পদ্ধতি, রীতি-নীতি শরীয়ত থেকে উৎসারিত এবং যে মযহাবের ইলমী বিশ্লেষণ কুরআন হাদীসের শিক্ষার সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যশীলরূপে যার মনে পূর্ণ আস্থা জন্মাবে তার সেই মযহাবেরই তাক্লীদ করা উচিত।

তিনঃ এভাবে মযহাব চতুষ্টয়ের যে কোনো মযহাবকে নিজের মযহাব বানানো এবং যাকে ইচ্ছা তার তাক্লীদ করার স্বাধীনতা রয়েছে প্রত্যেকের। অধিকন্তু অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত না হয়ে এক মযহাব ছেড়ে অন্য মযহাব গ্রহণ করাও জায়েয। কারণ নির্দিষ্ট মযহাবের তাক্লীদ করা আসল দ্বীন নয়। বরং

www.pathagar.com

মযহাব মূলত প্রকৃত দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার মাধ্যম বিশেষ। সুতরাং সময়ের দাবীতে মযহাব ছেড়েও দেয়া যেতে পারে। যদি এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে ক্ষতিকর হতো তাহলে আলেমগণ কখনো এটা জায়েযরূপে সমর্থন দিতেন না। তাঁরা নিজেরাও মযহাব পরিবর্তন করতেন না অপরকেও তা কায়েম থাকতে নিষেধ করতেন। অথচ আলেমদের মযহাব পরিবর্তন এবং অপরকেও পরিবর্তন করতে দেয়ার কথা ইতিপূর্বের বিশ্লেষণধর্মী আলোচনায় আমরা উল্লেখ করেছি।

চারঃ দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো মযহাবের তাকলীদ করা জায়েয হতে পারে। এক, মযহাবের ইমাম স্বীয় ইজতিহাদ ও ফতওয়ায় ভুল-ভ্রান্তি থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ হওয়ার আকীদা না রাখা। দুই, তাকলীদ করার ব্যাপারে এই দৃঢ় ইচ্ছা থাকা যে, গৃহীত ফতওয়ার খেলাফ কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক হুকুম পাওয়া মাত্র সে ফতওয়া পরিত্যাগ করতঃ কুরআন-হাদীসের নির্দেশ পালনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করব না।

একটি বিশ্লেষণধর্মী বিষয়

অতপর তাকলীদ সম্পর্কে বিশ্লেষণযোগ্য একটি বিষয় রয়ে গেছে, যার বিস্তারিত বর্ণনা একান্তই জরুরী। বিষয়টি হলো-আলেম হোক অথবা অনালেম কোনো লোক যদি নির্দিষ্ট কোনো মযহাবী ইমামের এই অর্থে তাকলীদ করে যে, ইমাম সাহেব ইজতিহাদ বা ফতওয়া প্রদানে ভুল-ত্রুটির উর্দ্ধে অথবা কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশের মুকাবিলায়ও সে নিজের ইমামের ইজতিহাদ বা কিয়াসকে ত্যাগ করতে আদৌ প্রস্তুত নয়। তার ভাবখানা এরূপ যে, ইমাম সাহেবই যেন নির্দেশদাতা, আইন প্রবর্তক ও মৌলিক অনুসরণীয়। তার তাকলীদ করাই প্রকৃত দ্বীন। এ ধরনের তাকলীদ করা ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয কি জায়েয নেই? এটা এক সঙ্গত প্রশ্ন।

এ সম্পর্কে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে আমাদের নিরপেক্ষ মত হলো-ইসলামী শরীয়তে এ ধরনের তাকলীদের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। আলেমগণের কেউ এটাকে জায়েয মনে করেননি। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী আলেম বরং এটাকে শির্ক আখ্যায়িত করেছেন। এটা শুধু মৌখিক দাবী নয় এর স্বপক্ষে বরং কুরআন-হাদীসের প্রমাণ মৌজুদ রয়েছে। চিন্তাবিদ আলেমগণ তাদের রচিত গ্রন্থাবলীতে এর বিশদ ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। নিম্নে এর স্বপক্ষে

www.pathagar.com

প্রথমত কুরআন-হাদীসের দলীল পেশ করা হবে। অতপর তত্ত্ববিশারদ আলেমদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উপস্থিত করার প্রয়াস নেয়া হবে।

কুরআনের আয়াত

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا - (النساء:٦٥)

"না, হে মুহাম্মদ, তোমার রবের কসম এরা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের পারস্পরিক মতভেদের বিষয় ও ব্যাপার সমূহে তোমাকে বিচারপতিরূপে মেনে নেয়। অতপর তুমি যে ফয়সালাই করবে তাতে তারা মনে মনে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করবে না। বরং এর সামনে তারা পুরাপুরিভাবে আত্মসমর্পন করবে।" (নিসাঃ ৬৫)

আয়াতটিতে নির্ভেজাল ও নিখাঁদ ঈমানের একটি সুস্পষ্ট মানদন্ড ও আলামত রয়েছে। মানদন্ডটি হলো-মানুষ তার গোটা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ-অনুকরণ করতে থাকবে। কোনো ব্যাপারে নবী আলাইহিস্ সালামের নির্দেশ অকাট্যভাবে জ্ঞাত হওয়ার পর সে ব্যাপারে মুজতাহিদ বা অমুজতাহিদ কারো হুকুম কিছুতেই গ্রহণীয় বা অনুকরণীয় হতে পারবে না। অন্যথায় তার ঈমান আদৌ পূর্ণ হবে না। এতে প্রতীয়মান হবে যে, শরীয়তের স্পষ্ট বিধানের মুকাবিলায় কোনো ইমাম বা মুজতাহিদের ফয়সালার অনুসরণ করা জায়েয নেই।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ
أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ
اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا - (الاحزاب:٣٦)

"কোনো ঈমানদার স্ত্রী-পুরুষের এ অধিকার নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোনো বিষয়ে ফয়সালা দেয়ার পর সে নিজে ঐ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে স্বাধীনতা রাখবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রসূলের নাফরমানী করবে সে নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত হলো।" (আহযাবঃ ৩৬)

www.pathagar.com

আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশের সামনে মাথা নত করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করা জায়েয নেই এবং সর্বাবস্থায় তাঁর আনুগত্য করা অপরিহার্য–আয়াতটি এ কথারই সুস্পষ্ট ইংগিত বহন করে। আহকামে শরীয়তের মুকাবিলায় মুজতাহিদ হলেও তার তাকলীদ বা অনুসরণ করা জায়েয নেই। শরীয়তের স্পষ্ট বিধানের মুকাবিলায় তাকলীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এ কারণেও না-জায়েয যে, এতে মুনাফেকীর সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কারণ, কুরআনে আল্লাহর বিধান থেকে মুখ ফিরায়ে রাখা এবং অনীহা প্রকাশ করাকে মুনাফেকীর আলামতরূপে ঘোষণা করা হয়েছে। আর এটা কখনো মুমিনের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। কুরআনের বাণীঃ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ
رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا - (النساء: ٦١)

"যখন তাদেরকে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানানুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অভিপ্রায়ে রসূলের কাছে আসার জন্য বলা হয় তখন তুমি দেখতে পাবে মুনাফিক লোকেরা তোমাকে এড়িয়ে চলে যাচ্ছে।" (নিসাঃ ৬১)

কুরআন অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় বনী ইসরাঈল সম্পর্কে ঘোষণা দিয়েছে

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ (توبہ)

"বনী ইসরাঈলরা আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে নিজেদের পীর–পুরোহিতদেরকে আপন রব বানিয়ে নিয়েছে।" (তওবা)

এই শির্ক এবং রব বানানোর স্বরূপ ও তাৎপর্য কি ছিল তার ব্যাখ্যা কুরআনে নেই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রকৃতি বর্ণনা করেছেন এভাবে–বনী ইসরাঈলদের আল্লাহর হুকুমের মুকাবিলায় নিজেদের শায়খ, আলেম ও দরবেশদের তাকলীদ ও অনুসরণ করা এবং আল্লাহর বিধানের মুকাবিলায় তাদের ফত্ওয়া ও নির্দেশকে অধিকতর প্রাধান্য দেয়াই ছিল এই শির্কের তাৎপর্য। আদী বিন হাতিম নবী আলাইহিস্ সালামের কাছ থেকে উক্ত আয়াতের তাৎপর্য জানতে চেয়ে বললেন مَا كُنَّا نَعْبُدُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা তো তাদের ইবাদত করছি না।" তখন নবী আলাইহিস্ সালাম তার জবাবে ইরশাদ করলেনঃ

اما كانوا يحلون لكم ويحرمون فتاخذون بقولهم؟

قال نعم فقال صلى الله عليه وسلم هو ذاك (ترمذي)

"তোমাদের আলেম ও পুরোহিতগণ যা তোমাদের জন্যে হালাল ও হারাম বলেন তোমরা কি সেটাই অবলীলাক্রমে পালন করছো না? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ! ব্যাপার তো তাই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ এটাই হলো অদের ইবাদত করা এবং রব হিসাবে মেনে নেয়া।"

(তিরমীযী)

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ

لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق انما الطاعة

فى المعروف (بخارى)

"খালেকের অবাধ্য হয়ে মাখলুকের (সৃষ্টজীব) আনুগত্য করা জায়েয নেই। আনুগত্য কেবলমাত্র নেক কাজেই করতে হবে।" (বুখারী)

সুতরাং এ সত্যে কোনো সন্দেহ নেই যে, শরীয়তের সুস্পষ্ট আহকামের মুকাবিলায় আলেম, পীর-মাশায়েখ, দরবেশ, কুতুব মোটকথা কারো কথা বা ফত্ওয়ার তাকলীদ বা অনুসরণ করা জায়েয নেই বরং শির্কের নামান্তর।

তত্ত্বজ্ঞানী আলেমদের বিশ্লেষণ

শরীয়তের সুস্পষ্ট আহকামের মুকাবিলায় মযহাবের ইমামদের তাকলীদ করা না-জায়েয হওয়ার সপক্ষে কুরআন-হাদীসের দলীল পেশ করার পর এ বিষয়ে ও তত্ত্বজ্ঞানী আলেমদের অভিমত পেশ করতে চাই।

এ বিষয়ে আমরা যতোটুকু চর্চা করেছি তাতে এই সিদ্ধান্তে উপনীতহয়েছি যে, শরীয়তের সুস্পষ্ট ও দলীলভিত্তিক আহকামের মুকাবিলায় কারো তাকলীদ বা আনুগত্য জায়েয হওয়ার ব্যাপারে সাহাবীদের যুগ থেকে আয়িম্মায়ে, মুজতাহিদীনের যুগ পর্যন্ত সকলেই একমত। ইমামগণ নিজেরাই আদেশ-নিষেধদাতা অথবা প্রকৃত হুকুমকর্তা বা আইনদাতা এ প্রেক্ষাপটে মযহাব চতুষ্টয়ের তাকলীদ করা হয় না। বরং আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, আল্লাহ ও রসূল ব্যতীত অপর কারো শর্তহীন আনুগত্য করা জায়েয নয়। মৌলিক অর্থে কেউ নিজে হুকুমদাতা বা আনুগত্য পাওয়ার যোগ্য নয়। বরং সকলেই এর সমর্থক যে,

www.pathagar.com

إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه

এবং

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

"অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহই হুকুম দেয়ার নিরংকুশ অধিকারী। (অতএব) তিনি নির্দেশ দিয়েছেন–তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত তোমরা করবেই না। অর্থাৎ, খালেকের অবাধ্য হয়ে মখলুকের আনুগত্য বৈধ হতে পারে না।) মযহাব চতুষ্টয়ের অনুসরণের ব্যাপারে অধিকাংশ উম্মতে মুহাম্মদী একমত হলেও এর অর্থ এই নয় যে, শরীয়তের সুস্পষ্ট বিধানের মুকাবিলায় তাদের তাকলীদ ও অনুসরণ করা হবে। আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশের খেলাফ না হলে তাদের ফত্ওয়া গ্রহণীয় ও পালনীয় হবে। আর খেলাফ হলে তা হবে পরিত্যক্ত ও বর্জনীয়। কেননা, তারা ভুল–ত্রুটি থেকে নিরাপদ নয়। এ কারণে অধিকাংশ ওলামার স্বীকৃত মূলনীতি ঘোষণা করা হয়েছে" ان المجتهد قد يخطئ وقد يصيب "মুজতাহিদ কখনো ভুল করেন আবার কখনো ঠিক করেন।"

পক্ষান্তরে কুরআন–হাদীসের সুস্পষ্ট বিধানে ভুল থাকার কোনোই সম্ভাবনা নেই। সুতরাং কুরআন–হাদীসের মুকাবিলায় কারো সিদ্ধান্ত ফত্ওয়া গ্রহণীয় হওয়ার প্রশ্নই আসে না। সাহাবা, তাবেঈ ও তাবে–তাবেঈদের যুগ পর্যন্ত এ ধারা চলতে থাকে। এ পর্যায়ে নিম্নে আমরা সাহাবী যুগের কতিপয় ঘটনা পেশ করছি।

ইবনে ওমর (রাঃ) এবং একজন সিরীয় লোকের কথোপকথন

روى الترمذي ان رجلا من اهل الشام سأل عبد الله
ابن عمر عن التمتع بالعمرة الى الحج فقال حلال فقال
الشامي ان اباك قد نهى عنها فقال عبد الله ارأيت ان
كان ابي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم
امر ابي يتبع ام امر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
فقال بل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم- فقال قد

www.pathagar.com

صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الترمذى

هذا حديث حسن صحيح - (سندى حاشيه ابن ماجه، ج ١ ص ٢٠٥)

"তিরমীযী সূত্রে বর্ণিত, একজন সিরীয় লোক ইবনে ওমরকে (রাঃ) ওমরাহ্সহ হজ্বে তামাত্তু করা জায়েয হওয়া নাহওয়ার কথা জিজ্ঞেস করলেন। ইবনে ওমর (রাঃ) জবাবে বললেনঃ জায়েয। লোকটি আপত্তি করে বললোঃ আপনার পিতা তো নিষেধ করেছেন। এতে ইবনে ওমর (রাঃ) লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন। আমার পিতা যদি নিষেধ করে থাকেন আর নবী আলাইহিস্ সালাম যদি নিজেই তামাত্তু করেন তাহলে তুমি কাকে অনুসরণ করবে? নবীর (সাঃ) না আমার পিতার? লোকটি বললোঃ নবীর (সাঃ) কথাই অনুসরণীয় হবে। অতপর ইবনে ওমর (রাঃ) বললেনঃ নবী (সাঃ) তামাত্তু করেছেন।"

(হাদীসটি ইমাম তিরমীযীর মতে হাসান, সহীহ)

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এবং সিরীয় লোকটির কথোপকথনের মধ্যে মযহাবের তাকলীদ প্রসংগে পরবর্তী বংশধরদের জন্য একটি দিক নির্দেশনা রয়েছে। তা হলো শরঈ দলীলভিত্তিক আহকামের খেলাফ কারো কথা, ফয়সালা বা ফত্ওয়া গ্রহণীয় ও অনুকরণীয় হতে পারে না। এই সীমার মধ্যে থেকেই মযহাবের শর্তসাপেক্ষ তাকলীদ করতে হবে। এর বেশী বা অতিক্রম কোনো অবস্থায়ই জায়েয নেই।

ইবনে ওমর (রাঃ) ছিলেন একাধারে সাহাবী, খলীফা, মুলহাম ও মুহাদ্দাস।[১] তিনি তামাত্তু করতে নিষেধও করেছিলেন। কিন্তু ইবনে ওমর (রাঃ) এর মুকাবিলায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তামাত্তু করার সঠিক প্রমাণ পেয়েছিলেন এ কারণে বিনা দ্বিধায় দৃঢ়তার সাথে পিতার মত ও নিষেধ প্রত্যাখান করে তিনি নবীর সুন্নতের আনুগত্য গ্রহণ করেন। এটা কেবল ইবনে ওমরের (রাঃ) অনুভূতি নহে; বরং সিরীয় লোকটির মনেও বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, হযরত ওমরের (রাঃ) কথাই চূড়ান্ত কথা নয়। ইবনে ওমরের (রাঃ) "আমার পিতার নেতিবাচক নির্দেশ গ্রহণীয় হবে, না-কি রসূলুল্লাহর

১. মুলহাম-যার প্রতি আল্লাহর তরফ থেকে ইলহাম করা হয়। মুহাদ্দাস-সূক্ষ্ম বিষয় যাকে জানিয়ে দেয়া হয়। অর্থাৎ, হযরত ওমর ছিলেন আল্লার পক্ষ থেকে ইঙ্গিত প্রাপ্ত এবং সূক্ষ্ম বিষয়ে ইশারা প্রাপ্ত।

www.pathagar.com

ইতিবাচক কর্ম? এ প্রশ্নে লোকটি জোরগলায় উচ্চকণ্ঠে জবাব দেয়ঃ
بل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع "হুজুরের নির্দেশই পালনীয় সাব্যস্ত হবে।"

এতে প্রতীয়মান হয় যে, নবীর শিক্ষা এমন সুদূর প্রসারী যে, কুরআন-হাদীসের মুকাবিলায় যে কোনো ব্যক্তিত্বের অনুসরণ না করার প্রবণতা সাধারণ মু'মিনের অন্তরেও বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। অতএব হযরত ওমরের (রাঃ) মতো ব্যক্তিত্বের নির্দেশই যখন শরীয়তের সুস্পষ্ট বিধানের মুকাবিলায় গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে, তখন পরবর্তী ইমামগণের কিয়াস ও ইজতিহাদী ফয়সালা অনুসরণের প্রশ্নই আসে না।

সাহাবা কেরামের যুগ ও পরবর্তী উত্তম যুগের সাধারণ মন-মানসিকতায় এই ছিল তাকলীদ ও ইত্তিবায়ে সলফের বাস্তব অনুভূতি। সুতরাং আল্লামা সিন্ধী হানাফ হযরত ইবনে ওমরের ঘটনায় তাঁর নিজ মনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেনঃ

فانظر الى ابن عمر كيف خالف اباه مع علمه بان اباه
قد بلغه الحديث وانه لا يخالفه الا بدليل هو اقوى
منه ومع ذالك افتى بخلاف قول ابيه وقال ان
قول ابيه لا يليق ان يؤخذ به - اه (سندی حاشیہ ابن ماجه)

"লক্ষ্য করুন! ইবনে ওমর (রাঃ) কিভাবে তাঁর পিতার বিরোধিতা করেছেন। অথচ তিনি জানতেন যে, তার পিতা এ হাদীসটি সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত এবং কোনো অকাট্য দলীলের ভিত্তিতেই পিতা এই রায় দিয়ে থাকবেন। কিন্তু তথাপি পুত্র পিতার খেলাফ ফত্ওয়া দিয়ে বললেন, হাদীসের মুকাবিলায় পিতার কথা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।"

(সিন্ধী হাশিয়া ইবনে মাজা)

দ্বিতীয় ঘটনা

হযরত আবদুল্লাহ বিন্ ওমরের পুত্র সালেম থেকেও এ ধরনের একটি ঘটনার কথা জানা যায়। পিতা ও দাদার 'ইত্তিবা' পরিহার করে এই বলে তিনি হাদীসের অনুসরণে আগ্রহী হন যে, সুন্নতে রসূলই মূলত আনুগত্য ও অনুসরণের জন্য অধিকতর যোগ্য। এ সম্পর্কে ও তার ঘটনার বিবরণ হলঃ

www.pathagar.com

ইহরামের আগে এবং ঈদের দিন তাওয়াফে যিয়রতের আগে সুগন্ধি ব্যবহার করা না–জায়েয হওয়ার পক্ষে হযরত ওমর (রাঃ) এবং ইবনে ওমর (রাঃ) মত প্রকাশ করেন। সালেম বিন আবদুল্লাহও এ মত পোষণ করে আসছিলেন। কিন্তু এ দু'অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার করার সহীহ হাদীস পাওয়ার পর হযরত সালেম পিতা আবদুল্লা বিন ওমর ও দাদা হযরত ওমরের (রাঃ) মত পরিত্যাগ করে হাদীস অনুযায়ী আমল করেন। হাদীসটি হলো–

عن عائشة قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله

عليه وسلم قبل ان يحرم ويوم النحر قبل ان يطوف

بالبيت بطيب فيه مسك - (بخاري)

"হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইহরামের আগে এবং ঈদের দিন তাওয়াফের আগে এমন সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম যার মধ্যে মিস্‌ক থাকতো। (বুখারী)

হযরত ওমর ও হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) সম্ভবত এ হাদীস অবগত ছিলেন না। যার ফলে এ দুই অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার তাঁরা না–জায়েয মনে করতেন। হযরত সালেমও এ হাদীস জানার পূর্ব পর্যন্ত পিতা ও দাদারই অনুসরণ করতেন। অতপর এ হাদীস অবগত হওয়ার পর পিতা ও দাদার অনুসরণ ত্যাগ করে তিনি হাদীসের উপর আমল করেন। তিনি বলেনঃ যে দুই সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুগন্ধি লাগিয়েছেন সে সময় সুগন্ধি ব্যবহার নিষেধ নহে, জায়েয। কেননা আমলের জন্য সুন্নতে রসূলই অধিক হকদার ঘটনাটি আল্লামা সিন্ধী হানাফীর (র) ভাষায়ঃ

وقد عمل بمثل هذا سالم ابن عبد الله حين بلغه

حديث عائشة فى الطيب قبل الاحرام وقبل الافاضة

ترك قول ابيه وجده وقال سنة رسول الله صلى الله

عليه وسلم احق ان تتبع - اه

"হযরত সালেম পিতা আবদুল্লাহ বিন ওমরের (রাঃ) মতই আমল করতেন। ইহরামের আগে এবং তাওয়াফে যিয়ারতের আগে সুগন্ধি ব্যবহার করার হযরত আয়েশার (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি পাওয়ার পর তিনি পিতা ও পিতামহের মত ত্যাগ করে বলেন, নবী আলাইহিস্‌ সালামের হাদীস অনুসরণ করাই অধিক সংগত।"

www.pathagar.com

পিতা পুত্রের গৃহীত এই পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা সিন্ধী (র) সমকালীন অন্ধানুকরণ প্রিয় লোকদের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে অভিযোগের সূত্রে বলেনঃ

وغالب اهل الزمان على خلافا تهم اذا جاءهم حديث
يخالف قول امامهم يقولون لعل هذا الحديث قد بلغ
الامام وخالفه بما هو اقوى عنده منه - اه (سندی ص ۵-۶)

"বিরোধিতার ব্যাপারে সমকালীন লোকদের অধিকাংশের অবস্থা হলো- যখন তাদের স্বীয় ইমামের উক্তি বিরোধী কোনো হাদীস পেশ করা হয়, তখন তারা বলে, আমাদের ইমাম সাহেব এ হাদীস সম্পর্কে অবহিত আছেন, তবে অপর কোনো অধিকতর অকাট্য হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে এই হাদীস তিনি ছেড়ে দিয়েছেন।" (সিন্ধী ৫-৬ পৃষ্ঠা)

আল্লামা তীবীর (র) অভিমত

ইবনে মাজাতে আছে-হযরত সিকদামের একটি রেওয়ায়েতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীস অস্বীকার করার ফিৎনা সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণী করতে গিয়ে বলেছেনঃ

يوشك الرجل متكأ على اريكته يحدث بحديث من حديثي.
فيقول بيننا وبينكم كتاب الله - الحديث - (ابن ماجه)

"সত্ত্বরই একজন আরাম প্রিয় লোকের কাছে আমার হাদীস পেশ করা হলে সে বলবে, আমাদের ও তোমাদের মধ্যে তো কুরআনই রয়েছে।"

এই হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লামা সিন্ধী আল্লামা তীব্বীর নিম্নলিখিত উক্তি বর্ণনা করেনঃ

قال الفاضل الطيبي وفي هذا الحديث توبيخ عظيم على
ترك السنة والعمل بالحديث استغناء عنها بالكتاب
فكيف بمن رجح الراى على الحديث ؟ واذا سمع حديثا
من الاحاديث الصحيحة قال لا علي بان اعمل به فان لى
مذهبا اتبعه - اه

www.pathagar.com

"আল্লামা তীব্বী বলেছেন, আলোচ্য রেওয়ায়েতে কিতাবুল্লাহর বাহানা দিয়ে হাদীসের উপর আমল ত্যাগ করার প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। যারা হাদীসের ওপর নিছক রায়কে প্রাধান্য দিয়ে থাকে তাদের অবস্থা কি হবে? আর যখন তারা সহীহ হাদীস শুনে তখন তারা বলে–এ হাদীস অনুসারে আমল করা আমাদের অপরিহার্য নয়। কেননা, আমরা একটি মজহাবকে অনুসরণ করে চলছি।"

আল্লামা সিন্ধীর (র) অভিমত

তিনি এ সম্পর্কে বলেছেনঃ

فهذ الحديث ... فى ذم المقلد اذا خالف قول امامه الحديث فيرده ويعتذر لامامه بانه قد استغنى بالكتاب عن هذا الحديث - وبهذا ظهر ان اتباع السنة يعم تمام الامة ولا يختص بالمجتهد عن المقلد - اه

(سندهى صـ)

"এই হাদীসটি সেসব মুকাল্লিদের জন্য তিরস্কার স্বরূপ যারা স্বীয় ইমামের কথার মুকাবিলায় হাদীসকে অগ্রাহ্য করতঃ ইমামকে এভাবে দায়সারা করে যে, ইমাম সাহেব কুরআনের ওপর অটল থাকার দরুন এই হাদীসটির স্মরণাপন্ন হওয়া তার প্রয়োজন নেই। এতে প্রমাণ হয় যে, হাদীসের অনুসরণ করা গোটা জাতির জন্যে জরুরী। বিশেষ কোনো মুজতাহিদের মুকাল্লীদ হওয়া জরুরী নয়।" (সিন্ধী–৪ পৃষ্ঠা)

জায়েয ও না–জায়েয তাকলীদ

বিশ্ববরেণ্য আলেমগণের উপরোল্লেখিত বিশদ বিবরণের আলোকে এ কথা নিঃসংকোচে বলা যায় যে, তাকলীদ শরীয়তের প্রমাণ ভিত্তিক বিধি–নিষেধের খেলাফ না হলেই কেবল জায়েয; অন্যথায় না–জায়েয। ইমামগণের ইজতিহাদী ফত্ওয়া কুরআন হাদীস থেকে উদ্ভাবিত, উধৃত মাসআলার এ বিশ্বাসে তাকলীদ করতে হবে। মুজতাহিদগণ নিজেরাই নির্দেশদাতা, আনুগত্যে পাওয়ার যোগ্য এবং তাদের ইজতিহাদী ফয়সালা ওহীর মতো স্বতঃই দলীল ও শরীয়তসম্মত–এ বিশ্বাসে তাকলীদ করা যাবে না। অনুকরণীয় ইমামের

www.pathagar.com

দেয়া ফত্ওয়ার খেলাফ সহীহ্ হাদীস পাওয়া মাত্র গৃহীত ফত্ওয়া ত্যাগ করে হাদীস অনুযায়ী আমল করার দৃঢ় সংকল্প অন্তরে পোষণ করা তাকলীদ জায়েয হওয়ার জন্য জরুরী। এ ধরনের তাকলীদ সর্বসম্মতক্রমে জায়েয। কারণ এ প্রকৃতির তাকলীদ কুরআন হাদীসের একটি বাস্তব চিত্র। শরীয়তের প্রমাণ ভিত্তিক বিধি নিষেধের খেলাফ তৎপরতা এতে পাওয়া যায় না।

অপরদিকে, যদি কেউ ইমামকে মূল আদেশদাতা ও প্রকৃত আনুগত্য পাওয়ার যোগ্য বিশ্বাসে তাকলীদ করে এবং ইমামের ফত্ওয়ার খেলাফ কুরআন হাদীসের সুস্পষ্ট বিধান পাওয়া সত্ত্বেও সে অনুযায়ী আমল করা ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয় এ ধরনের তাকলীদ আদৌ জায়েয হতে পারে না। প্রথম যুগের কোনো আলেমই এ ধরনের তাকলীদকে জায়েয বলেননি। এ প্রকৃতির তাকলীদ সম্পর্কে শাহ ওলীউল্লাহর (র) উক্তি প্রনিধান যোগ্য।

হযরত শাহ ওলী উল্লাহর (র) মন্তব্য

শাহ সাহেব 'দ্বীন' –এ বিকৃতি ঘটার কারণসমূহ চিহ্নিত করতে গিয়ে বলেনঃ

ومنها تقليد غير المعصوم اعنى غير النبى صلى الله عليه
وسلم وحقيقته ان يجتهد واحد من علماء الامة فى
مسئلة فيظن متبعوه انه على الاصابة قطعا او ظنا غالبا
فيردوا به حديثا صحيحا ـ وهذا التقليد غير ما اتفق عليه
الامة المرحومة فانهم اتفقوا على جواز التقليد للمجتهدين
مع العلم بان المجتهد قد يخطى وقد يصيب ومع الاستشراف
لنص النبى صلى الله عليه وسلم فى المسئلة والعزم على
انه ان ظهر له حديث صحيح خلاف ما قلد فيه ترك
التقليد واتبع الحديث ـ قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم فى قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم من
دون الله ـ انهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا

www.pathagar.com

اذا احلوا لهم شيئا استحلوه واذا حرموا عليهم شيئا

حرموه - اه (حجة الله البالغة ج ا ص ٢٦٣-٢٦٤)

"মাসুম নবীগণ ব্যতীত এহেন গায়র মানুষ ব্যক্তিবর্গের তাকলীদ করা দ্বীনী মূল্যবোধে বিকৃতি ঘটার অন্যতম কারণ। এর তাৎপর্য হলো–কোনো প্রখ্যাত আলেম কোনো মাসআলার ব্যাপারে ইজতিহাদ করলে তার অনুসারীগণ এটাকে লিখিত অথবা অন্তত সহী–শুদ্ধ মনে করে এবং এর মুকাবিলায় সহীহ হাদীসকে অগ্রাহ্য করে বসে। এ ধরনের তাকলীদ জায়েয না হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণ একমত বস্তুত যে তাকলীদ মুজতাহিদ ভুল কিংবা নির্ভুল করার কথা অকপটে স্বীকৃত হয়েছে কেবল সে তাকলীদই জায়েয। পরন্তু উক্ত মসআলার ব্যাপারে নবী আলাইহিস্ সালামের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় সদা প্রস্তুত থাকতে হবে এবং তাকলীদী বিষয়ের খেলাফ সহীহ হাদীস পাওয়ামাত্র তা কবুল করার প্রবল ইচ্ছা পোষণ করতে হবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম اتخذوا احبارهم ورهبانهم আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন–"ইহুদীরা তাদের আলেম, পীর, পুরোহীতদের পূজা করতো না বরং তারা যেসব জিনিসকে হালাল বলতো সেগুলিকে ইহুদীরা হালাল আর তাদের ঘোষিত হারামকে হারাম মনে করতো।" কুরআনের ভাষায় তাদের এ জাতীয় কার্যকলাপ আচার–আচরণকে "রব বানানো" অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে।"

(হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ১ম খন্ড, ২৬৩–৪ পৃষ্ঠা)

জায়েয ও না–জায়েয তাকলীদ

শাহ্ সাহেবের এই বাক্যের অন্তরালে জায়েয ও না–জায়েয তাকলীদের মধ্যখানে একটি পার্থক্য রেখা টানা হয়েছে। ইমামকে মৌলিক নির্দেশদাতা ও আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী কিংবা ইমামের ফত্ওয়ার মুকাবিলায় সহীহ হাদীসের নির্দেশ মানার তাৎক্ষণিক সংকল্প প্রবল না থাকলে এ জাতীয় তাকলীদ না–জায়েযই নয়; বরং শির্কের অন্তর্ভূক্ত ইহুদীরা এ ধরনের তাকলীদে লিপ্ত ছিল এবং এ কারণেই কুরআনে তাদের বিরুদ্ধে اتخذ الارباب তথা–"রব বানিয়ে নিয়েছে" এর কঠোর নিন্দাবাক্য উচ্চারিত হয়েছে।

ইমামগণ ভুল এবং নির্ভুল উভয় করতে পারেন এহেন দলমত নিরপেক্ষ তাকলীদ এবং ইমামের ফত্ওয়ার খেলাফ সহীহ্ হাদীস পাওয়া মাত্র সে

www.pathagar.com

ফত্ওয়া প্রত্যাখান করে হাদীস অনুযায়ী আমল করার দৃঢ় মনোভাবসহ তাকলীদ করা আদৌ না-জায়েয নয়। কেননা, এ ধরনের তাকলীদ কুরআন-হাদীসের শিক্ষার উপর আমল করার একটি সহজ পদ্ধতি মাত্র। এরূপ তাকলীদ করা কুরআন-হাদীসের তাকলীদ করারই নামান্তর। হযরত শাহ সাহেব বিষয়টা অন্যত্র উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তাঁর ভাষায়ঃ

فان اقتدينا بواحد منهم فذالك لعلمنا بانه عالم بكتاب
الله وسنة رسوله فلا يخلو قوله اما ان يكون من صريح
الكتاب او السنة او مستنبطا عنهما بنحو من الاستنباط
او عرف بالقرائن ان الحكم فى صورة ما منوطة بعلة
كذا واطمان قلبه بتلك المعرفة فقاس غير المنصوص
على المنصوص فكانه يقول ظننت ان رسول الله عليه
الصلوة والسلام قال كلما وجدت هذه العلة فالحكم
ثمه هكذا والمقيس مندرج فى هذا العموم فهذا
ايضا معزى الى النبى صلى الله عليه وسلم اهـ

(حجة الله البالغة ا ص ٣٦٦)

"মুজতাহিদগণের কাউকে আমরা কুরআন-হাদীস সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞাত মনে করেই অনুকরণ করে থাকি। মুজতাহিদগণের উক্তি কুরআন-হাদীসের কোন স্পষ্ট দলীলের ভিত্তিতে নিরূপিত হবে অথবা কুরআন-হাদীস থেকে উদ্ভাবিত হবে কিংবা তিনি পূর্বাপর সম্পর্ক দ্বারা বুঝতে পারবেন যে, অমুক অবস্থায় শরয়ী হুকুম অমুক ইল্লতের (কারণ) সাথে জড়িত। এতে তাঁর মনে প্রবোধও এসে যায়। অতপর উল্লেখহীন প্রসংগকে প্রমাণভিত্তিক প্রসংগের ওপর কিয়াস করে মুজতাহিদের মনে এ প্রত্যয় জন্মে যে, আমার ধারণা মতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন বলেছেন-যেখানে এই কারণ পাওয়া যাবে সেখানে এই হুকুম হবে। অতএব যে প্রসংগটি কিয়াস করা হয়েছিল সেটাও এই সাধারণ হুকুমের আওতাধীন হয়ে নবী আলাইহিস সালামের সাথেই সম্পৃক্ত হবে।

(হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ১ম খন্ড, ৩৬৬ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

বস্তুত জায়েয তাকলীদ সম্পর্কে শাহ্ সাহেবের উপরোক্ত অভিমত। আর কুরআন–হাদীসের দৃষ্টিতে না–জায়েয তাকলীদ সম্পর্কে শাহ সাহেবের মন্তব্য নিম্নরূপঃ

فان بلغنا حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم
المعصوم الذى فرض الله علينا طاعته بسند صالح يدل
على خلاف مذهبه وتركنا حديثه واتبعنا ذالك التخمين
فمن اظلم منا وما عذرنا يوم يقوم الناس لرب العلمين؟
(حجة الله البالغة ج ١ ص ٣٦٥-٣٦٦)

"আমাদের কাছে রসূলে–মা'সূমের হাদীস সহীহ সনদসহ যদি পৌছে যায়, সে হাদীসের অনুসরণ আল্লাহ আমাদের উপর ফরয করে দিয়েছেন আর মুজতাহিদের কথা এর খেলাফ হওয়া সত্ত্বেও হাদীস ছেড়ে মুজতাহিদের অনুমান ও সন্দিগ্ধ রায়ের অনুসরণ করলে আমাদের চেয়ে বড় যালেম আর কে হতে পারে? বিচার দিনে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আমরা এর কি ওজর পেশ করবো?" (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্, ১ম খন্ড, ৩৬৫–৬ পৃষ্ঠা)

হযরত শাহ সাহেব আগেই বলেছেন, এ ধরনের তাকলীদের কারণে ইহুদী শির্কে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। যার প্রেক্ষিতে তাদের বিরুদ্ধে কুরআন নিম্নোক্ত গুরুতর অপরাধবাণী উচ্চারণ করেঃ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابًا من دون الله - (অর্থাৎ, "আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের পাদ্রী–পুরোহিতকে তারা রব বানিয়ে নিয়েছে।")

ইবনে হযমের ফত্ওয়া এবং এর উপর শাহ সাহেবের পর্যালোচনা

ইবনে হযম যাহেরী এবং তার সমমনা আলেমগণের মতে কোনো ইমামেরই সমস্ত কথার তাকলীদ করা জায়েয নেই বরং হারাম। শাহ সাহেব ইবনে হযমের এই ফত্ওয়ার পর্যালোচনায় বলেন, ফত্ওয়াটি যদিও প্রয়োগের দিক থেকে স্বীকৃত নয় এবং এ ব্যাপারে একমত হওয়াও সম্ভব নয়, তথাপি চার ধরনের লোকের ক্ষেত্রে ইবনে হযমের এই ফত্ওয়া সম্পূর্ণ সঠিক ও যথার্থ। তাদের জন্য তাকলীদ করা হারাম।

www.pathagar.com

একঃ যাকে আল্লাহ্ তায়ালা ইজতিহাদ করার শক্তি দান করেছেন, এ ধরনের লোক একটিমাত্র মাসআলায় ইজতিহাদ করতে সক্ষম হলেও এ ব্যাপারে অন্য কারো তাকলীদ করা তাঁর জন্যে আদৌ জায়েয নয়। তাঁর উচিত নিজে ইজতিহাদ করে মাসআলার হুকুম সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

দুইঃ যার একথা সুস্পষ্টভাবে জানা আছে যে, মযহাবী ইমামের ইজতিহাদী রায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহীহ হাদীসের খেলাফ এবং হুজুরের ফয়সালা রহিত নয়।

তিনঃ অজ্ঞ লোক যে কোনো নির্দিষ্ট মযহাবের ইমামকে কেবলমাত্র ভুলের উর্ধেই মনে করে না বরং তার যে কোনো ইজতিহাদী ফত্ওয়াই নির্ভুল সত্য হওয়ার ধারণা পোষণ করে তাকে অনুসরণ করে থাকে। লোকটির সংকল্প এটাও যে, আমার অনুকরণীয় মযহাবের বিপরীত একাধিক হাদীস পাওয়া সত্ত্বেও আপন ইমামের তাকলীদ কখনো পরিত্যাগ করবো না।

চারঃ মযহাবী গোঁড়ামীতে এমন একরোখা ব্যক্তি যে অপর মযহাবের অনুসারী কোনো আলেমের কাছে দ্বীনী মাসআলা জিজ্ঞেস করা জায়েয মনে করে না এবং তাঁর পিছনে নামায পড়াও সঠিক বলে স্বীকার করে না। হযরত শাহ সাহেবও ইবনে হযমের (র) ফত্ওয়ার সাথে ঐক্যমত পোষণ করে এই চার ধরনের লোকের জন্য তাকলীদ করা না–জায়েয ও হারাম বলেছেন। সুতরাং এ সম্পর্কে শাহ সাহেবের বক্তব্য তাঁর নিজের ভাষায়ঃ

وقول ابن حزم (من ان التقليد حرام) انما يتم فيمن
له ضرب من الاجتهاد ولو فى مسئلة واحدة
وفيمن ظهر عليه ظهورا بينا ان النبى صلى الله عليه
وسلم امر بكذا او نهى عن كذا وانه ليس بمنسوخ۔

"ইবনে হযম তাকলীদ হারাম হওয়ার যে ফত্ওয়া দিয়েছেন তা ইজতিহাদ করতে অক্ষম ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যদিও একটিমাত্র মাসআলা প্রসংগেই হোক না কেন।"

দ্বিতীয়ত, হারাম হওয়ার হুকুম এমন লোকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাও যথার্থ যে ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো ব্যাপারে আদেশ

www.pathagar.com

অথবা নিষেধ করার তাৎপর্য অত্যন্ত পরিচ্ছন্নভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছে এবং সে হুকুমটি মানসুখও হয়নি।"

হুকুম মানসুখ না হওয়ার কথা কিভাবে জানা যাবে সে বিষয়ে শাহ সাহেব বলেন ঃ

وذالك اما بان يتتبع الاحاديث واقوال المخالف و
الموافق فى المسئلة فلا يجد لها نسخا - او بان يرى جما
غفيراً من العلماء المتبحرين فى العلم يذهبون اليه
ويرى المخالف لا يحتج الا بقياس او استنباط او نحو ذالك-

"বিষয়টি এভাবে জানা যেতে পারে যে, হাদীসগুলির ওপর অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে গবেষণা করতে হবে এবং মাসআলার স্বপক্ষ ও বিপক্ষ মতামতগুলিও ভালোভাবে তলিয়ে দেখার পরও যদি এর রহিতকারী পাওয়া না যায়। অথবা (এভাবে যে,) সুবিজ্ঞ আলেমদের এক বিরাট জামায়াত এই হাদীসের ওপর আমল করে আসছেন। আর হাদীসের প্রতিপক্ষদের কাছে কিয়াস, উদ্ভাবন অথবা এ ধরনের দুর্বল দলিল ছাড়া অপর কোনো শক্তিশালী দলিল না থাকে।"

এসব অবস্থায় বুঝতে হবে হাদীস মানসুখ নয়। এরপরও যারা হাদীসের বিরোধিতা করে তাকলীদের অন্ধানুকরণ করতে থাকে তাদের সম্পর্কে শাহ সাহেব (র) বলেনঃ

فحينئذ لا سبب لمخالفة حديث النبى صلى الله عليه
وسلم الا نفاق خفى او حمق جلى - اه

"এমতাবস্থায় গোপন মুনাফেকী অথবা প্রকাশ্য অজ্ঞতা ছাড়া হাদীসে রসূলের বিরোধিতা করার অন্য কোনো মৌলিক কারণ নেই।"

وفيمن يكون عاميا ويقلد رجلا من الفقهاء بعينه
يرى انه يمتنع من مثله الخطأ وان ما قاله الصواب
البتة واضمر فى نفسه ان لا يترك تقليده وان
ظهر الدليل على خلافه - اه

www.pathagar.com

"আর অজ্ঞ লোকের বেলায়ও এই ফত্ওয়াটি সঠিক হতে পারে সে একজন নির্দিষ্ট ইমামকে এই মনে করে তাকলীদ করে যে, অনুকরণীয় ইমামের ভুল হতে পারে না এবং তিনি যা কিছু বলেন তা নির্ঘাৎ সত্য ও ন্যায় ভিত্তিক তদুপরি মনে মনে সে এই সংকল্পও পোষণ করে নেয় যে, ইমাম সাহেবের মতের বিরোধী প্রকাশ্য দলীল বর্তমান থাকা সত্ত্বেও আমি তার অনুকরণ করা পরিত্যাগ করতে রাজি নই।"

وفيمن لا يجوز ان يستفتى الحنفى مثلا شافعياً و
بالعكس ولا يجوز ان يقتدى الحنفى بالامام الشافعى -
مثلاً فان هذا قد خالف اجماع القرون الاولى وناقض
الصحابة والتابعين - اهـ

(حجة الله البالغة ص ۲۶۳ - ۲۶۵)

"ইবনে হযমের (র) ফত্ওয়া যেসব লোকদের বেলায়ও প্রযোজ্য মযহাবী গোঁড়ামীর কারণে এ সকল হানাফী মতালম্বী শাফেঈ মতালম্বীর কাছে কিংবা শাফেঈ মতালম্বী হানাফী মতালম্বীর কাছে দ্বীনের কোনো মাসআলা জিজ্ঞাসা করা অথবা একে অপরের পিছনে ইক্তিদা করাকে জায়েয মনে করে না। এ ধরনের তাকলীদ প্রথম যুগের ইজমার খেলাফ এবং সাহাবী ও তাবেঈগণের পদ্ধতির পরিপন্থী।"

(হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ১ম খন্ড, ৩৬৩–৫ পৃষ্ঠা)

তাকলীদ প্রসংগে মাওলানা মওদূদীর (র) দৃষ্টিভংগী

বিগত আলোচনায় তাকলীদ প্রসংগে আলেমগণের যেসব ইলমী তত্ত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ পেশ করা হয়েছে সে আলোকে আমরা 'তাকলীদ' ও 'মযহাব' পরিবর্তন সম্পর্কে মাওলানা মওদূদীর (রঃ) দৃষ্টিভংগীর পর্যালোচনা করতে চাই। তাতে আলেমদের পেশকৃত তত্ত্বসমৃদ্ধ পর্যালোচনার আলোকে মাওলানা মওদূদীর (র) এ সম্পর্ক দৃষ্টিভংগী গ্রহণযোগ্য কিংবা বর্জনীয় তা জানা যায়। 'তাকলীদ' এবং 'মযহাব পরিবর্তন' সম্পর্কে মাওলানার লেখায় তাঁর নিজস্ব যে ফিকহী মতামত জানা গেছে নীচে সেগুলি পেশ করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

অজ্ঞ লোকের তাকলীদ

অজ্ঞ লোকদের তাকলীদ সম্পর্কে মাওলানার রায় হলো–তার এমন প্রত্যেক ফিক্হী মযহাবের তাকলীদ ও অনুসরণ করা জরুরী যাদের বাতলানো পদ্ধতি কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল বলে দৃঢ় আস্থা রয়েছে। তিনি বলেনঃ

"যে নিজে আহকামে ইলাহী ও সুন্নতে নববী সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখে না এবং নিজে মূলতত্ত্ব থেকে শাখা–প্রশাখা উদ্ভাবনে অক্ষম তার জন্যে আলেম ও ইমামদের মধ্যে যার ওপর তার পূর্ণ আস্থা রয়েছে তার বাতানো পদ্ধতি অনুসরণ করা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর নেই। যদি কোনো লোক এ দৃষ্টিভংগীতে তাদের অনুসরণ করে তাহলে তার ওপর অভিযোগ আরোপ করার কোনো সুযোগ নেই।"

(রাসায়েল ও মাসায়েল খঃ ১ পৃঃ ২৩৫–২৩৭)

আলেম লোকের তাকলীদ

তবে আলেম ও পন্ডিত লোকদের বেলায় মাওলানা এ ধরনের তাকলীদ করার পক্ষপাতী নন। এ ব্যাপারে তাঁর মত হলো– যদি তিনি কুরআন হাদীস ও আহকামে ইলাহী সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখেন, তাহলে সরাসরি কুরআন–হাদীস থেকে সঠিক হুকুম জ্ঞাত হওয়ার চেষ্টা করবেন। এ ক্ষেত্রে তিনি প্রথম যুগের আলেমদের মতামতের সাহায্য নিবেন। পরন্তু মযহাবী ইমামদের সাথে সম্পর্কীত বিতর্কিত মাসআলাগুলি নিয়ে খোলা মনে গবেষণা করে দেখতে হবে কার ইজতিহাদ কুরআন ও হাদীসের সাথে সবচেয়ে বেশী সামঞ্জস্যশীল। অতপর যেটা তার কাছে সত্য ও ন্যায় বলে প্রতিভাত হবে সেটাতেই অনুসরণ করতে হবে। মাওলানা (র) লিখেনঃ

"শিক্ষিত জ্ঞানবান লোক যিনি কুরআন–হাদীস ও আহকামে ইলাহী সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী তিনি কুরআন হাদীস থেকে সরাসরি সঠিক হুকুম আহরণ করার চেষ্টা করবেন। এ প্রচেষ্টায় তিনি প্রথম যুগের তত্ত্বজ্ঞানী ওলামাদের মতামতের সাহায্য নিবেন। ইমামদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিতর্কিত মাসআলা নিয়ে সকল গোঁড়ামী পরিহার করে উদার মনে চিন্তা ভাবনা করে দেখতে হবে কার ইজতিহাদ ও গবেষণা কুরআন হাদীসের

www.pathagar.com

সাথে অধিক সুসামঞ্জস্যশীল। তারপর যা কিছু হক ও সত্য বলে মনে হবে তারই অনুসরণ করতে হবে।" (রাসায়েল ও মাসায়েল খঃ ১ম পৃঃ ২৩৫)

এ নীতির অধীনে তিনি ফিকহী মাসআলায় অধিকাংশ সময় ইমাম আবু হানীফাকে (র) অনুসরণ করতেন। কিন্তু সুযোগ পেলে তিনি বিতর্কিত বিষয়ে নিজে অনুসন্ধানও করতেন। গবেষণা করার পর মযহাব চতুষ্টয়ের মধ্যে যাঁর ইজতিহাদ কুরআন হাদীসের উদ্দেশ্যের কাছাকাছি পেতেন তাঁরই অনুসরণ করতেন। আপনি কোন্ মযহাবের অনুসারী? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেনঃ

"আসলে আমি একজন মাত্র ইমামের অনুসারী যার নাম মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তবে ফিক্হী বিষয়ে আমার নিয়ম হলো-যে মাসআলা নিয়ে গবেষণা করার সুযোগ আমার হয় না সে মাসআলায় আমি ইমাম আবু হানীফাকে (র) অনুসরণ করে থাকি। কারণ তাঁর মতামত আমার মূল ইমামের [রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] শিক্ষার সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ পেয়েছি। তবে যে মাসআলা নিয়ে আমার গবেষণা করার সুযোগ হয় সে বিষয়ে আমি চার মযহাবের ইমামগণের অনুসৃত নীতির প্রতি নজর দেই। যার তত্ত্বসাধনা কুরআন হাদীসের সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল পাই উহারই অনুসরণ করি।"

(তর্জমানুল কুরআন খঃ ৩৮ সংখ্যা ১-২ পৃষ্ঠাঃ ১১৯)

মাওলানার (র) লেখায় একথাও জানা গেল যে, তিনি ফিকহী মাসআলায় একাকিত্ব জায়েয স্বীকার করলেও এটি তাঁর পসন্দনীয় ছিল না এবং অন্যান্য মযহাবের তুলনায় ইমাম আযমের (র) মযহাবের ওপর অধিক আস্থা পোষণ করতেন। তবে পর্যালোচনার পর দলিলের ভিত্তিতে অপর যে কোনো মযহাবকেই প্রাধান্য দিয়ে নিশ্চিত হতে দ্বিধা করতেন না। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেনঃ

"আমি ফিক্হী মাসআলায় একাকী হওয়া পসন্দ করি না। এ পরিস্থিতিতে আমি প্রায়শ এই করি যে, যদি কোনো মাসআলার ব্যাপারে হানাফী মযহাবে নিশ্চিত হতে না পারি, তাহলে অপরাপর মযহাবের আহকাম ও দলীলের প্রতি দৃষ্টি দেই এবং আপন সাধ্যানুযায়ী সেগুলি যাচাই বাছাই করার পর একটি ফত্ওয়াকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি। এ পদ্ধতি থেকে বিচ্যুত হয়ে চার মযহাব বহির্ভূত অপর কোনো মযহাবকে প্রাধান্য দেয়া আমার

www.pathagar.com

অতি বিরল ঘটনা। আর দৈবাৎ যদি কখনো এরূপ হয়েই থাকে তাহলে কোনো মুজতাহিদের রায় কবুল করতেই হবে। আমার নিছক একক রায় কদাচিত পেশ হয়ে থাকে। আমার মতে একক রায় যদিও হারাম পর্যায়ের নয় তথাপি আমি মনে করি এর জন্যে খুব মজবুত দলীলের প্রয়োজন। প্রথম যুগের কোনোই আলেমের মতের সাথে আমার মতের সংগতি নেই ফিকহী মাসআলায় এমন মত প্রকাশের আকস্মিকতা আমার কমই হয়েছে। এ ধরনের তথাকথিত তাকলীদ না করার কথা আমি নিজেই স্বীকার করি এবং তা পরিত্যাগ করতে আমি প্রস্তুত নই। গালি-গালাজ ও তিরস্কারের পরিবর্তে কুরআন হাদীসের মাধ্যমে এ ধরনের আকীদাকে পাপ বলে সাব্যস্থ করতে পারলে নির্দ্বিধায় তৎক্ষণাৎ তা পরিহার করতে আমার বিন্দুমাত্র সংকোচ নেই।"

(তর্জমানুল কুরআন খঃ ৩৬, সংখ্যা ৫, ৬)

মযহাব পরিবর্তনের দৃষ্টিভংগী

এ ব্যাপারেও মওলানা মওদূদীর (র) দৃষ্টিভংগী প্রথম যুগের তত্ত্বজ্ঞানী আলেমদের দৃষ্টিভংগীর হুবহু প্রতিচ্ছবি। এক মযহাব পরিবর্তন করে অন্য মযহাব গ্রহণ করা কোনো কোনো ফকীহের মতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ মন্তব্যের প্রতি মাওলানার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জবাবে বলেনঃ

"আমার মতে শুধুমাত্র প্রবৃত্তির অনুসরণে এক মযহাবের পরিবর্তে অন্য মযহাব গ্রহণ করা গুনাহের ব্যাপার। কিন্তু পর্যালোচনা গবেষণা ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে হলে গুনাহ হওয়ার কথা নয়।"

(রাসায়েল ও মাসায়েল, প্রথম খন্ড)

নাজায়েয তাকলীদ

যে তাকলীদে ইমামদেরকে আদেশদাতা নিষেধকর্তা মনে করা হয়, সে ধরনের তাকলীদকে মাওলানা মওদূদী (র) নাজায়েয মনে করেন অথবা মূল আদেশদাতা ও নিষেধকর্তা রূপে ইমামের আনুগত্য করা হয়। যেমন, ইমামদের ছক বাধা নিয়মাবলীর কোনো বিশেষ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলেই আসল দ্বীন থেকে বিচ্যুত হওয়ার নামান্তর মনে করা। অথবা কোনো মাসআলা সহীহ হাদীস অথবা কুরআনের আয়াতের খেলাফ জানা সত্ত্বেও সে বিষয়ে

www.pathagar.com

ইমামের অনুসরণ করার ব্যাপারে একগুয়েমী করা। এ ধরনের তাকলীদ মাওলানা মওদূদীর (র) মতে কেবল বড় ধরনের গুণাই নয়; বরং এটা শির্ক পর্যায়ের পাপও। এ জাতীয় তাকলীদ সম্পর্কে তাঁর ভাষ্যঃ

> "কিন্তু যদি কেউ ইমামকে আদেশদাতা ও নিষেধকর্তা মনে করে অথবা মূল আদেশ নিষেধদাতার সমপর্যায়ের মনে করে তার আনুগত্য করে, অর্থাৎ ইমামদের নির্ধারিত নিয়ম ভংগ করাকে মূল দ্বীন থেকে বহির্ভূত হওয়ার নামান্তর মনে করে এবং মাসআলাটি সহীহ হাদীস ও কুরআন বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও ইমামকেই অনুসরণ করার ঝোঁকপ্রবণতা দেখা যায়, তাহলে নিসন্দেহে সে তাকলীদ শির্কের অন্তর্ভুক্ত হবে।"
>
> (রাসায়েল ও মাসায়েল খঃ ১, পৃঃ ২৩৭)

মাওলানার (র) রায়েয় সারমর্ম

তাকলীদ এবং মযহাবের পরিবর্তন সম্পর্কে যেসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তাঁর রচনাবলীতে পাওয়া যায় তার সার সংক্ষেপ নিম্নোক্ত পাঁচটি বিষয়। বিষয় পাঁচটি মাওলানার ফিকহী মতামতের বহিঃপ্রকাশ বৈকি! এগুলির হক ও প্রমাণ সিদ্ধতা অস্বীকার করা নিরপেক্ষ ব্যক্তি ও সত্যাশ্রয়ী কোনো আলেমের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। এর আলোকে মাওলানার (র) ফিকহী নীতি সম্পর্কে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, নীতিগতভাবে তাঁর সাথে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু সেটাকে না-জায়েয বা গোমরাহ কোনোক্রমেই বলা যায় না। কারণ বিগতকালের প্রাজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ আলেমগণ এ মতই পোষণ করে আসছেন।

তবে যে সকল ভদ্র মহোদয়ের মন-মস্তিষ্ক গোঁড়ামীর মোহে আচ্ছন্ন অথবা যাদের ধারণায় তাকলীদ করাই দ্বীনের মূল বিষয় এবং এথেকে বিচ্যুত হওয়া দ্বীন থেকে বিচ্যুতি হওয়ারই নামান্তর কিংবা যারা মাওলানা মওদূদীর (র) সাথে অকারণ শত্রুতা পোষণ করে তারাই শুধু তাঁর এই নীতিকে নাজায়েয কিংবা বাতিল বলার ধৃষ্ঠতা দেখাতে পারে। তারা বলতে পারেন এটা সত্য নয় বরং বাতিল গ্রহণ যোগ্য নয় অস্বীকৃত। শুধু কি তাই। তারা আরো বলতে পারেন মাওলানার এই নীতি বিভ্রান্তিকর এবং এই মত পোষণ করার ফলে মাওলানা নিজেও গোমরাহ হয়ে গেছেন। নাউজুবিল্লাহ! নিম্নে লক্ষ্যণীয় পাঁচটি বিষয়ঃ

www.pathagar.com

একঃ একটি ফিক্হী মযহাব পরিত্যাগ করে অন্য মযহাব গ্রহণ করা গুনাহের কাজ নয়। তবে শর্ত হলো–পরিবর্তন হতে হবে সত্য ও ন্যায় তালাশের অভিপ্রায়ে, প্রবৃত্তির তাড়নায় নয় কিংবা মযহাবের সাথে উপহাসস্থলে না হওয়া। অন্যথায় এটা হবে মস্তবড় গুনাহ।

দুইঃ অজ্ঞ লোকের জন্য মযহাব চতুষ্টয়ের মধ্যে যাঁর অনুসৃত পন্থা কুরআন হাদীসের সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল বলে আস্থা থাকবে সে পন্থারই অনুসরণ ও তাকলীদ করতে হবে। আর শিক্ষিত আলেম লোক কুরআন হাদীস থেকে সঠিক হুকুম সরাসরি জানতে চেষ্টা করবে। এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী যুগের তত্ত্বজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান আলেমদের মতেরও সাহায্য নিতে হবে।

তিনঃ আলেমগণ চার মযহাবের সাথে সংশ্লিষ্ট ফিকহী মাসআলা নিয়ে খোলা মনে পর্যালোচনা করবে। তারপর যে মত তার কাছে সত্য বলে মনে হবে সে মতের অনুসরণ করবে।

চারঃ চার মযহাব বহির্ভূত আমল পসন্দনীয় নয় যদিও কুরআন হাদীসের শক্তিশালী দলীলের ভিত্তিতে সেটা হারামও নয়, বিশেষত যখন চার ইমাম ছাড়া অপরাপর ইমামদের যে কোনো একজন ইমামের সাথে সম্পৃক্ত থাকবেন।

পাঁচঃ কুরআন ও সহীহ হাদীসের খেলাফ না হলেই মুজতাহিদ ইমামদের তাকলীদ করা জায়েয। অন্যথায় সেটা হবে হারাম এমনকি শির্ক পর্যায়ের।

তাকলীদ এবং মযহাব পরিবর্তন প্রসংগে ইতিপূর্বের আলোচনায় হযরত শাহ সাহেবসহ (র) অন্যান্য তত্ত্বদর্শী আলেমগণের যে ব্যাখ্যা বিবৃতির উল্লেখ করা হয়েছে তার আলোকে মাওলানা মওদূদীর (র) ফিকহী নীতির ওপর চিন্তা করা হলে আমরা তাঁর নীতিকে সে সকল আলেমের নীতির সাথে বিন্দু পরিমাণ পার্থক্য খুঁজে পাই না। তাকলীদ এবং মযহাব পরিবর্তন প্রসংগে তাদের উক্তিতে সবিস্তারে যে সমস্ত বিষয়বস্তুর উল্লেখ রয়েছে মাওলানা মওদূদীর (র) প্রবন্ধেও সে সব কিছুই দেখতে পাওয়া যায়। তবে একটি বিষয়ে ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। সেটা হলো–মাওলানা মওদূদী (র) চার মযহাবের গন্ডি বহির্ভূত হওয়া'কে নাজায়েয নয় বরং অপসন্দনীয় কাজ বলেছেন আর অন্যান্য আলেমগণ এটাকে নাজায়েয ঘোষণা করেছেন। এ ছাড়া অন্যান্য সকল দিক্ থেকে এ প্রসংগে মাওলানার (র) সাথে অপরাপর আলেমদের কোনো পার্থক্য

www.pathagar.com

পরিদৃষ্ট হচ্ছে না এবং ফিক্হী নীতিতে একে অপরের সাথে অমিল নয়, মিলই রয়েছে।

এ দৃষ্টিভংগী কি অপরাধমূলক?

আমরা বুঝতে পারছি না যে, তাকলীদ এবং মযহাব প্রসংগে মরহুম মাওলানার অনুসৃত নীতি যদি অমার্জনীয় অপরাধ হয়ে থাকে যার কারণে প্রতি ক্ষেত্রে ও সর্ব মহল থেকে তাঁর প্রতি নির্মম অভিশাপ বর্ষিত হচ্ছে তাহলে এ ধরনের অপরাধ তো কেবলমাত্র মাওলানা মওদূদী (র) একাই করেননি। হযরত শাহ সাহেবসহ (র) উম্মতের আরো অনেক আলেমই বরং এ জাতীয় অপরাধে অপরাধী। সুতরাং অন্যান্য আলেমগণও মাওলানা মওদূদীর (র) সাথে সমভাবে শরীক অথচ গাইর মুকাল্লিদ, আহলে সুন্নত জামায়াত থেকে খারিজ এবং গোমরাহ হওয়ার মতো অভিযোগের বোঝা বহন করছেন মরহুম মাওলানা এককভাবে। এটাই কি ইনসাফ? এর যুক্তিসংগত কোনো কারণ আছে কি? একই অপরাধে সমভাবে শরীক থাকা সত্ত্বেও হযরত শাহ ওলী উল্লাহসহ (র) অন্যান্য অনেক আলেম যদি বিশেষ সুদৃষ্টি লাভের যোগ্যপাত্র বিবেচিত হতে পারেন, তাহলে আমাদের প্রশ্ন মাওলানা মওদূদী (র) সাহেবকে সে ধরনের কৃপাদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করার সংগত কারণ কি?

ইনসাফের আজব মহড়া

ইনসাফের এটা এক বিস্ময়কর মহড়া যে, একই আদালতে অভিন্ন অপরাধের পরিণামে একদল আসামী তার সংগী সাথীসহ সমস্ত দলটিকে আহলে সুন্নত জামায়াত থেকে খারিজ করে এমনকি তাদের ইসলামকে পর্যন্ত ভয়ানক-বিপজ্জনক রায় দেয়া হল। অপরদিকে অন্যান্য আসামীকে একই আদালতে একই অপরাধের দায়ে দন্ডের বদলে পুরস্কৃত করেই ক্ষান্ত হয়নি, তাদেরকে বরং নিজেদের অনুসরণীয় পরম সম্মানিত বুযর্গ ইমাম এবং মযহাবী নেতারূপে ঘোষণা দেয়া হয়।

আদালতের এসব ভদ্রবেশী বিচারকগণ কখনো একথা চিন্তা করে দেখেছেন কি, যে কিয়ামত দিবসে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালা যদি তাদেরকে

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا [১]

---

১. "আর কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে তাদের প্রতি ন্যায়নীতি বিমুখ অন্যায় আচরণে উদ্বুদ্ধ না করে।" –সূরা মায়েদা, ৮ঃ আয়াত

www.pathagar.com

আয়াতের হুকুম কতটুকু বাস্তবায়িত করেছ? প্রশ্ন করেন তাহলে জবাব তারা কি দিবেন? এরি প্রেক্ষিতে আরবী প্রবাদ বাক্যটি উল্লেখ করা যেতে পারে। যথা

بئس الداء داء التعصب لم يعصم منه الا من عصمه الله ১

এটা কোনো নতুন কথা নয়

কুরআন হাদীসের সুস্পষ্ট হুকুমের মুকাবিলায় তাকলীদ করার কসম খেয়ে বসে থাকাকে মাওলানা মওদূদী (র) যদি শির্ক কিংবা হারাম বলে থাকেন, তাহলে এটা কোনো নতুন কথা নয়। পূর্বেও তো কেউ এটাকে জায়েয, মুস্তাহাব, ফরয অথবা ওয়াজিব বলেন নি; সকলেই বরং হারাম বলেছেন। বস্তুত এরি কল্যাণে (!) ইহুদী নাসারা জাতির সম্পর্ক আহলে তাওহীদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আহলে শির্কের সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর اتخاذ الارباب (পুরোহিতদের রব বানানোর) জঘন্যতম অপরাধের বোঝা তাদের ঘাড়ে চাপানো হয়। মাওলানা মওদূদী (র) ও অন্যান্য আলেমগণের এ ধরনের কথায় ইসলামের কোন্ বুনিয়াদের ওপর বোমাবর্ষিত হল? যদ্দরুন ইসলামের ধারক বাহকগণ এতোই বিচলিত হয়ে উঠেন যে, সময় মতো তাদেরকে কাফের ও গোমরাহীর ফতওয়া মনে বিদ্ধ করে প্রতিরক্ষায় আত্মনিয়োগ করা না হলে ইসলামের অট্টালিকা ধসে পড়বে?

হায় রে আক্ষেপ!

আজকের সংকটমুহূর্তে দেশের আনাচে-কানাচে বেদ্বীনীর চর্চা যখন আমরা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, উলংগপনা ও বেলাল্লাপনা যখন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, ইহুদী ও কাফিয়ানী মতবাদ এবং হাদীস অস্বীকারকারীদের ফিৎনা দেশের আনাচে কানাচে অবাধে ছড়িয়ে পড়ছে, বেহায়াপনা ও বেদ্বীনী জীবন যাপন কতোকে সাংস্কৃতিক ও আভিজাত্যের প্রতীক ধারণা করা হচ্ছে, দেশে এমন লোকের সংখ্যা যখন কমতি নেই। আল্লাহর আইনের প্রকাশ্য বিকৃতকারী ও শরয়া আইনের সংশোধনে যারা মেতে উঠেছে, তখন আমাদের দ্বীন ও মযহাবের ঠিকাদারগণ তাদের বিরুদ্ধে টু শব্দটি মুখে আনতে নারাজ। ইসলাম বিরোধী এসব তৎপরতা তারা নিরবে নিভৃতে হজম করে যাচ্ছে, ঘাপটি মেরে নিরাপদ আশ্রয়ে চুপচাপ বসে আছেন। আর মাওলানা মওদূদীর (র) নাম

---

১. "গোঁড়ামী রোগ অতি জটিল। আল্লাহ যাকে রক্ষা করেন সেই কেবল এই রোগ থেকে রক্ষা পেতে পারে।"

www.pathagar.com

শুনামাত্র ক্ষুধার্ত বাঘের মতো গর্জন করতে থাকেন, রাগে রোষে তাদের মুখ থেকে এমন বাক্য নিঃসৃত হয় যা একজন আলেমের মুখ থেকে বের হওয়া তো দূরের কথা একজন ভদ্র রুচিবান লোকের মুখেও বের হওয়া সমীচী নয়। এসব লোকের মুখে কাদিয়ানী, ইহুদী, মুনকিরে হাদীস সম্পর্কে যখন একটি শব্দও উচ্চদিত হয় না, তখন আমাদের পরিতাপের সীমা পরিসীমা থাকে না। এটা কোন্ ধাঁধাঁ! যার নয়ন ঝলসানো মরীচিকায় আটকা পড়ে তারা খোদা প্রদত্ত শক্তিকে যারা স্বয়ং খোদার আইন কানুনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে, এমনকি সেগুলি সংশোধন করার দুঃসাহস পর্যন্ত দেখাচ্ছে তাদের প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা সেদিকে চোখ খুলে দেখাও অপরাধ গণ্য করছে। খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে মুখে তারা, কাদিয়ানীদের সম্পর্কে মুখেশব্দ নাই, মুনকিরে হাদীসগোষ্ঠী তলে তলে শিকড় গাড়ছে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই, এহেন পরিস্থিতিতে একমাত্র মাওলানা মওদূদীই (র) সেই বলিষ্ঠ কন্ঠস্বর ন্যায়ের দন্ড হাতে যিনি ময়দানে দন্ডায়মান এবং ইসলামের সহজ সরল ঝাণ্ডার নীচে সমবেত হওয়ার উদাত্ত আহ্বানে আকাশ পাতাল কাঁপিয়ে তুলছেন। অথচ কেবল এই অপরাধে আজ সবদিক থেকে এই মর্দে মুজাহিদের ওপর আক্রমণের বাণ ছোড়া হচ্ছে। কিন্তু যেহেতু তিনি এক ও লা-শরিক আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো পায়ে মাথা ঠুকতে প্রস্তুত নন এবং কারো আস্তানায় 'জ্বী হুজুর' যিকির তুলতে আর করজোড়ে কুর্নিশ আরযে অনভ্যস্ত সুতরাং আজ ক্ষমতাসীনদের দৃষ্টিতে তদ্রুপ ধর্মের পতাকাবাহীদের দৃষ্টিতেও তিনি অভিশপ্ত যদি একদিক থেকে মাওলানা (র) ও তাঁর জামায়াত সম্পর্কে আওয়াজ উঠে

إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون [১]

তাহলে অন্যদিক থেকে উচ্চারিত হয়।

إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد- [২]

কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী সত্যের প্রতি আহ্বানকারীর প্রত্যেকের বিরুদ্ধে এ ধরনের আওয়াজ উৎক্ষিপ্ত ছিল আবার স্বতঃই তা মিশেও গিয়েছে। পরিশেষে

---

১. তারা (বনী ইসলাঈল সম্প্রদায় আমাদের তুলনায়) একটি ক্ষুদ্রদল, এবং তারা আমাদেরকে ভীষণ উত্যক্ত করেছে। (সূরা শুআরা, ৫৪-৫ আয়াত)

২. আমাদের আশংকা হয়-সে তোমাদের ধর্মই পরিবর্তন করে দিবে, অথবা রাজ্যময় কোন বিপর্যয় ঘটিয়ে ফেলবে।

www.pathagar.com

সত্য ও ন্যায়ের কন্ঠ সোচ্চার সমুদ্ভাসিত হয়েই থাকে। বস্তুত এরাই হলো আল্লাহর সেনাদল, এরাই নিশিত সফলকাম। যথা–কোরআনের ভাষায়ঃ

أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ -

(এরাই আল্লার সেনাদল; উত্তমরূপে শুনে রাখ–আল্লার দলই সফলকাম হবে. –সূরা মুজাদালী, ২২ আয়াত)

তাকলীদ প্রসংগে তিনটি দৃষ্টিভংগী

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যখন থেকে ব্যক্তি অনুকরণের রীতি চালু হয়, তখন থেকেই এ সম্পর্কে আপামর জনসাধারণের মধ্যে তিনটি বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টিভংগীর সৃষ্টি হয়। এ কারণে জনগণও তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

একঃ এই শ্রেণীর লোক সব সময়ই তাকলীদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও সীমাতিক্রম করে। ছোটবড় প্রত্যেক মাসআলায় তারা তাকলীদ করাকে ফরয এবং ওয়াজিব মনে করে। তাদের দৃষ্টিতে মযহাবী ইমামদের মর্যাদা 'মাধ্যম' হওয়ার পরিবর্তে তাদের ব্যক্তিগত অনুসরণ ও আনুগত্য করাই মূল উদ্দেশ্য। এসব লোক মযহাবী গোঁড়ামীতে সব সময় এমনভাবে নিমজ্জিত থাকে যে, মযহাবের ইজতিহাদী ছোট খাটো ব্যাপারে এবং ফিক্হী মাসআলায় অণু পরিমাণ বস্তুও ছাড়তে কোনো সময়ই প্রস্তুত নয় যদিও সেটা কুরআন হাদীসের সুস্পষ্ট হুকুমের বিরোধী হোক না কেন। অপরদিকে, কুরআন হাদীসের সুস্পষ্ট বিধানের সাথে মযহাবের সিদ্ধান্ত সমূহকে সামঞ্জস্যশীল করার অভিপ্রায়ে অপ্রাসংগিক তাবিল এবং অমূলক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সমূহকে জায়েয বরং ফরয ও ওয়াজিব মনে করে। তবুও তাকলীদনীতি পরিহার করা জায়েয মনে করে না। বরং পরিহার করাকে মূলদীন পরিহার করারই নামান্তর মনে করে যদিও সেটা একটি মাত্র মাসআলা এবং কুরআন হাদীসের সুস্পষ্ট বিধানের মুকাবিলায় হোক না কেন। চার মযহাবের সাথে সংশ্লিষ্ট লোকদের মধ্যে অধিকাংশের অবস্থাই এ জাতীয়।

দুইঃ এর বিপরীত স্তরের লোকগণ সব সময় ব্যক্তি অনুকরণের বিরোধিতা করে বেড়ায়। তাদের মতে চার ইমামের কাউকেই অনুসরণ করা জায়েয নয়। বরং প্রত্যেকটি লোকের কুরআন হাদীস সরাসরি অনুসরণ করা জরুরী। এই শ্রেণীর লোকরাও তাকলীদ না করার ব্যাপারে প্রথম শ্রেণীর লোকদের মতো বাড়াবাড়ি ও সীমাতিক্রম করে। মধ্যম পন্থা তাদের নজরেই পড়ে না।

www.pathagar.com

তিনঃ তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছেন সত্যাশ্রয়ী হক পন্থী আলেম সমাজ। তাঁরা সব সময় মধ্যম নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম স্তরের লোকদের মতো প্রত্যেক মাসআলায় নির্দিষ্ট ইমামের তাকলীদ করাকে তাঁরা ওয়াজিব মনে করেন না এমনকি কুরআন হাদীসের সুস্পষ্ট আহকামের মুকাবিলায় ইমামের কথা ত্যাগ করতেও তৈরী এবং চার মযহাবের খুটীনাটি ব্যাপারে চিন্তা গবেষণা করা আর দলীলের ভিত্তিতে প্রাধান্য দেওয়াকে জায়েয মনে করেন।

দ্বিতীয় স্তরের লোকদের ন্যায় মযহাবী ইমামদের তাকলীদ করাকে শর্তহীন না-জায়েয আখ্যা দিয়ে কুরআন হাদীস থেকে সরাসরি আহকাম জ্ঞাত হয়ে অনুসরণ করা প্রত্যেকের জন্য তাঁরা জরুরী মনে করেন না। তাকলীদ সম্পর্কে তাঁদের সার্বক্ষণিক দৃষ্টিভংগী হলো-যেসব মাসআলায় ইমামদের ইজতিহাদ কুরআন হাদীসের সুস্পষ্ট বিধানের খেলাফ নয় সেসব বিষয়ে তাঁদের তাকলীদ করা হবে এবং এ তাকলীদ নিঃসন্দেহে জায়েয বরং সাধারণ লোকদের জন্য ওয়াজিব। কেননা, সাধারণ লোক যখন কুরআন হাদীসের জ্ঞানই রাখে না সে অবস্থায় কুরআন হাদীস থেকে সরাসরি আহকাম জ্ঞাত হয়ে তা অনুসরণ করার অবকাশ কোথায়! এমতাবস্থায় যদি তারা কোনো একজন ইমামের তাকলীদ না করে তাহলে দ্বীনী মাসআলায় শরয়ী আহকামের অনুসরণ করা দুষ্কর নয় বরং অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

সত্যের নিকটতম দৃষ্টিভংগী কোন্‌টি?

এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, উপরোক্ত তিনটি দৃষ্টিভংগীর মধ্যে সত্যের নিকটতম দৃষ্টিভংগী কোন্‌টি? আর কোন্‌টি নয়? আমাদের জানা মতে তৃতীয় এবং সর্বশেষ দৃষ্টিভঙ্গীকে আমরা সত্য ও সঠিক মনে করি। প্রথম ও দ্বিতীয় অভিমতের সাথে আমরা একমত নই। প্রথম অভিমতের সাথে একমত না হওয়ার কারণ হলো-এই দৃষ্টিভংগী একদিকে কুরআন হাদীসের আহকামের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। কারণ, কুরআনের বহু আয়াত এবং রসূলের বহু হাদীসে আল্লাহ্ ও রসূলের আহকামের আনুগত্য করার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। এর মুকাবিলায় গাইরুল্লার আনুগত্য করা-সে আনুগত্য আলেম এবং পীর-পুরোহিতদের অনুকূলে হোক কিংবা রাজনৈতিক নেতার পক্ষে হোক-নিষিদ্ধ বরং শির্ক পর্যন্ত বলা হয়েছে। অন্যদিকে, আলেম ও নেক্‌কার লোকগণ সর্ব- সম্মতিক্রমে এই তাকলীদ পরিত্যাগ করতঃ মুকাবিলা অবস্থায় কুরআন হাদীসের অনুসরণ করে নিজেদের এ ধারা প্রতিষ্ঠা করেন যে, এমন অবস্থার

www.pathagar.com

মুখোমুখি হলে কুরআন হাদীস অনুযায়ী আমল করতে হবে এবং তাকলিদী নীতি অবশ্যই পরিহার করতে হবে। এ ধরনের তাকলীদ করার জন্য যারা চাপ দেয় তাদের সম্পর্কে হিজরী ৭ম শতাব্দীর শাফেঈ মতাবলম্বী প্রখ্যাত আলেম ইয্‌যুদ্দীন ইবনে আবদুস্‌ সালাম বলেনঃ

ومن العجب العجيب ان الفقهاء المقلدين يقف احدهم
على ضعف ماخذ امامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعا
وهو مع ذالك يقلده فيه ويترك من شهد له الكتاب
والسنة والاقيسة الصحيحة لمذهبهم جمودا على تقليد
امامه بل يتحيل لدفع الكتاب والسنة بالتاويلات
البعيدة الباطلة نضالا عن مقلده (حجة الله البالغه)

"বড়ই আশ্চর্য! কতিপয় মুকাল্লিদ ফকীহ নিজেদের ইমামের দলীল দুর্বল হওয়া সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও স্বীয় ইমামদেরকে নির্দ্বিধায় অনুসরণ করতঃ কুরআন হাদীস ও সঠিক কিয়াস কর্তৃক স্বীকৃত মযহাবকে পরিত্যাগ করে চলছেন অথচ তাদের কাছে এর কোনো জবাব নেই। নিজেদের মযহাবের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার উদ্দেশ্য তারা এরূপ কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করে থাকেন। এমনকি কুরআন হাদীসকে খন্ডন করে স্বীয় ইমামের সহায়তা করার লক্ষ্যে কুরআন হাদীসের সাথে সম্পর্কহীন অপব্যাখ্যার আশ্রয়ও গ্রহণ করে থাকেন।" (হুজ্জতুল্লাহিল বালিগাহ্)

এ দল সম্পর্কে আল্লামা তিবী, আল্লামা সিন্ধী এবং শাহ ওলী উল্লাহ প্রমুখাতের ব্যাখ্যা আগেই দেয়া হয়েছে। যাতে ব্যক্ত হয়েছে এ ধরনের তাকলীদ কুরআন হাদীসের আলোকে জায়েয নেই। জায়েয করার জন্য কুরআন হাদীসের কোনো প্রমাণও পেশ করা সম্ভব নয়। পূর্ববর্তী আলেমগণও এটাকে জায়েয মনে করেনি। দ্বিতীয় দল সম্পর্কে বলা যায় তারাও সত্যের কাছাকাছি নয়। কারণ, এ সত্য স্বতই স্বীকার্য যে, জীবনের সমস্ত সমস্যা এবং পৃথিবীর লয় পর্যন্ত আগত সমস্ত ঘটনা-দুর্ঘটনার কুরআন হাদীস ভিত্তিক আহকাম প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত নয়-একথা মূহূর্তের তরেও অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রতিটি বিষয় কুরআন হাদীসে স্ববিস্তারে প্রাপ্ত হওয়াও সম্ভব নয়। সুতরাং কুরআন হাদীসের স্পষ্ট বিধানের অন্তর্গত ছাড়া বহির্ভূত বিষয়ে ইমামগণের ইজতিহাদ

www.pathagar.com

করা অপরিহার্য কর্তব্য। উম্মতের সম্মানিত মুজতাহিদগণ এ কর্তব্য সুচারুরূপে আঞ্জাম দিয়েও গেছেন। প্রমাণভিত্তিক নীতি থেকে আহকাম আহরণ করে অপ্রমাণ শাখা প্রশাখায় প্রয়োগ করে তা তারা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। অতএব, এমন সব ব্যাপারে এবং সমস্যার সমাধানকল্পে মুজতাহিদ ইমামদের উদ্ভাবিত নীতির অনুসরণ করা ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। মূলত এরি নাম তাকলীদ।

তাছাড়া কুরআন হাদীস থেকে সরাসরি হুকুম অবগত হওয়া সকলের জন্য সম্ভব নয়। বস্তুতঃ সাধারণ লোক এবং ইজতিহাদ করার অযোগ্য আলেমগণ এ কাজ করতে সক্ষম নয়। এমতাবস্থায় যদি মুজতাহিদগণের অনুসরণ করা তাদের জন্যে জায়েয সাব্যস্থ না করা হয়, তাহলে তারা যেসব মাসআলায় শরীয়তের প্রমাণ আরোপিত হয়নি সেসব মাসআলা কিভাবে বাস্তবায়িত করবে এবং শরীয়তের উদ্দেশ্যই বা কিভাবে পূর্ণ হতে পারে? সুতরাং মুজতাহিদ ইমামগণের তাকলীদ করা ছাড়া উম্মত কোনো সময়ই অমুখাপেক্ষী থাকতে পারেনা।

তারপর তৃতীয় স্তরের লোকদের সম্পর্কে বলা যায়, তাকলীদ করার নীতিতে তারা তাদের মধ্যে প্রান্তিকতা পাওয়া যায় না। কেননা, ইমামকে তারা একজন শরীয়তদাতার দৃষ্টিতে আনুগত্য করে না বরং শরীয়তের একজন ব্যাখ্যাকার বা প্রতিনিধি মনে করে। পরন্তু তাকলীদের ব্যাপারে তাদের মধ্যে অযথা বাড়াবাড়িও নেই যে, প্রত্যেক ছোটখাটো ব্যাপারে তাকলীদের অনুসরণ অপরিহার্য ধারণা করে বসে আছে। প্রথম দলের মতো কুরআন হাদীসের প্রতি উপেক্ষা এবং বিমুখিতাও তাদের মধ্যে নেই। সুতরাং এই দল সত্যের কাছাকাছি। কারণ, এ প্রকৃতির তাকলীদ করা প্রকৃতপক্ষে কুরআন হাদীস অনুসরণ করার একটি বাস্তবরূপ। এর ওপর ভিত্তি করে তত্ত্বজ্ঞানী আলেমগণ তাকলীদ সম্পর্কে এই দৃষ্টিভংগীই সব সময় পোষণ করে আসছেন এবং এটাকে 'মধ্যম পন্থা' নামে অভিহিত করেছেন।

যা কিছু পেশ করা হলো তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কুরআন হাদীসে প্রাজ্ঞ-অভিজ্ঞ আলেমগণ তাদের রচিত গ্রন্থরাজিতে বর্ণনা করেছেন। কতিপয় ব্যাখ্যা আপনারা ইতিপূর্বের আলোচনায় পাঠ করেছেন। নীচে একজন আরেক, কুরআন হাদীসে সে দক্ষ ব্যক্তিত্ব ইমাম ইবনে তাইমিয়ার ব্যাখ্যা লক্ষ্য করুন।

www.pathagar.com

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার (র) অভিমত

হাফেজ ইবনে তাইমিয়া (র) ইবনে হাযম জাহেরী এবং অপর কোনো কোনো গোঁড়া আলেমের ন্যায় ইমামদের তাকলীদ করাকে নিঃশর্ত হারাম বলেননি। আবার শর্তহীন তাকলীদ করার অনুমতিও প্রদান করেননি যে, কুরআন হাদীসের সুস্পষ্ট বিধানের খেলাফ হলেও তাকলীদ কোনো অবস্থাতেই ত্যাগ করা যাবে না। এ ব্যাপারে তাঁর অভিমত খুবই সংযত ও যথার্থ মনে হয়। তিনি একদিকে এ সত্য স্বীকার করেছেন যে, সাধারণ লোক এবং মুজতাহিদ নয় এমন আলেমগণের পক্ষে মুজতাহিদ ইমামগণের তাকলীদ করা একটি সহজাত ব্যাপার, যা থেকে তাদের পরিত্রাণ নেই। উপরন্তু এ ছাড়া তাদের কোনো উপায়ও নেই। বলাবাহুল্য ইমামগণের মর্যাদা হলো চলার পথের শরীয়ত সম্মত দিশারী বা মাধ্যম বিশেষ মযহাবের অনুসরণ একটি বাস্তব ও স্বাভাবিক প্রয়োজন এবং সহজাত বিষয় মাত্র। তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ ফতওয়ায় লিখেছেনঃ

> "আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করা আল্লাহ ও রসূল কর্তৃক নির্ধারিত হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম মনে করা এবং আল্লাহ ও রসূলের ওয়াজিব ঘোষিত ব্যাপারে ওয়াজিবের ন্যায় আমল আচরণ করা সমগ্র জিন ইনসানের জন্য ওয়াজিব এবং গোপনে-প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় সকলের জন্য ফরয।"

তবে বহুসংখ্যক এমন হুকুমও রয়েছে, যে ব্যাপারে অনেকেরই জানা নাই। সুতরাং সে সমস্ত অজ্ঞাত বিষয়ে যারা জ্ঞান পারদর্শী এবং অজ্ঞ লোকদের শিক্ষা দেন, তাঁদের সরণাপন্ন হওয়া সাধারণ লোকদের কর্তব্য। কারণ রসূলের শিক্ষা সম্পর্কে তাঁরা অধিক ওয়াকিফহাল। অধিকন্তু রসূলের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে অধিক সচেতন। সাধারণ মুসলমান সে সকল মুজতাহিদ ইমামগণের অনুসরণ করে থাকে; তাঁরা মূলত রসূলের পরিচয় লাভের ব্যাপারে পথের দিশারী, মাধ্যম ও উপকরণ পর্যায়ভুক্ত। তাঁরা রসূলে বাণীর প্রচারক এবং নিজেদের ইজতিহাদ ও সামর্থ অনুযায়ী তাঁর উদ্দেশ্য লোকদের বুঝিয়ে থাকেন।

আল্লাহ তায়ালা কোনো আলেমকে এমন স্বতন্ত্র ইলম ও বিদ্যা-বুদ্ধি দান করেন যা অপরের জানা নাই। পক্ষান্তরে কোনো ব্যাপারে উক্ত দ্বিতীয় আলেমের যে ইলম রয়েছে প্রথম আলেমের সে বিষয়ে জ্ঞান না থাকা বিচিত্র নয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণীঃ

www.pathagar.com

وداؤد وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه
غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان و
كلا آتينا حكما وعلما -الآية

"আর দাউদ ও সুলাইমানের বিষয় আলোচনা কর, তাঁরা যখন কোনো কৃষিক্ষেত্র সম্বন্ধে বিচার করছিল; উহাতে যখন কতিপয় লোকের দাগ-পাল রাতের বেলা ঢুকেছিল আর আমি সে মীমাংসা- যা তাদের সম্পর্কে হচ্ছিল লক্ষ্য করছিলাম। অতপরআমি সে মীমাংসার জ্ঞান সুলাইমানকে দিয়েছিলাম এবং উভয়কে আমি হিকমত ও জ্ঞান দান করেছিলাম....।"

(সূরা আম্বিয়া, ৭৮-৭৯ আয়াত)

লক্ষ্যণীয়। দাউদ ও সুলাইমান উভয়ই উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন নবী ছিলেন উভয়ই একটি বিচারের রায় প্রকাশ করলেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাদের একজনকে [হযরত সুলাইমান (আঃ)] এই বিচারের ফয়সালা করার বিশেষ জ্ঞান ও বুদ্ধি দান করেছেন। আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিস। তাঁদের ইজতিহাদ ও অনুসৃত হুকুমগুলিরও একই অবস্থা। যেমন, অন্ধকারে কাবার দিক্ নির্ণয় করতে গিয়ে চারজন লোক চারদিক হয়ে এই বিশ্বাসে নামায পড়লো যে, এটাই সঠিক দিক্-তাহলে সকলের নামাযই সহীহ হবে যদিও শুধুমাত্র একজন লোকের নামায প্রকৃতপক্ষে কেবলামুখী হয়ে সম্পন্ন হয়েছে। আর এই লোকটির ইজতিহাদ সহীহ হওয়ার কারণে তিনি দ্বিগুণ সওয়াব পাবেন। বাদবাকী তিন জনের দিক নির্ণয় ভুল হওয়া সত্ত্বেও একগুণ সওয়াব থেকে মাহরুম হবেন না। যথা সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে-

اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران وان اجتهد فاخطأ
فله اجر-

"ইজতিহাদের মাধ্যমে বিচারক সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছে গেলে তিনি দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী হবেন। কিন্তু ইজতিহাদে ভুল করা অবস্থায়ও তিনি একগুণ সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবেন না।"

(ফতওয়ায়ে শায়খুল ইসলাম খঃ ২, পৃঃ ২০১-২০২ বরাতঃ
তারিখে দাওয়াত ও আযীমত খঃ ২, পৃঃ ৩৫১-৩৫৩)

শায়খুল ইসলাম (র) অপর এক ভাষ্যে বলেনঃ মুসলমান নিজকে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর অনুগত, বাধ্যগত ও বিনয়াবনত মনে করাতেই তার

www.pathagar.com

আসল মর্যাদা। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যা কিছু প্রমাণ হবে তা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকাও একজন খাঁটী মুসলমানের বৈশিষ্ট্য। তিনি লিখেছেনঃ

মানুষ সাধারণত আপন মা-বাপ, অভিভাবক কিংবা শহরবাসীদের দ্বীনের অনুসারী হয়ে থাকে এবং তাদের রীতি অনুসারে লালিত হয়ে বেড়ে উঠে। যেমন, শিশু ধর্মের ব্যাপারে স্বীয় বাপ-মা, অভিভাবক এবং দেশবাসীকে অনুসরণ করে থাকে। কিন্তু পরিণত বয়সে পৌছলে সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করা কর্তব্য। এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত নয় যাদের সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণাঃ

إِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا
أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا - (البقرة:١٧٠)

"যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহর নাযিলকৃত হুকুমের আনুগত্য কর; তখন তারা বলে-না, আমরা তো বাপ-দাদার পথই অনুসরণ করে যাবো।"
(সূরা বাকারা, ১৭০ আয়াত)

অতএব, যারা আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য করার পরিবর্তে বাপ-দাদারা অভ্যাস এবং স্বীয় সম্প্রদায় ও জাতির রুসম-রেওয়াজের অনুসরণ করবে তারা আল্লাহর ঘোষিত শাস্তির যোগ্য জাহেল হিসেবে গণ্য হবে। এভাবে যার কাছে কোনো বিষয়ের সঠিক পথ এবং শরঈ হুকুম স্বচ্ছ হয়ে যাওয়ার পরও- যে বিষয়ের জন্যে আল্লাহ্ তায়ালা নবী প্রেরণ করেছেন-তা গ্রহণীয় না হয়ে বরং স্বীয় অভ্যাস প্রাধান্য পায় তাহলে সে তিরস্কারের যোগ্য ও শাস্তির উপযোগী বিবেচিত হবে।" (ফতওয়ায়ে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া খঃ ২, পৃঃ ২০২ বরাত-দাওয়াত ও আযীমত খঃ ২, পৃঃ ৩৫৩)

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার (র) ফত্ওয়ায় সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, মুজতাহিদ ইমামগণের যেসব ইজতিহাদ ও কিয়াসপূর্ণ মাসআলার সিদ্ধান্ত সমূহের বিপরীত কুরআন হাদীসের ভাষ্য বর্তমান নাই কিংবা যে শরীয়তের বরখেলাফ তাও জানা নাই, এমতাবস্থায় এসব বিষয়ে মুজতাহিদগণের তাকলীদ ও অনুসরণ করা একটি সহজাত চাহিদা। বাস্তব আমলের ক্ষেত্রে উম্মতের জন্য যার কোন বিকল্প নাই। পক্ষান্তরে যেসব ইজতিহাদ এবং কিয়াসী মাসআলা আল্লাহ ও রসূলের আহকাম মুতাবিক নয়

www.pathagar.com

বরং মুখালেফ যে সব বিষয়ে মুজতাহিদদের তাকলীদ ও আনুগত্য করা আদৌ জায়েয নয়।

দলীল প্রমাণ উদ্ভাবনে সক্ষম আলেমদের কর্তব্য

যারা কেবলমাত্র আলেমই নন বরং শরঈ আহকাম এবং মুজতাহিদগণের ইজতিহাদী মাসআলায় গবেষণা করতে সক্ষম এবং দলীল উদ্ভাবনে সামর্থবান তাদের সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (র) আলেমদের তিনটি মত সুবিস্তরে ব্যক্ত করেছেন। এক, অন্য কারো তাকলীদ করা তাদের জন্যে হারাম এবং গবেষণা করা ওয়াজিব ও জরুরী। দুই, তাকলীদ ও গবেষণা উভয়ই জায়েয। তিন, গবেষণা করার সুযোগ থাকলে তত্ত্বানুসন্ধান করা ওয়াজিব, তাকলীদ করা হারাম। আর যদি গবেষণা করার অবকাশ না থাকে তাহলে প্রয়োজনবোধে তাকলীদ করা যেতে পারে। তৃতীয় মতটিকে শায়খুল ইসলাম (র) যথার্থ অভিমত রূপে মন্তব্য করেছেন। সুতরাং তিনি বলেনঃ

اما القادر على الاستدلال فقيل يحرم عليه التقليد
مطلقاً وقيل يجوز مطلقاً وقيل يجوز عند الحاجة كما
اذا ضاق الوقت عن الاستدلال وهذا القول اعدل
(فتاوى ابن تيمية ج ٢ ص ٣٨٤)

"যিনি দলীল উদ্ভাবনে সক্ষম কেউ বলেছেন তাঁর জন্য নিশর্ত তাকলীদ করা হারাম আবার কারো মতে শর্তহীন জায়েয। কারো মতে কেবলমাত্র প্রয়োজনের সময় জায়েয। যেমন, চিন্তা গবেষণা করে মাসয়ালা উদ্ভাবন করার সময় সুযোগ না পাওয়া। এ অভিমতটিই সর্বাপেক্ষা বিবেক সম্মত ও যথার্থ। (ফত্ওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া, খঃ ২, পৃঃ ৩৮৪)

কামেল মুজতাহিদের কর্তব্য

বস্তুত প্রাজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞান সমৃদ্ধ একজন মুজতাহিদ সম্পর্কে শায়খুল ইসলামের (র) সিদ্ধান্ত হলো–যদি তিনি কোথাও কুরআন হাদীসের এমন প্রমাণ পেয়ে যান যার মুকাবিলায় করতে অন্য কিছু সক্ষম নয়, তাহলে সে নস' তথা প্রমাণের অনুসরণ করা তার জন্য অপরিহার্য। তিনি লিখেনঃ

اما اذا قدر على الاجتهاد التام الذى يعتقد معه
ان القول الآخر ليس معه ما يدفع به النص فهذا

www.pathagar.com

يجب عليه اتباع النصوص وان لم يفعل كان متبعا
للظن وما تهوى الانفس وكان من اكبر العصاة لله
ولرسوله - اھ

"অবশ্য তিনি যদি পরিপূর্ণ ইজতিহাদ পারদর্শী হন এবং প্রত্যয় রাখেন যে, অমুক মাসআলার সমর্থনে এমন কোনো প্রমাণ নেই যা কুরআন হাদীসের মুকাবিলা করতে পারে তাহলে এমতাবস্থায় তাঁর জন্য এই মুতাবিক আমল করা অপরিহার্য। অন্যথায় তিনি প্রবৃত্তির গোলাম এবং আল্লাহ্ ও রসূলের নাফরমানরূপে চিহ্নিত হবেন।" (কারণ আল্লাহ ও রসূলের মুকাবিলায় প্রবৃত্তির আজ্ঞাবহ হয়ে নিজের কিংবা অপর কারো এমন ইজতিহাদের অনুসরণ করেছেন যা তার জন্যে জায়েয ছিল না)।

(ফত্ওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়া খঃ ২, পৃঃ ৩৮৫
সূত্র-দাওয়াত, খঃ ২, পৃঃ ৩৫৫)

আলোচনার শেষ কথা

গোটা মুসলিম জাতির বরেণ্য আলেমগণ এবং প্রথম যুগের প্রজ্ঞাবান মনীষীবৃন্দের এ ধরনের সুস্পষ্ট বিশদ বিবরণের আলোকে একজন সত্যাশ্রয়ী ও নিষ্ঠাবান লোকের দৃষ্টি পথে এ সত্য দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত হয় যে, তাকলীদ ও মযহাবের পরিবর্তন সম্পর্কীত মওলানা মাওদূদী (র) রচনাবলীতে লিখিত ও গৃহীত নীতি ভারসাম্য মূলক ও যথোপযোগী। আজকের তাকলীদ পূজারী আলেমগণের দৃষ্টিতে তাঁর অনুসৃত নীতি ভুল এবং বক্র হলেও এটাই প্রকৃতপক্ষে কুরআন হাদীস সম্মত পন্থা। আজ থেকে বহু শতাব্দী পূর্বে চার ইমামের মযহাব সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত এবং ইযফেযুল আয় নামে খ্যাত শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) এই নীতিকেই যথার্থ ও ভারসাম্যমূলক আখ্যায়িত করেছেন। والله يقول الحق وهو يهدى السبيل (আল্লাহই সত্যভাষী এবং তিনিই পথ প্রদর্শক)

নোটঃ তাকলীদ ও মযহাব পরিবর্তন সম্পর্কে পূর্বের আলোচনায় যেসব আলেম ও ফিকাহবিদগণের বরাত পেশ করা হয়েছে তাঁদের সকলেই চার মযহাবের কোনো না কোনো একটির মযহাবের সাথে তাকলীদের দিক থেকে জড়িত। সাইরে মুকাল্লিদ আলেমের একটি কথা বা বরাতও এতে পেশ করা হয়নি।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

রমযান মাসে সাহ্‌রীর সময় প্রসংগ

ঠিক প্রভাতে রোযাদারের জন্য পানাহার করা জায়েয কি না–জায়েয এ প্রসংগটি বিতর্কিত মাসআলার তালিকার অন্যতম। অন্যভাষায়, রমযানে সাহ্‌রীর সময় কতক্ষণ পর্যন্ত থাকে? এ সম্পর্কে মাওলানা মওদূদীর (র) মত হলো "একজন রোযাদার ঠিক প্রভাতে ঘুম থেকে চেতনা পেয়ে জলদি উঠে যদি কিছু পানাহার করে নেয় তাহলে এটা তার জন্যে সম্পূর্ণ জায়েয।" তিনি কুরআনের নিম্ন আয়াতের তাফসীরে তাফহীমুল কুরআনের (উর্দূ) প্রথম খন্ডের ১৪৬ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আয়াতটি হলো-

كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

(আর খাও, পান কর যে পর্যন্ত না তোমাদের নিকট (রাতের) কালরেখা হতে সুবহে সাদিকের সাদা রেখা পৃথক হয়ে যায়।)

সাহ্‌রী ও ইফতারের সময়সীমা সম্পর্কে তিনি লিখেনঃ

"আজকাল লোকেরা সাহ্‌রী ও ইফতার উভয় ব্যাপারেই অতি সাবধানতার অযুহাতে কিছুটা বাড়াবাড়ি করে চলছে। অথচ শরীয়ত এই উভয় কাজের জন্য এমন কোনো সময় সীমা নির্ধারণ করে দেয়নি যা থেকে কয়েক মিনিট অথবা সেকেন্ড এদিক-সেদিক হয়ে গেলে রোযাদারের রোযা নষ্ট হয়ে যায়।"

রাতের কালরেখা ভেদ করে প্রভাতের সাদা রেখা প্রকাশ পাওয়ার অন্তরালে বিশেষ অবকাশ রয়েছে। এ পর্যায়ে সুবহি সাদিকের সময় কারো চোখ খুলে যাওয়ামাত্র বিছানা থেকে শীঘ্র উঠে তাড়াতাড়ি কিছু পানাহার করে নেয়া তার জন্য সম্পূর্ণ জায়েয।

হাদীসে আছে–রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ "সাহ্‌রী খাওয়ার সময় তোমাদের কারো কানে আযানের আওয়াজ আসলে তৎক্ষণাৎ খানাপিনা ত্যাগ না করে নিজের প্রয়োজন মুতাবিক খেয়ে পান করে নিবে।" এভাবে ইফতারের সময় সূর্যাস্তের পর দিনের আলো নিভে যাওয়া পর্যন্ত

www.pathagar.com

অথবা অপেক্ষা করা কোনো জরুরী বিষয় নয়। সূর্য ডুবামাত্র নবী আলাইহিস্ সালাম বিলালকে (রাঃ) আওয়াজ দিতেনঃ "শরবত নিয়ে আস। বিলাল (রাঃ) আরয করতেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এখনো তো দিনের আলো উজ্জ্বল দেখা যায়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেনঃ পূর্বাকাশে রাতের আঁধার ঘনিয়ে আসতেই রোযার সময় শেষ হয়ে যায়।"

পর্যালোচনা

মাওলানার (র) এই বাক্যাংশের পর্যালোচনা করলে দু'টি অংশ আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে এই দু'টি অংশ দু'টি সতন্ত্র ও শরঈ মাসআলার মর্যাদা লাভ করে।

প্রথম অংশ

প্রথম অংশ হলো–পূর্বাকাশের দিকচক্রাবাল থেকে অন্ধকারের আভা প্রকাশ পাওয়াসহ সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ইফতারের সময়ের সূচনা হয়। এই কালো রেখা পূর্বাকাশে দেখা দেয়ার সাথেই রোযার সময়ের ইতি ঘটে আর ইফতারের সূচনা হয়।"

দ্বিতীয় অংশ

"দ্বিতীয় অংশ সাহরীর সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। এর তাৎপর্য হলো কেবলমাত্র রাতই সাহরী খাওয়ার সময় নয় বরং প্রভাত সময়ও সাহরীর গ্রহনের সময় বিশেষ। ঠিক প্রভাত সময়ে যদি কারো ঘুম ভাংগে তাহলে তাড়াতাড়ি উঠে কিছু খেয়ে নেয়া তার জন্য জায়েয।"

প্রথম অংশ অর্থাৎ সূর্যাস্তের সাথে সাথে রোযার সময় শেষ হওয়া এবং ইফতারের সময় শুরু হওয়ার ব্যাপারে আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের গোটা আলেম সমাজ একমত। এ ব্যাপারে কারো মত পার্থক্যের উল্লেখ নেই। একথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। ফকীহদের ভাষাও অনুরূপ। ফিকাহের বড় বড় কিতাবগুলি খুলে দেখুন, আপনি এই মাসআলাটি অনায়াসে পেয়ে যাবেন। তবুও সান্ত্বনার জন্য আল্লামা ইবনে আবেদীন শামীর একটি উধৃতি পেশ করছি–

والمراد بالغروب زمان غيبوبة جرم الشمس بحيث تظهر

الظلمة حسا في جهة المشرق-قال عليه السلام اذا

www.pathagar.com

اقبل الليل من هٰهنا فقد افطر الصائم اى اذا وجدت
الظلمة حسا فى جهة المشرق فقد ظهر وقت الفطر

(شامى ج۲ ص۱۱۰)

"অস্তগমনের অর্থ সূর্য ডুবে গিয়ে পূর্বাকাশে কালো ছায়া প্রকাশ পাওয়ার সময়। নবী আলাইহিস্ সালাম বলেছেনঃ পূর্বাকাশে রাতের আধার দেখা দিতেই রোযাদার ইফতার করতে পারে। অর্থাৎ পূর্ব দিগন্তে কালো রেখা অনুভূত হতেই ইফতারের সময় শুরু হয়ে যায়।"

(শামী, ২য় খন্ড, ১১০ পৃষ্ঠা)

সাহরীর সময় কতক্ষণ পর্যন্ত থাকে সেটাই আলোচনার দ্বিতীয় অংশ। প্রভাতে উষার আলো স্পষ্টভাবে না ছড়ালে রোযাদার খেতে পারবে কি পারবে না? এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সাহাবী যুগ থেকে পরবর্তীযুগের ফকীহ পর্যন্ত বিষয়টি বিতর্কিত ছিল এবং আজও শরীয়তের গ্রন্থরাজিতে বিতর্কিত আকারেই লিখিত রয়েছে। আলেমদের একটি অংশ সব সময় এ কথার সমর্থক যে, "প্রভাত সময়ে রোযাদারের জন্য পানাহার করা জায়েয, এতে রোযার কোনো ক্ষতি হয় না।" বিপরীতে, অন্য অংশের রায় হলো–"রাতের কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত পানাহার করা জায়েয। পূর্বাকাশে প্রভাতের শুভ্র রেখা উদয় হতেই সময় শেষ হয়ে যায়। তারপর রোযাদারের জন্য পানাহার করার অনুমতি নেই।"

সংখ্যা গরিষ্ঠতা এবং সংখ্যা লঘিষ্ঠতা

সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈন যুগের অধিকাংশ আলেমের মতে ঠিক প্রভাত সময়ে রোযাদারের জন্য পানাহার করা না–জায়েয। আর জায়েয হওয়ার স্বপক্ষ আলেমগণের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু পরবর্তীযুগের ফকীহদের আমলে প্রসংগটি সম্পূর্ণ উল্টে যায়। ঠিক উষাকালে ভোরের আলো খুব ফর্সা না হওয়া অবধি খানাপিনা করা জায়েয হওয়ার স্বপক্ষ আলেমদের সংখ্যাই বেশী হয়ে যায়, আর না–জায়েয হওয়ার সমর্থকদের সংখ্যা কমে আসে। এ প্রসঙ্গে আলমগীরীর 'যাযানাতুল্ ফত্ওয়াতে' উল্লেখ আছে ঃ واليه مال اكثر العلماء

(অধিকাংশ আলেমগণের এই দিকে ঝুকে পড়েন। অর্থাৎ, এমতকেই সমর্থন দেন।) অবশ্য সংখ্যা গরিষ্ঠতা এখানে প্রকৃত অর্থে নেয়া হলে সাহাবীদের যুগ

www.pathagar.com

থেকে পরবর্তীকালের ফকীহদের যুগ পর্যন্ত মতবিরোধের প্রকৃতি একই ধরনের লক্ষ্য করা যায়।

অভিযোগ

উপরোক্ত দু'টি অংশের দ্বিতীয় অংশ নিয়ে কোনো কোনো ইলমী মহল থেকে যে অভিযোগ উঠেছে তাহলো-"ঠিক ফজরের সময় একজন রোযাদারকে পানাহার করা অনুমতি দেয়া কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট খেলাফ। কারণ, কুরআনে দিনের বেলায় রোযা রাখার নির্দেশ এসেছে। আর দিন সুবহে সাদিক থেকে শুরু হয়ে সূর্য ডুবার মধ্য দিয়ে শেষ হয়। সুতরাং সুবহে সাদিকের পর খাওয়া–দাওয়া করা কুরআনের আলোকে ঠিক নয়। অতএব, "ঠিক ফজরের সময় পানাহার করা জায়েয হওয়ার যে কথা মাওলানা মওদূদী (র) বলেছেন তা কুরআনের সুস্পষ্ট খেলাফ, এমনকি সুনির্দিষ্ট হুকুমের এক ধরণের বিকৃতি যা কোনোক্রমেই জায়েয নয় বরং মহা বিপদ সংকেতের বার্তাবাহক।"

(মওদূদী আকায়েদ পর তানকিদীনযর পৃঃ ১১০, ১১২)

অভিযোগটি প্রাণবন্ত ও যথার্থ কি?

যারা সাধারণ শ্রেণীর লোকদের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং এই মাসআলাটির তত্ত্ব সম্পর্কে ভালোরূপে অবগত নয় তাদের দৃষ্টিতে অভিযোগটি খুবই যথার্থ এবং প্রাণবন্ত মনে হবে। কিন্তু যারা মাসআলা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত এবং মন মস্তিষ্ক গোঁড়ামির বীজানু মুক্ত তাদের জানা কথা যে, এ ধরনের অভিযোগের ভিত্তি হলো নিছক একগুয়েমী ও একদেশদর্শিতা কিংবা মাসআলা সম্পর্কে সম্যক অজ্ঞতা। অন্যথায় অভিযোগকারী মহোদয়গণ যদি মাসআলার তত্ত্ব সম্পর্কে ভালোভাবে জ্ঞাত থাকতেন এবং গোঁড়ামি ও একগুয়েমীতে মন-মগজ প্রচ্ছন্ন না থাকতো তাহলে তারা মাওলানা মওদূদীর (র) রায়ের সাথে দ্বিমত প্রকাশ করতেন বটে, কিন্তু তাঁর রায়কে গোমরাহীর তালিকায় গণ্য করতেন না এবং কুরআনের খেলাফ অথবা বিকৃতি বলারও ধৃষ্ঠতা দেখাতেন না। কারণ, মাসআলাটি সাহাবীগণের যুগ থেকে পরবর্তী সময়ের ফকীহগণ পর্যন্ত বিতর্কিতরূপে চলে আসছে। এবং প্রত্যেক যুগের আলেমগণ মাওলানা মওদূদীর (র) আজকের পেশকৃত রায়ের অনুরূপ রায় ব্যক্ত করেছেন। ভাবাবেগ ও উচ্ছাসের বশবর্তী হয়ে মাওলানা মওদূদীর (র) রায়কে গোমরাহ কিংবা

www.pathagar.com

কুরআনের বিকৃতি মনে করা হলে সাহাবী যুগ থেকে আজকের দিনের সমস্ত আলেম যারা মাওলানা মওদূদীর (র) মতো ঠিক ফজরের সময় পানাহার করাকে জায়েয মনে করেন তারাও গোমরাহ কিংবা বিকৃতকারীরূপে চিহ্নিত হতে বাধ্য। এমতাবস্থায় আমরা হেদায়াত পাবো কোত্থেকে? মনে রাখতে হবে! এ ধরনের ফতওয়াবাজী করা ইসলামের খেদমত নয় বরং চেতনা বা অবচেতনার মিত্রতার ছদ্মাবরণে দ্বীনের সাথে এমন চরম বৈরিতা প্রদর্শন করা যা প্রথম যুগে অপূরণীয় ক্ষতি করেছে এবং আজকের দিনেও এই ফতওয়ার বেসাতি দ্বীনের অবর্ণনীয় ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হতে পারে।

মাসআলার শরঈ মর্যাদা

অভিযোগের জবাব দানের আগে সাহাবীগণের আছার এবং ফকীহদের মন্তব্যের আলোকে মাসআলাটির শরঈ মর্যাদার এবং প্রকৃত তত্ত্ব জানা জরুরী মনে করছি। তাতে একদিকে আগেকার ও পরবর্তী সময়ের আলেমগণের দৃষ্টিতে মাসআলাটি যে বিতর্কিত তা সুস্পষ্টভাবে জানা যাবে। অপরদিকে জানা যাবে যে, এ ব্যাপারে মাওলানা মওদূদীর (র) পেশকৃত রায়ে তিনি একাকী নন বরং প্রত্যেক যুগের আলেম ও ফকীহগণের একটি নির্ভরযোগ্য অংশ মাওলানার সাথে একমত পোষণ করে আসছেন। মাসআলাটি পূর্ব থেকেই আজ অবধি বিতর্কিতরূপে প্রচলিত। একদল ঠিক ফজরের সময় সাবধানতা হেতু পানাহারকে নিষিদ্ধ মনে করেছেন। অন্যদল الدين يسر দ্বীন সহজ হওয়ার দৃষ্টিভংগীতে ঐ সময় পানাহারকে জায়েয বলেছেন। নিম্নে শায়খুল ইসলাম হাফিয ইবনে হজরসহ অন্যান্য ফকীহ ও আলেমদের ভাষ্য উল্লেখ করা হচ্ছে। ইবনে হজর লিখেছেনঃ

وذهب جماعة من الصحابة وقال به الاعمش من التابعين
وصاحبه ابو بكر بن عياش الى جواز السحور الى ان يتضح
الفجر۔

সাহাবীগণের একজামায়াত এবং তাবেঈর মধ্য থেকে আমাশ এবং তার মাগরিদ আবূ বকর বিন (র) রায় হলো–ভোরের আলো ভালো করে উদিত না হওয়া অবধি রোযাদার পানাহার করতে পারবে।

فروى سعيد بن منصور عن ابى الاحوص عن عاصم عن
زر عن حذيفة قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه

www.pathagar.com

وسلم هو والله النهار غير ان الشمس لم تطلع واخرجه
الطحاوي من وجه آخر عن عاصم نحوه -

"সাঈদ বিন মানসূর নিজের সনদসহ হযরত হোযাইফা (র) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, আল্লাহ্র কসম! আমরা দিনের বেলায়ই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাহ্রী খেয়েছি। তবে সে সময় তখনো সূর্যোদয় হয়নি। ইমাম তাহাভীও (র) অপর এক সূত্রে আসেম থেকে অনুরূপ রেওয়ায়েত করেছেন।"

وروى ابن ابي شيبة وعبد الرزاق ذالك عن حذيفه
من طريق صحيحة -

"ইবনে আবূ শাইবা এবং আবদুর রাজ্জাক এই হাদীসটি হযরত হোযাইফা (র) থেকে এক সহীহসূত্রে রেওয়য়েত করেছেন।"

وروى سعيد بن منصور وابن ابي شيبه وابن المنذر
من طرق صحيحة عن ابي بكر انه امر بغلق الباب حتى لا
يرى الفجر -

"সাঈদ বিন মানসুর, ইবনে আবূ শাইবা এবং ইবনে মুনসির হযরত আবূ বকর (রা) থেকে বিভিন্ন সূত্রে একথার উল্লেখ করেছেন যে, তাঁরা সকালের আলোক রশ্মি যাতে দেখতে না পায় এ কারণে দরজা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।"

وروى ابن المنذر باسناد صحيح عن علي انه صلى الصبح ثم
قال الآن حين يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود -

"ইবনে মুনসির সহীহ সনদসহ হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন- তিনি একবার ফজরের নামায পড়ে বললেনঃ রাতের আঁধার কাটিয়ে ভোরের রশ্মি প্রকাশ পাওয়ার সময় এখন হল।"

قال ابن المنذر وذهب بعضهم الى ان المراد تبين بياض
النهار من سواد الليل ان ينتشر البياض في الطرق و
السكك والبيوت ثم حكى ما تقدم عن ابي بكر وغيره -

www.pathagar.com

"ইবনে মুনসির বলেছেনঃ কতিপয় আলেমের মতে রাতের অন্ধকার দূরীভূত হয়ে দিনের আলো প্রকাশ পাওয়ার অর্থ হলো–দিনের আলো রাস্তা পথ-ঘাট, অলি-গলি এবং ঘরে ছড়িয়ে পড়া। ইবনে মুনযির একথার দলীল হিসেবে আবূ বকর (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবীর উপরোল্লেখিত রেওয়ায়েতের উল্লেখ করেছেন।"

وروى باسناد صحيح عن سالم بن عبيد الاشجعي وله صحبة ان ابا بكر قال له اخرج فانظر هل طلع الفجر قال فنظرت ثم اتيته فقلت قد ابيض وسطع ثم قال اخرج فانظر هل طلع الفجر فنظرت فقلت قد اعترض فقال الآن ابلغ شرابي -

"ইবনে মুনযির সহীহ্ সনদসহ সালেম বিন উবাইদ আশজাঈ সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) একবার তাকে বের হয়ে সোবহে সাদিক উদিত হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য বললেন। আমি বের হয়ে দেখে ফিরে এসে বললাম–ভোরের আলো প্রখর হতে শুরু করেছে। তারপর আবার বললেনঃ প্রভাত হয়েছে কিনা দেখে এসো। বের হয়ে ফিরে এসে বললামঃ আলো ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি বললেনঃ এবার আমার পানীয় নিয়ে এস।"

روى من طريق وكيع عن الاعمش انه قال لولا الشهرة لصليت الغداة ثم تسحرت - (فتح الباري ج ٤ ص ١١٠ فتح الملهم ج ٣ ص ١٢٠)

"আ'মাশ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন–যদি খাওয়ার স্পৃহা না হতো তাহলে ফজর পড়ে আমি খানা খেতাম।"

(ফতহুলবারী, ৪র্থ খন্ড, ১১০ পৃঃ,
ফতহুল মুলহিম, ৪র্থ খন্ড, ১২০ পৃঃ)

এসব আছারের প্রতি দৃষ্টি দিলে প্রতীয়মান হয় যে, বিষয়টি নিয়ে সাহাবীদের মধ্যেও মতবিরোধ ছিল। সাইয়্যেদুনা আবূ বকর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত হোসাইফার (রাঃ) মতে ঠিক ফজরের সময় প্রভাতের আলো ছড়িয়ে না পড়া পর্যন্ত রোযাদারের জন্য পানাহার করা জায়েয। বরং আরো অগ্রসর হয়ে বলা যায় যে, আলো ভালোভাবে ছড়িয়ে পড়ার পরও পানাহার করা যায়। যেমন, আগের কয়েকটি রেওয়ায়েতে স্ববিস্তারে উল্লেখ

www.pathagar.com

করা হয়েছে। এভাবে তাবেঈনদের মধ্যে আমাশ এবং তাঁর শাগরিদ আবূ বকর বিন আইয়্যাশও এমত পোষণ করতেন। অতএব সাহাবা ও তাবেঈগণের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে মতপার্থক্য ছিল। বিতর্কিত বিষয়ে পক্ষ ও বিপক্ষ উভয়ের যেকোনো পক্ষ অবলম্বন করা বৈধ এবং দলীলের ভিত্তিতে একটির ওপর অপরটিকে প্রাধান্য দেয়াও জায়েয। উভয়পক্ষে সাহবা ও তাবেয়ী থাকা সত্ত্বেও কোনো এক পক্ষের কথাকে গোমরাহ কিংবা কুরআনের বিকৃতি বলা কোনোক্রমেই জায়েয হতে পারে না। এ ধরনের দলীয় গোড়ামির মোহাচ্ছনতায় গ্রহণ করা যেতে পারে; তবে সেটাকে শরীয়তের দৃষ্টিতে কিছুতেই বৈধ স্বীকার করা যায় না। ঠিক প্রভাত সময়ে পানাহার করা যারা তাদের সম্পর্কে ইমাম ইসহাকের মত কি? তাদেরকে ভৎসনা করা জায়েয কি জায়েয নেই? এতে রোযা নষ্ট হবে কি হবে না? এসব প্রশ্নের উত্তরে ইমাম ইসহাক যা বলেছেন তা ইবনে হাজরের (র) ভাষায় লক্ষণীয়ঃ

قال اسحق هؤلاء رأوا جواز الاكل بعد طلوع الفجر المعترض
حتى يتبين بياض النهار من سواد الليل - قال اسحق وبالقول
الاول اقول ولكن لا اطعن على من تأول الرخصة كالقول
الثاني ولا ارى عليه قضاء ولا كفارة - اه (فتح الباري ج٤ ص١١١)

"ইমাম ইসহাক বলেছেনঃ এসব লোক প্রভাতের আলো উজ্জ্বল হওয়া পর্যন্ত পানাহার করাকে জায়েয মনে করেন। আমি নিজে প্রথম কথার সাথে একমত পোষণ করলেও যারা ভিন্ন মত পোষণ করে 'রুখসত' বা সুযোগ সুবিধানুযায়ী আমল করেন তাদের নিন্দা করছি না। তাদের কাযা ও কাফ্ফারা কিছু করার রায়ও দিতে পারছি না।"

বিতর্কিত বিষয়ে রায় প্রকাশের এটাই পদ্ধতি এবং আগের যুগের আলেমদের এই ছিল কর্মধারা। লক্ষ্যণীয় যে, ঠিক প্রভাত বেলায় পানাহার করা জায়েয বলার সমর্থকদেরকে ইমাম ইসহাক গোমরাহ কিংবা বিকৃতকারীরূপে আখ্যায়িত করার পরিবর্তে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেনঃ "এই মাসআলায় আমি যদিও তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করি তথাপি তাদেরকে আমি তিরস্কার করতে পারি না এবং তাদের রোযা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফত্ওয়া দিতে পারি না। এজন্যে তাদের ওপর কাযা বা কাফ্ফারাও ওয়াজিব নয়।" ইমাম ইসহাকের এই রায় প্রদানের একমাত্র কারণ হলো–দলীলের আলোকে এই

www.pathagar.com

মত পোষণকারীদেরকে বাতিল বলা সম্ভব নয়। পরন্তু বিষয়টি নিয়ে সাহাবীদের মধ্যেও মতানৈক্য রয়েছে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত হোজাইফা (রাঃ) এমতের সমর্থক ছিলেন। যদি এমতকে বাতিল কিংবা গোমরাহ্ বলা হয় তাহলে এ সমস্ত সম্মানিত সাহাবীগণ এই ফত্ওয়ার শিকার হয়ে গোমরাহ হওয়া প্রমাণিত হবে যা কিছুতেই স্বীকৃত হতে পারে না। অথচ আজকের মযহাবী নেতৃবৃন্দ খুঁটিনাটি ধরনের বিতর্কিত বিষয়ে মতপার্থক্য পোষণকারীকে গোমরাহ বা বিকৃতকারী বলে উপহাস করে সে যার অনুকূলে শরীয়ত সম্মত আচরণই করে যাচ্ছেন কোন প্রমাণ নাই। বস্তুত বিষয়টি সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেঈদের মধ্যেও যে মতপার্থক্য ছিল একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। মোটকথা সূচনালগ্ন থেকে বিতর্ক থাকায় এ মাসআলার পক্ষ বিপক্ষ কাউকেই গোমরাহ্ বলা যেতে পারে না।

ঐক্যমতের (ইজমা) দাবী

এ মাসআলা প্রসংগে কোনো কোনো আলেমের দাবী–ঠিক উষালগ্নে রোযাদারের জন্য পানাহার করা সর্বসম্মতিক্রমে না–জায়েয। সাহাবী যুগে প্রসংগটি বিতর্কিত থাকলেও পরবর্তী সময়ে না–জায়েয হওয়ার ব্যাপারে ইজমা হয়ে যায়। কিন্তু তত্ত্ব জ্ঞানী আলেমগণ ইজমা হওয়ার দাবীকে মেনে নিতে পারেননি। কারণ, মাসআলাটির বিতর্ক কেবলমাত্র সাহাবীদের আছার এবং তাবেঈদের কথায়ই উল্লেখ করা হয়নি বরং পরবর্তী সময়ের ফকীহদের যুগেও মতপার্থক্য করা হয়েছে এবং তাদের রচনাবলীতে বিষয়টি বিতর্কিত আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং একথা স্বীকার করা কষ্টকর যে, অতীতের কোনো সময়ে মাসআলার একটি দিকের ওপর ইজমা হয়ে গেছে। হাফিজ ইবনে হাজর (র) উপরে বর্ণিত আসার ও উক্তির আলোকে এদাবী খণ্ডন করেছেন। সুতরাং তাঁর ভাষায়ঃ

قلت وفي هذا تعقب على الموفق وغيره حيث نقلوا
الاجماع على خلاف ما ذهب اليه الاعمش۔ والله اعلم

(فتح الباری ج ۴ ص ۱۱۰)

"আমি বলি, উপরোল্লেখিত আছার ও তাবেঈগণের ভাষ্যে সেসব আলেমদের অভিমত খন্ডন করা হয়েছে যারা আমা'শের মতের খেলাফ ইজমা হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।" (ফতহুলবারী, ৪র্থ খন্ড, ১১০ পৃঃ)

এতক্ষণ পর্যন্ত এই মাসআলা সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেঈ যুগের আলেমদের মতপার্থক্য এবং কোনো একটি দিকের ওপর ইজমা না হওয়ার কথা আলোচনা করা হয়েছে। এবার মাসআলাটি সম্পর্কে ইসলামী জগতের ফকীহ সমাজ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তার আলোকে বিষয়টির তত্ত্ব তুলে ধরতে চাই যাতে করে প্রসংগটি স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন হয়ে সামনে ভেসে উঠে এবং সব ধরনের দ্বিধা–দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। নিম্নে তারই কয়েকটি নমুনা পেশ করা হল।

হানাফীদের দৃষ্টিভঙ্গি

এ ব্যাপারে হানাফীদের দৃষ্টিভংগী নিম্নরূপঃ

ووقته من حين يطلع الفجر الثاني وهو المستطير المنتشر
في الافق الى غروب الشمس وقد اختلف في ان العبرة
لاول طلوع الفجر الثاني او لاستطارته وانتشاره فيه
اختلاف قال شمس الائمة الحلواني القول الاول احوط
والثاني اوسع هكذا في المحيط واليه مال اكثر العلماء كذا
في خزانة الفتاوى اه (فتاوى هنديه ج ا ص ٢٠٦)

"রোযার সময় হলো সবহেসাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। তবে রোযার সূচনালগ্ন কখন থেকে আরম্ভ হয় তা নিয়ে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সূচনালগ্ন কি উষালগ্ন উদিত হওয়া অথবা প্রভাতের আলোকরশ্মি ছড়িয়ে পড়ার পর? শামসুল আইয়িম্মা হুলওয়ানী (র) বলেন, প্রথম রায়টি অধিক সতর্ক আর দ্বিতীয় রায়টিতে সাধারণ লোকদের জন্যে অবকাশ রাখা হয়েছে। 'মুহীত' নামীয় গ্রন্থে বিষয়টাকে এভাবেই ব্যক্ত করা হয়েছে। 'যাযানাতুল ফত্ওয়া' গ্রন্থে আছে, অধিকাংশ আলেম দ্বিতীয় মতের সমর্থক।" (ফত্ওয়া আলমগীরী, ১ম খন্ড, ২০৬ পৃঃ)

www.pathagar.com

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামীর ব্যাখ্যা

দূরে মুখতারের ২য় খন্ডের ১১০ পৃষ্ঠায় রোযার শরঈ ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছেঃ

هو إمساك عن المفطرات في وقته وهو اليوم اه

"রোযা ভংগকারী বস্তু পানাহার থেকে দিনে বিরত থাকার নাম রোযা।"

অতপর দিনের সংজ্ঞায় তিনি লিখেছেন–

أي اليوم الشرعي من طلوع الفجر إلى الغروب وهل
المراد أول زمان الطلوع أو انتشار الضوء؟ فيه خلاف
والأول أحوط والثاني أوسع كما قال الحلواني كما في المحيط
اه - (شامي ج ٢ ص ١١٠)

"শরঈ দিন প্রভাতে উদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়। তবে এটা বিতর্কিত যে, প্রভাত উদয়ের অর্থ উদয়ের প্রাথমিক অংশ অথবা আলোকরশ্মি ছড়িয়ে পড়ার সময়। প্রথম অর্থে সতকর্তা ও সাবধানতা রয়েছে আর দ্বিতীয় অর্থে রয়েছে সাধারণ লোকের জন্য অধিকতর অবকাশ। 'মুহীত' এর উক্তি অনুযায়ী এই হলো আল্লামা হলওয়ানীর অভিমত।"

(শামী, ২য় খন্ড, ১১০ পৃঃ)

আল্লামা শামীর (র) ভাষ্যে প্রতীয়মান হয় যে, ঠিক প্রভাত সময়ে পানাহার করার বিষয়টি বিতর্কিত। একদলের মতে প্রভাতের শুভ্ররেখা খুব ছড়িয়ে পড়া পর্যন্ত পানাহার করা জায়েয, তাতে রোযার কোনো ক্ষতি হবে না। (বরং সাধারণ লোকদের জন্য এই সময়টি অধিকতর সহজ বিধায় এমতই বিধিবদ্ধ হওয়া উত্তম)।

'ঈনায়া' গ্রন্থকারের ব্যাখ্যা

ইমাম আকমলুদ্দীন মুহাম্মদ বিন মাহমূদ হানাফী (মৃত্যুঃ ৭৮৬ হিঃ) তাঁর রচিত ঈনায়া শরহে হেদায়াহ গ্রন্থে ২য় খন্ডের ২৫৩ পৃষ্ঠায় (মিশরীয় ছাপা) রোযা সম্পর্কে লিখেছেনঃ

ووقت الصوم من حين طلوع الفجر الثاني قيل العبرة
لأول طلوعه وقيل لانتشاره واستنارته قال شمس
الأئمة الحلواني الأول أحوط والثاني أرفق - اه

www.pathagar.com

সুবহে সাদিক থেকে রোযার সূচনা হয়। কারো মতে প্রভাত উদয়ের প্রথম অংশ থেকে শুরু। আবার কারো মতে আলো ছড়িয়ে পড়া থেকে শুরু হওয়াই নির্ভরযোগ্য। শামসুল আয়িম্মার (র) মতে প্রথম অর্থে সাবধানতা আর দ্বিতীয় অর্থে অধিক সহজতা ও সুবিধার অবকাশ রয়েছে।"

(ঈনায়া, ২য় খন্ড, ২৫৩ পৃঃ)

মোল্লা আলী কারীর (র) ব্যাখ্যা

মোল্লা আলী কারী (র) শরহে নিকায়ার ১ম খন্ডের ১৬৮ পৃষ্ঠায় এ বিষয় সম্পর্কে লিখেছেনঃ

والمعتبر اول طلوع الفجر عند الجمهور وقيل استنارته
وهو مروى عن عثمان وحذيفة وطلق بن على وعطاء بن
رباح والاعمش وقال مسروق لم يكونوا يعدون الفجر
فجركم وانما كانوا يعدون الفجر الذى على البيوت - اه

"জমহুরের মতে ফজরের প্রাথমিক উদয়লগ্নই নির্ভরযোগ্য। আবার কারো মতে প্রভাত রশ্মি ভালো করে ছড়িয়ে পড়ার সময় নির্ভরযোগ্য। দ্বিতীয় মতের সমর্থনে রয়েছেন হযরত ওসমান (রাঃ), হোজাইফা (রাঃ) এবং তলক্ বিন আলী (র) প্রমুখ সাহাবীগণ। তাবেঈদের মধ্যে আতা বিন রিবাহ এবং আমাশও এমত পোষণ করেছেন। মাসরুক বলেছেন, সাহাবীগণ তোমাদের ফজরকে ফজর বলে গণ্য করতেন না। তাঁদের মতে ঘরের ছাদ প্রভাতের আলোয় উজ্জ্বল হওয়াই মূলত ফজরের সময়।"

'খুলাসাতুল ফত্ওয়া' গ্রন্থকারের ব্যাখ্যা

ফিকাহে হানাফীয়ার নির্ভরযোগ্য কিতাব 'খুলাসাতুল ফাতাওয়া গ্রন্থে বিষয়টিকে বিতর্কিতরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাজরীদের বরাত দিয়ে ফজরের সময় পানাহার করাতে রোযা নষ্ট না হওয়া এবং তাতে কাযা ওয়াজিব না হওয়ার রায়কে সহীহ বলা হয়েছে। তাজরীদে ব্যক্ত হয়েছেঃ

وفى التجريد ان اكل واكبر رأيه ان الفجر طالع عليه
قضائه والصحيح انه لا قضاء عليه - اه (خلاصة الفتاوى
ج ١ ص ٢١٤)

www.pathagar.com

"তাজরীদে' আছে, যদি কেউ তার দৃঢ় ধারনামতে ফজরের সময় সাহ্‌রী খায় তাহলে রোযা কাযা করা ওয়াজিব। তবে কাযা ওয়াজিব না হওয়ার কথাই অধিক বিশুদ্ধ।" (খুলাসাতুল ফত্ওয়া, ১ম খন্ড, ২১৪ পৃঃ)

হানাফী ফকীহদের এসব ব্যাখ্যা ঠিক ফজরের সময় পানাহার করার প্রসংগটি বিতর্কিত হিসেবে প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট। একদলের মতে ফজরের প্রাথমিক সময়ে রোযাদার পানাহার করলে তাতে তার রোযা নষ্ট হয় না এবং কাযাও ওয়াজিব হয় না। সাহাবীদের কয়েকজন এমত পোষণ করতেন। তন্মধ্যে হযরত আবূ বকর (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত হোজাইফা (রাঃ) এবং হযরত তলক বিন আলী (রাঃ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শায়খুল মাশায়েখ মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহীর (র) অভিমত

আবূ দাউদে বর্ণিত আছে ঃ

اذا سمع احدكم النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى يقضى
حاجته منه

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী বিতর্কিত মাসআলাটি সম্পর্কে মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহীর (র) উক্তি পেশ করেছেন। তাতে প্রতীয়মান হয় যে, জনগণের জন্য অধিক সহজ হওয়ার কারণে ঠিক ফজরের সময় পর্যন্ত পানাহার করা বিধিবদ্ধ হওয়ারই তিনি সমর্থক। তাঁর মতে উষালগ্ন ভালো করে ছড়িয়ে পড়া পর্যন্ত সাহ্‌রীর সময় থাকে। মাওলানা খলীল আহমদ সাহেব তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ বজলুল মাজহুদে লিখেছেন–

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه (مولانا
رشيد احمد صاحب) .... وقد ذهب به وبما يشير اليه قوله
تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود-
الى ان المراد هو التبين دون نفس انبلاج الفجر وهو
اوفق بحال العوام نظرا الى تيسير الشرع فان اكثر الخواص

ایضا عاجزون عن درک حقیقته فکیف لغیر الخواص
فانا طة الامر بنفس الانشلاج لا یخلو عن احراج وتکلیف اه
(بذل المجہود ج ۳ ص ۱۴۰).

"মরহুম মাওলানা ইয়াহ্ইয়া স্বীয় উস্তাদ মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহীর (র) এক ভাষ্য উল্লেখ করেছেন। তাতে حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود এই আয়াত এবং হাদীসের আলোকে কোনো কোনো আলেম মত পোষণ করেছেন যে, আয়াতের يتبين শব্দটির অর্থ ভোরের শুভ্র আভা ভালো করে ছড়িয়ে পড়া, শুধুমাত্র ফজরের সময় হওয়া নয়। (অর্থাৎ আলো ছড়িয়ে পড়া পর্যন্ত রোযাদার পানাহার করতে পারবে) আর এই সময়টিকেই জনগণের জন্য সহজ মনে করে শরীয়তে বিধিবদ্ধ হওয়া যথার্থ ও সংগত। কেননা, ফজরের প্রাথমিক সময় সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া অনেক সময় বিশিষ্ট লোকদের জন্যেও সম্ভব হয়ে উঠে না। বস্তুত প্রকৃত সময় সম্পর্কে অবহিত হওয়া একটি দুরূহ ব্যাপার। বিশিষ্ট লোকদের এই অবস্থা হলে সাধারণ লোকদের কি অবস্থা হবে তা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং ফজরের সময় হওয়ার সাথে সাহরী খাওয়া জায়েয নাজায়েয হওয়াকে জড়িত করা অসুবিধা এবং ক্ষতি থেকে মুক্ত নয়।"

(বজলুল মজহুদ, ৩য় খন্ড, ১৪০ পৃঃ)

উপরোক্ত বাক্যে হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (র) যেভাবে ফজরের সময় খানাপিনাকে বিতর্কিত মাসআলা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, অনুরূপভাবে শরীয়তের বিধান জনগণের জন্য সহজ হওয়ার দৃষ্টিভংগীতে ফজরের সময় খানাপিনাকে তিনি জায়েয এবং উত্তমও বলেছেন। কেননা জনগণের জন্য এতে সহজ ও সরলতা রয়েছে। আর যদি ফজরের সময় উদিত হওয়া পর্যন্ত খানাপিনা জায়েয হওয়াকে সীমাবদ্ধ করা হয় তাহলে সাধারণ লোকের জন্য কষ্ট হওয়া বিচিত্র নয় শরীয়তের দৃষ্টিতে যা লাঘবযোগ্য বিষয়। যাহা আল–কুরআনের ভাষায় বলা হয়েছেঃ ما جعل عليكم في الدين من حرج (অর্থাৎ, দীনের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের উপর কষ্টকর বোঝা চাপিয়ে দেননি।)

হানাফী ফকীহদের দৃষ্টিতে এই হলো মাসআলার প্রকৃত তত্ত্ব। এতে স্পষ্টত জানা গেল যে, বিষয়টি হানাফী ফকীহদের মতেও বিরোধপূর্ণ। আর একটি

www.pathagar.com

বিশেষ দল মাওলানা মওদূদী (র)'র অনুরূপ মতই প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ ঠিক ফজরের সময় রোযাদারের পানাহার করা জায়েয। ফতওয়ায়ে আলমগীরীতে তো একথা লেখাই রয়েছে,واليه مال اكثر العلماء যে, হানাফী মযহাবের অধিকাংশ আলেম এই মত পোষণ করতেন। 'বজলুল মাজহুদে' মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (র) সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, সাধারণ লোকদের জন্য সহজ বিধায় ফজরের সময় খানাপিনা করা জায়েয। তাতে রোযা ভংগ হবে না।

আজকের দিনের হানাফী মযহাবের প্রতিনিধি এবং দেওবন্দের উত্তরসূরীদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, যে মত পোষণ করার কারণে আপনারা মাওলানা মওদূদীকে (র) গোমরাহ, কুরআন বিকৃতকারী বরং কুরআনের অস্বীকারকারী অপবাদ দিয়ে থাকেন সে কারণ তো অনেক সাহাবী, তাবেঈ এবং হানাফী ফকীহগণও পোষণ করতেন। অধিকন্তু রশীদ আহমদ গাংগুহী (র) ফজরের সময় খাওয়া-দাওয়া জায়েয হওয়ার মতটিকে সাধারণের জন্য উত্তম বললেন; এমতাবস্থায় আপনারা উপরোক্ত মনীষীবৃন্দকে আপনাদের তথাকথিত ফত্ওয়ার আঘাত থেকে কিভাবে রক্ষা করবেন? জানিনা, এ সকল ভদ্র মহোদয়গণ তাঁদেরকে ফতওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য আবার কোন্ মযহাবী গুটি চালনা শুরু করেন।

আল্লামা ইবনে রুশ্দ মালেকীর প্রামাণ্য অভিমত

আল্লামা ইবনে রুশ্দ মালেকী (র) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ'-এ রোযাব্রত পালনকালে পানাহার থেকে বিরত থাকার যে সময়সীমা শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত হয় তার সূচনা কখন থেকে শুরু এ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেনঃ

انهم اختلفوا فى اوله فقال الجمهور هو طلوع الفجر
الثانى المستطير الابيض... وشذت فرقة فقالوا هو
الفجر الاحمر الذى يكون بعد الابيض وهو مروى عن
حذيفة وابن مسعود-

"সমকালীন আলেমগণ রোযার প্রারম্ভিক সময় নিয়ে মতবিরোধ করেছেন। জমহুরের মতে সে সময়টি হলো সুবহে সাদিক অর্থাৎ পূর্বাকাশে সাদাটে আভা ছড়িয়ে পড়া।.....গুটি কতেক আলেমের মতে সাদা রেখা মুছে

www.pathagar.com

যাওয়ার পর রক্তিম আভা উদিত থেকে রোযার সূচনা। হযরত হোজাইফা (র) এবং ইবনে মাসউদ (র) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে।"

উভয় মতের দলীল নিয়ে আলোচনা করার পর তিনি লিখেছেন–

فالذين رأوا انه الفجر الابيض المستطير وهم الجمهور
اختلفوا فى الحد المحرم الاكل فقال قوم هو طلوع الفجر
نفسه وقال قوم هو تبينه للناظر اليه ومن لم يتبينه
فالاكل مباح له حتى يتبينه وان كان قد طلع - اه

(بداية المجتهد ج ١ ص ٢٨٨-٢٨٩)

"যাদের মতে (অর্থাৎ জমহুর) রোযার সূচনা লগ্ন সুবহে সাদিক, তারা আবার সে সময়টি নির্ধারণ করার ব্যাপারে পারস্পরিকভাবে মতপার্থক্য করার কারণে সে সময়ে খানাপিনা করা হারাম সাব্যস্ত হয়। একদলের মতে ক্ষণটি হলো ঠিক প্রভাত সময়, অপর দলের মতে প্রভাতের আলো দেখার মতো হয়ে ছড়িয়ে পড়া। এবার যার কাছে প্রভাতের আলো ছড়িয়ে না পড়া মনে হবে তার জন্য সে সময় খানাপিনা করা জায়েয, যদিও সকাল আগেই হয়ে গিয়ে থাকে।"

(বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ১ম খন্ড, ৩৮৮–৩৮৯ পৃঃ)

চূড়ান্ত সীমা নির্ধারণের ব্যাপারে জমহুর আলেমদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হওয়ার কারণ আলোচনা করার পর ইবনে রুশদ (র) ইমাম মালেকের (র) রায় বর্ণনা করে লিখেছেন ঃ

والمشهور عن مالك وعليه الجمهور ان الاكل
يجوز ان يتصل بالطلوع - وقيل بل يجب الامساك قبل
الطلوع -

"ইমাম মালেকের (র) প্রসিদ্ধ অভিমত যা জমহুর কর্তৃক গৃহীত ও স্বীকৃত তা এই–ঠিক ফজর সংলগ্ন সময় খানাপিনা করা জায়েয। কারো মতে ফজরের সময় হওয়ার আগেই পানাহার থেকে অবসর নেয়া উচিত।"

ইমাম মালেকের (র) দু'টি মতের সমর্থনে আল্লামা ইবনে রুশ্দ (র) দলীল পেশ করতে গিয়ে লিখেছেন–

www.pathagar.com

والحجة للقول الاول ما فى البخارى قال النبى صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى ينادى ابن ام مكتوم فانه لاينادى حتى يطلع الفجر وهو نص فى موضع الخلاف والموافق لظاهر قوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود - ومن ذهب الى انه يجب الامساك قبل الفجر فجريا على الاحتياط وسد اللذريعة وهو اورع القولين والاول اقيس - اه

(بداية المجتهد - ج ١ ص ٢٨٩)

"প্রথম মতের (ফজরের ঠিক প্রথম সময়ে পানাহার করা জায়েয) সমর্থনে বুখারীর রেওয়ায়েত প্রনিধানযোগ্য। তাতে আছে,-হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "ইবনে উম্মে মাকতুমের আযান দেয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার করার কাজ চালিয়ে যেতে পারো। কেননা, সে ফজরের সময় হওয়ার পরই আযান দিয়ে থাকে। এই হাদীস বিতর্কিত মাসআলার জন্য দলীল বিশেষ। পরন্তু এমত كلوا واشربوا আয়াতের সাথেও পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। (কারণ আয়াত ও হাদীসে ঠিক প্রভাত সময়ে খানাপিনা করা জায়েয হওয়ার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে)। আর যাদের মতে ফজরের সময়ের আগেই খানাপিনা শেষ করা দরকার, পরে নয়, তাদের এমতে অধিক সাবধানতা, সতর্কতা, তাকওয়া ও অজুহাত বন্ধের প্রক্রিয়া রয়েছে। তবে প্রথম মতটি কিয়াসের সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল।" (বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ১ম খন্ড, ২৮৯ পৃঃ)

ইবনে রুশদের আলোচনার সার কথা

আল্লামা ইবনে রুশ্দ মালেকী (র) আলোচ্য মাসআলা সম্পর্কে যে তথ্যপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেছেন তার সারমর্ম হলো-এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী আলেমদের তিনটি মতামত পরিদৃষ্ট হয়। প্রথম মত হলো-প্রভাতের শুভ্র আভা দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ার পর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বক্ষণে রক্তিম আভা দেখা দেয়া পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে খানাপিনা করা জায়েয। সাহাবায়ে কিরামগণের মধ্যে ইবনে রুশদের মতে হযরত হোযাইফা (রঃ) ও ইবনে মাসউদ (রঃ) এবং হাফিজ

www.pathagar.com

ইবনে হজরের (র) মতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) এবং তালক বিন আলী (রাঃ) এ মতের সমর্থক।

দ্বিতীয় মতে রাতের অন্ধকার অবশিষ্ট থাকতেই খানাপিনা শেষ করা দরকার। সুবহে সাদিক হতেই খানাপিনা করার অবকাশ বাকী থাকে না। সে সময় কোনোক্রমেই পানাহার করা জায়েয হবে না যদিও সে সময়টি ফজরের ঠিক প্রারম্ভিক লগ্ন হয়। এ মতটি মালেকী মহলে সমধিক খ্যাত না হলেও মতটিতে সাবধানতা রয়েছে। তাকওয়া ও পরহেজগারী তো আছেই। তদুপরি অজুহাত বন্ধের প্রক্রিয়াও এতে নিহিত রয়েছে।

তৃতীয় মত মালেকী মহলে প্রসিদ্ধ এবং জমহুর কর্তৃকও গৃহীত। মতটি হলো– খানাপিনার ব্যাপারে এতোটা সংকীর্ণতা থাকা উচিত নয় যে, ফজরের সময় হতেই পানাহার করার আদৌ অবকাশ থাকবে না। আবার এতোটা উদারতা ও উন্মুক্ততাও নেই যে, রক্তিম আভা উদিত হওয়া পর্যন্ত কেবল খেতেই থাকবে। বরং ফজরের ঠিক প্রারম্ভিক সময় থেকে আলো ভালো করে ছড়িয়ে না পড়া পর্যন্ত খানাপিনা করা জায়েয। আলো ভালো করে ছড়িয়ে পড়ার পর আর খাওয়ার অবকাশ থাকবে না। এই শেষোক্ত মতটিকেই ইবনে রুশ্দ কুরআন–হাদীসের সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল বলে মন্তব্য করেছেন।

এসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রেক্ষাপটে আমরা বুঝতে পারছি না যে, ঠিক ফজরের সময় একজন রোযাদারের জন্য পানাহার করা মাওলানা মওদূদী (র) সাহেব জায়েয বলাতে সেটা কেমন করে গোমরাহ কিংবা কুরআনের বিকৃতি হয়ে যায়? এটাও আমাদের বোধগম্য নয় যে, যারা মাওলানা মওদূদীকে (র) এ রায় পোষণ করার কারণে গোমরাহ কিংবা কুরআনের বিকৃতিকারীরূপে আখ্যায়িত করে বেড়ায় তারা পূর্ববতী আলেম যারা অনুরূপ মত পোষণ করে তাদেরকে এই ফত্ওয়ার আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্যে কি কি কলা-কৌশল অবলম্বন করেছেন। এ ক্ষেত্রে নিম্নে কবিতাংশের উল্লেখ যথার্থ হবে–

ان يحسدوني فاني غير لائمهم قبلي من الناس اهل الفضل قد حسدوا

فدام لي ولهم ما بي وما بهم ومات اكثرنا غيظا بما يجد [১]

১. অর্থাৎ, আমার প্রতি তাদের বিদ্বেষ থাকা সত্ত্বেও আমি তাদের নিন্দা চর্চায় আগ্রহী নই, আমার পূর্ববতী মনীষীবৃন্দও এ জাতীয় হিংসার শিকার হয়েছেন। বস্তুত আমার ও তাদের

www.pathagar.com

মাসআলাটি সাহাবী যুগ থেকে পরবর্তী সময়ের ফকীহদের যুগ পর্যন্ত বিতর্কীত ছিল এবং কোনো সময়ই এর ওপর ইজমা হয়নি একথা এতোক্ষণ পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে।

মাসআলাটি নিয়ে আলেমগণের মধ্যে যে মতবিরোধের সৃষ্টি হয় তার উৎস কি এবং কেমন করে এই মতবিরোধ হলো এ সম্পর্কে এবার আলোচনা করতে চাই।

মত পার্থক্যের উৎসধারা

মাসআলাটি নিয়ে উম্মতের আলেমগণের মধ্যে যে মতপার্থক্য দেখাদেয় তার উৎস হলো নিম্নোক্ত আয়াতের تبين শব্দের ব্যাখ্যা। আয়াতটি হলো- حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط আয়াতে তিনটি বিষয়ের সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। এক, সাদা রেখা। দুই, কালো রেখা। তিন, تبين অর্থাৎ রৌশন বা আলোকিত হওয়া, সুস্পষ্টভাবে গোচবীভূক্ত হওয়া। সাদা রেখা ও কালো রেখার অর্থ দিনের আলো ও রাতের অন্ধকার হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত। এ অর্থের সমর্থনে আদি ইবনে হাতিম বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। নবী আলাইহিস্ সালাম আদি ইবনে হাতিমকে বুঝাতে যেয়ে বললেনঃ انما هو الليل والنهار (ابو داؤد) "তাহলো রাত ও দিন"। (আবূ দাউদ) এছাড়া কুরআনে এ হুকুমও বর্ণিত আছে যে, রোযাদারের খানা পিনার অবকাশ تبين তথা সুস্পষ্টভাবে গোচরীভূত হওয়া দ্বারা শেষ হয়ে যায়। কেননা, حتى تبين এর مدخول এবং كلوا واشربوا (খাও এবং পানকর) কে এর غاية ও منتهى (শেষ সীমা) গণ্য করা হয়। আরবী ব্যাকরণের দৃষ্টিতে تبين অর্থাৎ দিনের রেখা ভালো করে দৃষ্টিগোচর হলেই খানাপিনার অনুমতি রহিত হয়ে যাবে। এরপর পানাহার করার কোনোই সুযোগ নেই। এমতে সকলেই ঐক্যবদ্ধ। কারো দ্বিমত আছে বলে উল্লেখ নেই। রইলো তৃতীয় বিষয় যে تبين দ্বারা কুরআনের উদ্দেশ্য কি? অর্থাৎ ফজরের রেখা সুস্পষ্টভাবে দেখা যাওয়ার অর্থ ফজরের প্রথম সময় নাকি ফজরের শুভ্র রেখা দিক্ বিদিকে ভালোরূপে ছড়িয়ে পড়ার সময়, এ নিয়ে আগেকার ও পরবর্তী সময়ের আলেমদের মধ্যে

এই চারিত্রিক আচরণধারা দীর্ঘদিন যাবৎ চলেই আসছে, এমনকি আমাদের অনেকেই বিদ্বেষবাণের এই আঘাতের দুঃখ নিয়ে মৃত্যু বরণও করেছেন।

www.pathagar.com

মতপার্থক্য রয়েছে। অধিকাংশের মতে সাবধানতার জন্যে تبين এর ব্যাখ্যামূলক অর্থ হলো ফজরের প্রাথমিক সময়। রাতের কিছু অংশে অবশিষ্ট থাকা কালে খানাপিনা করা জায়েয। কিন্তু ফজরের সময় উদিত হতেই পানাহার করার আর অবকাশ থাকে না। খাদ্য ও পানীয় জাতীয় কোনো কিছুই গ্রহণ করার অধিকার থাকবে না। অপর দিকে, প্রত্যেক যুগেই সংখ্যালঘু কিছু সংখ্যক আলেম সাধারণ লোকদের জন্য এ হুকুমের উপর আমল সহজ করার পরিপ্রেক্ষিতে تبين শব্দ দ্বারা উষার আলো ভালোরূপে ছড়িয়ে পড়া পর্যন্ত প্রলম্বিত হওয়ার কথা বলে আসছেন। অর্থাৎ উষার আলো ভালোরূপে প্রসারিত হওয়া অবধি রোযাদারের পানাহার করা বৈধ।

প্রথম অভিমতের সমর্থন

হাদীস ও রেওয়ায়েতে উভয় মতের সমর্থন রয়েছে। নিম্ন বর্ণিত রেওয়ায়েতগুলি প্রথম মতের সমর্থনে পেশ করা যায়ঃ

(١) عن سمرة بن جندب يحدث عن النبي صلى الله عليه
وسلم انه قال لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض
حتى يبدو الفجر - (مسلم)

একঃ হযরত সমরাহ বিন জুনদুব (র) থেকে বর্ণিত আছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বিলালের আযান ধ্বনি অথবা পূর্বাকাশে সাদা রেখা দেখে তোমরা ধোঁকায় পড়ো না। সুবহে সাদিক হওয়া পর্যন্তই তোমাদের জন্য পানাহার করার সময়। (মুসলিম)

(٢) عن عائشة ان بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم
فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر - (بخاري)

দুইঃ "হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, বিলাল (রাঃ) যখন সুবহে সাদিক হওয়ার আগেই আযান দিতেন তখন নবী আলাইহিস সালাম ঘোষণা দিয়ে বলতেন, ইবনে উম্মে মাকতূমের আযান দেয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার কর। কারণ ইবনে উম্মে মাকতুম 'সুবহ' হওয়ার আগে আযান দেন না। সুবহে সাদিক প্রকাশিত হওয়ার পরই তিনি আযান দিয়ে থাকেন।"

www.pathagar.com

ইবনে শাইবাহ হযরত শাওবান (রাঃ) থেকে মারফু হিসেবে নিম্ন হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

(৩) الفجر فجران فاما الذى كانه ذنب السرحان فانه
لا يحل شيئا ولا يحرمه ولكن المستطير - (فتح الملهم ج ٣ ص ١١٩)

"ফজর 'দু' রকমের। এক হলো–সুবহে কাযিব এ সময় কোনো বস্তুকে হালালও করে না তদ্রুপ হারামও করেনা। অবশ্য যে ফজর বিকশিত সে সময়ে এরূপ করতে পারে। (অর্থাৎ, এ সময় পানাহার হারাম হয়ে যায়।)

(ফত্‌হুল মুলহিম, ৩য় খন্ড, ১১৯ পৃঃ)

উপরোক্ত তিনটি রেওয়ায়েত প্রথম মতের সমর্থক। কারণ, প্রথম রেওয়ায়েতটিতে খানাপিনার শেষ সময় ফজরের প্রারম্ভ সাব্যস্থ করা হয়েছে। যার অর্থ ফজরের সময় প্রকাশ পাওয়া ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে ইবনে উম্মে মাক্‌তুমের আযানকে সাহরী খাওয়ার শেষ সময় বলা হয়েছে। তিনি ফজরের ঠিক উদয় লগ্নে আযান দিতেন। তৃতীয় রেওয়ায়েতে ফজরের প্রসারিত সময়কে হারাম বলা হয়েছে। মোটকথা, তিনটি রেওয়াতের অর্থ ও ভাবার্থ প্রথম মতের সমর্থনেই প্রতীয়মান হয়। এসব রেওয়ায়েতের পেক্ষাপটে কোনো কোনো মুহাদ্দিস ইবনে উম্মে মাকতুমের আযানকে ফজরের ঠিক সময় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ইমাম নববী (র) মুসলিমের ব্যাখ্যায় এই আযান সম্পর্কে লিখেছেনঃ

فيه استحباب اذانين للصبح احدهما قبل الفجر والاخر
بعد طلوعه اول الطلوع (نووى)

"সুবহের জন্য দু'টি আযান মুস্তাহাব হওয়ার কথা এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। একটি সুবহে হওয়ার আগে, অপরটি ফজরের সময় উদিত হওয়ার প্রথম লগ্নে।" (নববী)

দ্বিতীয় মতের সমর্থন

প্রথম মতের ন্যায় দ্বিতীয় মতের সমর্থনেও কতিপয় রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। নিম্নবর্ণিত রেওয়ায়েতগুলি প্রনিধানযোগ্যঃ

(১) عن حفصة بنت عمر ان النبى صلى الله عليه وسلم

www.pathagar.com

كان اذا اذن المؤذن بالفجر قام فصلى ركعتين ثم خرج الى

المسجد وحرم الطعام وكان لا يؤذن حتى يصبح - (طحاوى)

"হযরত হাফসী (রাঃ) বলেন, ফজরের আযান হলে পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে দু' রাকয়াত সুন্নত নামায আদায় করতেন। তারপর এমন সময় মসজিদে যেতেন যে সময় খানাপিনা করা হারাম। আর ফজরের আযান সুবহে হওয়ার আগে দেয়া হতো না।" (তাহাভী)

এই হাদীসটিকে যদি রূপক অর্থে গ্রহণের চেষ্টা করা না হয়, তাহলে একথা স্বচ্ছন্দে বলা যায় যে, প্রভাত আলো ভালোরূপে ছড়িয়ে গেলেই কেবল রোযাদারের জন্য পানাহার হারাম হয়ে যায়। কারণ, হাদীসটিতে তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এক, ফজরের আযান সুবহে হওয়ার আগে দেয়া হতো না (وكان لا يؤذن حتى يصبح)। দুই, ফজরের আযানের পর নবী আলাইহিস্ সালাম দু'রাকায়াত সুন্নত নামায আদায় করতেন। كان اذا اذن المؤذن بالفجر قام فصلى ركعتين. তিন, এমন সময় তিনি মসজিদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতেন যে সময় রোযাদারের জন্য খানাপিনা হারাম হয়ে গেছে। ثم خرج الى المسجد وقد حرم الطعام- এ ধরনের বাক্যের প্রকৃতি ও আকৃতি সম্পর্কে চিন্তা করা হলে একথা স্বভাবতই বুঝা যায় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সময় ঘর থেকে বের হয়ে আসতেন সে সময়টিই সাহরী খাওয়ার শেষ সময়, এর আগে নয়। অন্যথায় وحرم الطعام বাক্যকে خرج الى المسجد বাক্যের সাথে সম্পৃক্ত অবস্থায় উল্লেখ করা হতো না। বরং اذا اذن المؤذن বাক্যের সাথে সম্পৃক্ত করা হতো। আর মসজিদে যাওয়ার সময় ছিল প্রভাতের শুভ্র রেখা দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ার লগ্ন। অতএব, হাদীসটি বাহ্যিক অর্থের দৃষ্টিতে দ্বিতীয় মতের সমর্থন করবে অর্থাৎ تبين এর অর্থ আলোকরশ্মি ছড়িয়ে পড়া পর্যন্ত পানাহার করা জায়েয।

عن طلق بن على ان النبى صلى الله عليه وسلم قال

كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الاحمر - (ترمذى)

তাল্ক বিন আলী বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "রক্তিম আভা (পূর্বদিগন্তে) তোমাদের সামনে উদ্ভাসিত হওয়া পর্যন্ত তোমরা খাও এবং পান কর।" (তিরমিজী)

www.pathagar.com

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা খাত্তাবী এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ

معنى الاحمر ههنا ان يستطير البياض المعترض مع
اوائل الحمرة وذالك ان البياض اذا تم طلوعه ظهر
اوائل الحمرة ـ اهـ (حاشيه سيوطى) (فتح الملهم ج ٣ ص ١١٩)

"এখানে রক্তিমের অর্থ হলো দিগন্তে ছড়িয়ে পড়া আলো প্রাথমিক রক্তিম আভার সাথে মিশে যাওয়া। কেননা, শুভ্রতা পুরাপুরিভাবে বিকশিত হওয়ার পর রক্তিম আভার অগ্রভাগ প্রকাশ পায়।"

(হাশিয়া সুয়ুতী, ফত্হুল মুলহিম, ৩য় খন্ড, ১১৯ পৃঃ)

আল্লামা খাত্তাবীর (র) এই ব্যাখ্যার আলোকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, উষার আলো দিগন্তে ছড়িয়ে পড়া পর্যন্ত পানাহার করা জায়েয। কারণ, রক্তিম আভা ফজর উদয়ের প্রথমে প্রকাশিত হয় না। বরং সাদা রেখা ভালো করে ছড়িয়ে পড়ার পরই প্রকাশ পায়। সুতরাং এই হাদীসটিও বাহ্যিক অর্থের দৃষ্টিতে দ্বিতীয় মতের সমর্থক। অর্থাৎ সাহ্রীর শেষ সময় আলো ভালো করে ছড়িয়ে পড়া পর্যন্ত প্রলম্বিত।

(٣) عن على انه صلى الصبح ثم قال الآن حين تبين
الخيط الابيض من الخيط الاسود ـ (رواه المنذرى باسناد صحيح)
(فتح البارى ـ ج ٤ ـ ص ١١٠ ـ فتح الملهم ج ٣ ص ١٢٠)

"হযরত আলী (রাঃ) একবার ফজরের নামায পড়িয়ে বললেন, "এবার সে সময় হলো যে সময়ে রাতের অন্ধকার চিড়ে প্রভাতের আলো বিকাশ লাভ করে।" (ফতহুলবারী, ৪র্থ খন্ড, ১১০ পৃঃ ফতহুলমুলহিম, ৩য় খন্ড, ১২০ পৃঃ)

হযরত আলীর (রাঃ) এ উক্তিটি تبين শব্দের অর্থ ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়া ছাড়া অন্য কিছু হওয়ার নেই। কুরআন রোযাদারকে পানাহার করার যে অনুমতি দিয়েছে তা ভোরের আলো ভালো করে ছড়িয়ে পড়া পর্যন্ত দীর্ঘায়িত থাকবে।

উপরোল্লেখিত কতিপয় রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, শব্দের অর্থ ফজর সময়ের প্রথমাংশ উদ্দেশ্য নয়, বরং ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়া পর্যন্ত সময়ে রোযাদারের জন্য পানাহার করা জায়েয।

www.pathagar.com

ইবনে ওমরের (রাঃ) হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা আইনীর পর্যালোচনা

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) তাঁর প্রণীত বুখারীর ব্যাখ্যা ' আইনী' গ্রন্থে ইবনে ওমরের (রাঃ) হাদীসের যে ব্যাখ্যা করেছেন অধিক স্পষ্টতার জন্যে আমরা সেটা নিম্নে পেশ করলাম । এতে করে একদিকে বিষয়টি অধিক স্পষ্ট হবে। অপরদিকে এ সত্য আমাদের সামনে ফুটে উঠবে যে, আলোচ্য বিষয়ে মওলানা মওদূদীর (র) পেশকৃত অভিমত কেবলমাত্র তার একার নয় বরং অতীতে হানাফী আলেমদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশও এর সাথে একমত। আগের বরাত সমূহ দ্বারাও বিষয়বস্তু অনেকটা পরিষ্কার হয়েছে।

ইবনে ওমরের হাদীস

عن ابن عمرؓ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم
ان بلالا ينادى بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن ام
مكتوم قال وكان ابن ام مكتوم رجلا اعمى لاينادى حتى
يقال له اصبحت اصبحت - (بخارى)

"ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, "হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ ইবনে উম্মে মাক্তুমের আযান দেয়া পর্যন্ত পানাহার কর; কেননা বিলাল (রাঃ) রাতে আযান দিয়ে থাকে। ইবনে ওমর (রাঃ) একথাও বলেছেনঃ ইবনে উম্মে মাকতুম ছিলেন অন্ধ। তিনি তখনই আযান দিতেন যখন তাঁকে বলা হতো সকাল হয়েছে, সকাল হয়েছে।"

হাদীসটিতে দু'টি বিষয়ের সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। এক নবী আলাইহিস্ সালাম উম্মে মাকতুমের আযান দেয়া পর্যন্ত পানাহার করার অনুমতি দিয়েছেন। দুই, হযরত ইবনে উম্মে মাকতুমের আযান প্রভাত হওয়ার পর হতো। এই দুই কথার প্রেক্ষাপটে ইবনে ওমরের হাদীসের ওপর নিম্ন বর্ণিত প্রশ্ন অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দিবে।

প্রশ্ন

উপরোক্ত দু'টি কথার আলোকে ঠিক ফজরের সময় রোযাদারের জন্যে পানাহার করা হাদীস দ্বারা জায়েয প্রমাণ হয়। কারণ, ইবনে উম্মে মাকতুমের

www.pathagar.com

আযান দেয়া পর্যন্ত পানাহার করার যখন অনুমতি রয়েছে এবং সুবহে সাদিক হওয়ার পর আযান দেয়ার কথাও যখন উল্লেখ রয়েছে। وكان لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت- তখন ফজরের প্রথমাংশে পানাহার করা জায়েয হওয়া স্বতঃই প্রমাণিত হয়। অথচ ফজরের প্রথমাংশ থেকে দিবসের সূচনা হয়। আর দিবাভাগে পানাহার করা কুরআনের নির্দেশানুযায়ী নিষিদ্ধ। ثم اتموا الصيام الى الليل- আল্লামা আইনী (র) এবং অন্যান্য হাদীস ভাষ্যকারগণ নিম্ন বর্ণিত ভাষায় জটিলতা ব্যক্ত করেছেন ঃ

يستشكل هذا بانه لما كان ابن ام مكتوم يؤذن بعد

وجود الصبح لاخبار الناس اياه به كيف جاز الاكل و

الشرب الى اذانه؟

এই হাদীসটিতে জটিলতা দেখা দেয় যে, ইবনে উম্মে মাকতুম যখন সুবহে সাদিক হওয়ার পর আযান দিতেন, কেননা লোকেরা তাঁকে সুবহে সাদিক হওয়ার খবর দিলে তবেই তিনি আযান দিতেন, তাহলে সে সময় পানাহার করা কেমন করে জায়েয হবে? (অথচ সুবহে সাদিক হওয়ার পর পানাহার করা জায়েয নেই)

জবাব

এই জটিলতার দু'টি জবাব দেয়া হয়েছে। এক اصبحت (সকাল হয়ে যাওয়া) শব্দটি প্রকৃত অর্থে নয়; বরং রূপক অর্থে গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ "প্রায় সকাল হয়ে যাওয়া।" সুতরাং আযানের সময় ধরতে হবে ফজরের উদয় লগ্নের প্রথমাংশ। উদয় পরবর্তী সময় নয়। এভাবে পানাহার করার অনুমতি রাতের শেষাংশ পর্যন্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হবে। এর পরের সময় দিনের প্রথমাংশ–যা আযানের সাথে সম্পৃক্ত–হিসেবে গ্রহণ করা হবে এবং সুবহে সাদিক হয়ে যাওয়ার পর পানাহার না করার অনুমতি হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত হবে। জবাবের ভাষা নিম্নরূপঃ

ويجاب بان المراد من اصبحت قاربت الصبح فيكون اذانه

عند اول طلوع الفجر الثانى ويكون اكل الناس وشربهم قبل

الطلوع - اه

এই জটিলতার জবাব হলো اصبحت শব্দটির উদ্দেশ্য হলো "সুবহে সাদিকের নিকটবর্তী সময়।" সুতরাং আযানের সময় ফজরের প্রাথমিক অংশ মানতে হবে এবং ফজর উদয়ের পূর্ব লগ্ন পর্যন্ত পানাহার করার সময় হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। (তাতে ফজরের পর পানাহার করার অনুমতি না থাকার কথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হবে।)

হাফেজ ইবনে হজর এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ শব্দগত সামান্য বিভিন্নতাসহ প্রায় অনুরূপ জবাব উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় জবাব

او يقال اصبحت على ظاهره وحينئذ يكون اكل الناس
وشربهم بعد ابتداء طلوع الفجر الثانى وهذا لا ينافى
الصوم فى قول وقد اختلف اصحابنا فى ان العبرة لاول
طلوع الفجر الثانى او لانتشاره ووضوحه قال شمس
الائمة الحلوانى القول الاول احوط والثانى اوسع كذا فى
المحيط واليه مال اكثر العلماء كذا فى خزانة الفتاوى اه
(عينى بحواله حاشيه مشكوة لمولانا نصير الدين غورغشتوى باب الاذان ص)

এই জটিলতার দ্বিতীয় জবাব হলো-" اصبحت " শব্দের বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য হবে। হাদীসে ফজরের সময় উদয়ের পর প্রাথমিক অংশে পানাহার করার যে অনুমতির কথা ব্যক্ত হয়েছে তা ফকীহদের একটি অভিমত অনুসারে রোযার বিরোধী নয়। কারণ, রোযার গ্রহণযোগ্য সময় ফজর উদয় লগ্নের প্রথমাংশ নাকি প্রভাতকিরণ ছড়িয়ে পড়া পর্যন্ত বিস্তৃত? আমাদের ফকীহগণ এ ব্যাপারে মতপার্থক্য করেছেন। শামছুল আয়িম্মা হালওয়াবী বলেন, প্রথম অভিমতটিতে অধিক সাবধানতা আর দ্বিতীয়টিতে রয়েছে সময়-সুযোগের বিস্তীর্ণতা। 'মুহীত' গ্রন্থে এভাবেই উল্লেখ রয়েছে। 'খাযানাতুল ফত্ওয়া' গ্রন্থের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আলেমদের অধিকাংশের মত এটাই।"

(আইনী, মাওলানা নাসীরুদ্দীন ঘোরগাস্তবীর হাশিয়া মিশকাত,
বাবুল আযান, ৭০ পৃ)

www.pathagar.com

উপরোক্ত জবাব আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হানাফী (র) বুখারীর ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে হুজরের প্রথম জবাব খন্ডন করার মানসে উল্লেখ করেছেন।

জবাবের সার কথা

এই জবাবের সার কথা হলো-যদি আমরা স্বীকার করে নেই যে, হাদীস দ্বারা বাহ্যিক অর্থ হওয়াই মুখ্য এবং صبح শব্দটির রূপক অর্থ এখানে গৌণ, তাহলেও হাদীসটি জটিলতার উৎস নয়। কেননা, হাদীস দ্বারা বড়জোর একথা প্রমাণিত হতে পারে যে, ফজরের প্রথম অংশে রোযাদার পানাহার করতে পারবে; তাতে রোযার কোনো ক্ষতি হবে না। কারণ, ফকীহদের এক অংশের মতে ফজরের আলো ছড়িয়ে পড়ার আগ পর্যন্ত পানাহার করা জায়েয। প্রভাতের আলো ছড়িয়ে পড়লে খানাপিনা করা নিষিদ্ধ। ফকীহদের অনেকেই এমত ব্যক্ত করেছেন।

এরই নাম কি ইনসাফ?

সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে আমরা বিগত আলোচনায় পূর্ববর্তী যুগের এবং পরবর্তী সময়ের আলেমগণের যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পেশ করেছি তাতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আজ থেকে শত শত বছর আগে এই মাসআলা সম্পর্কে সাহাবী, তাবেঈ' তাবে-তাবেঈ একাধিক ফিকহী মযহাবের সাথে সম্পৃক্ত ফকীহদের একটি নির্ভরযোগ্য অংশ সর্ব যুগে আজকের মাওলানা মওদূদী (র) কর্তৃক পেশকৃত মত পোষণ করতেন যার সমর্থনে বিপুল পরিমণে রেওয়ায়েত ও আসার বর্তমান আছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজকের চতুর্দশ শতাব্দীর আলেমগণ যারা নিজেদেরকে যাহেরী ও বাতেনী উভয় দিক থেকে প্রথম যুগের আলেমদের সাথে সম্পৃক্ত বলে প্রকাশ করে থাকেন তারা মাওলানা মওদূদীর (র) পেশকৃত রায়কে নিছক এ কারণে গোমরাহ এবং কুরআনের বিকৃতি বলে দাবী করছেন যে, মওদূদী (র) সাহেব এসব মুফতী হযরতদের প্রতিষ্ঠিত দ্বীনী মাদ্রাসা ও মাযহাবী পরিমণ্ডলে প্রথাগত ও রেওয়ায়েতগত অনুকরণ অনুশীলনে সংশ্লিষ্ট নন এবং তিনি আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে মাথা নত করতে প্রস্তুত নন। এরি নাম কি ইনসাফ?

(নসখ্) রহিত হওয়ার দাবী

যেসব আসারে কোনো কোনো সাহাবীর ফজর সময় উদয় হওয়ার পর পানাহার করা জায়েয হওয়া এবং সে মুতাবিক আমল করার কথা উল্লেখ

www.pathagar.com

রয়েছে কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিস সেসব আসার 'নসখ্' হওয়ার দাবী করেছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রমাণের দিক থেকে 'নসূখ' হওয়ার এ দাবী জোরালো নয় বরং দুর্বল। সুতরাং আমরা এর ওপরও কিছুটা আলোচনা করতে চাই।

عن زر بن حبيش قال تسحرت ثم انطلقت الى المسجد
فمررت بمنزل حذيفة فدخلت عليه فامر بلقحة فحلبت
وبقدر فسخنت ثم قال كل فقلت انى اريد الصوم قال
وانا اريد الصوم قال فاكلنا ثم شربنا ثم اتينا المسجد
فاقيمت الصلوة قال هكذا فعل بى رسول الله صلى الله
عليه وسلم قلت بعد الصبح؟ قال بعد الصبح غير
ان الشمس لم تطلع - (طحاوى - ج ١ ص ١٧٣)

যুর বিন্ হুবাইশ বলেন, একবার আমি সাহরী খেয়ে মসজিদের দিকে রওয়ানা হলাম। মসজিদের রাস্তায় হযরত হোযাইফার (রাঃ) ঘর। ঘরে প্রবেশ করতেই তিনি উটের দুধ নিয়ে ডেকচিতে গরম করার ফরমায়েশ দিলেন। নির্দেশ পালিত হল। তারপর তিনি বললেনঃ 'পান কর,' রোযা রাখার ইচ্ছা করেছি–একথা বলে আমি ওজর পেশ করলাম। তিনি বললেনঃ আরে! আমিও তো রোযা রাখার ইচ্ছা করেছি। তারপর আমরা উভয়ে খেলাম, পান করলাম। পরে মসজিদে এসে দেখি জামায়াত দাঁড়িয়ে গেছে। তারপর তিনি বললেনঃ এ ধরনের কাজ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার সাথে করতেন। আমি প্রশ্ন করলামঃ প্রভাত হওয়ার পরও কি তিনি এরূপ করেছেন? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, প্রত্যূষ হওয়ার পরও এরূপ করেছেন; তবে সূর্য তখনো উদয় হয়নি।

(তাহাভী, ১ম খন্ড, ১৭৩ পৃঃ)

এই রেওয়ায়েত সম্পর্কে ইমাম তাহাভী (রঃ) দাবী করেছেন, বর্ণিত আসারটি كلوا واشربوا حتى ينادى ابن ام مكتوم বাণী সংশ্লিষ্ট রেওয়ায়েতের খেলাফ। হযরত হোজাইফার (রাঃ) রেওয়ায়েতটি সে যমানার যখন خيط ابيض এর বর্ণনা من الفجر এর সাথে নাযিল হয়নি–এই সন্দেহের ভিত্তিতে ইমাম তাহাভী (রাঃ) হোজাইফার (রাঃ) রেওয়ায়েত সম্পর্কে দাবী করেছেন,

www.pathagar.com

من الفجر এর নাযিল হওয়ার কারণে রেওয়ায়েতটি মানসুখ হয়ে গেছে। এরি প্রেক্ষিতে তিনি লিখেছেনঃ

فهذه الآثار التي ذكرناها تخالفه لحديث حذيفة وقد
يحتمل حديث حذيفة عندنا والله اعلم ان يكون قبل
نزول قوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض
من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل . اه

উপরোল্লেখিত সমস্ত রেওয়ায়েত [যার মধ্যে বিলাল (রাঃ) ও ইবনে উম্মে মাকতুমের আযানের কথা বলা হয়েছে] হযরত হোজাইফার (রাঃ) হাদীসের খেলাফ। তবে হোজাইফার হাদীসটি كلوا واشربوا حتى يتبين لكم... এই আয়াত নাযিল হওয়ার আগে বর্ণনা করার সম্ভাবনা রয়েছে।"

ইমাম সাহেব তার এই দাবীর সমর্থনে হযরত সহল বিন সা'দ এবং আদী বিন হাতিমের রেওয়ায়েতও উল্লেখ করেছেন। সে রেওয়ায়েতে কোনো কোনো সাহাবী সম্পর্কে একথা স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, من الفجر আয়াত নাযিল হওয়ার আগে তারা দিবা ভাগের আলোকে দু'টি সূতার মধ্যে ভালো করে পার্থক্য নির্ণয় করা পর্যন্ত পানাহার করতেন। সুতরাং হযরত হোজাইফার (রাঃ) হাদীসটি من الفجر আয়াতাংশ নাযিল হওয়ার আগে হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং من الفجر আয়াতাংশ নাযিল হওয়ার পর এ ধরনের সমস্ত রেওয়ায়েত মানসূখ হয়ে গেছে।

ইমাম সাহেব (রঃ) নস্খের সমর্থনে আরো একটি রেওয়ায়েত পেশ করেছেনঃ

عن طلق بن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا
يهيدنكم الساطع المصعد فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم
الاحمر (ابوداؤد)

"তালক বিন আলী (রাঃ) বলেনঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ পূর্বাকাশের সাদা দিগন্ত রেখা তোমাদেরকে পানাহার থেকে যেন বিরত না রাখে। রক্তিম আভা প্রকাশ হওয়ার আগ পর্যন্ত খাও, পান কর।"

(আবু দাউদ)

www.pathagar.com

দলীলসমূহের সারমর্ম

ইমাম তাহাভী (র) তার দাবীর নস্‌খের সমর্থনে যতোগুলি দলীলের কথা উল্লেখ করেছেন তার সারমর্ম নিম্নরূপঃ

প্রথম দলীল

হযরত হোজাইফার (রাঃ) হাদীস সেসব রেওয়ায়েতের খেলাফ যেগুলোতে ইবনে উম্মে মাকতুমের আযান শোনা পর্যন্ত পানাহার করার অনুমতি রয়েছে। আর সেই আযান হতো ফজরের ঠিক সময়ে। এসব রেওয়ায়েত অনুযায়ী নবীর (সঃ) যুগে আমলও হতো। এতে জানা যায় যে, এর খেলাফ যদি কখনো কাজ হতো তাহলে পরে তা পরিত্যক্ত হয়ে যায়। আর এটাই হলো নস্‌খের আলামত।

দ্বিতীয় দলীল

হযরত হোজাইফার (রাঃ) এই হাদীসটি حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود এই আয়াতের সাথে "من الفجر" আয়াতাংশ নাযিল হওয়ার আগেকার ছিল। কারণ সে যামানায় কোনো কোনো সাহাবী দু'টি সূতার মধ্যে দিনের আলোয় ভালো করে পার্থক্য নির্ণয় করা পর্যন্ত পানাহার করতেন। সুতরাং হোজাইফার (রাঃ) হাদীসটি সে সময় হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। من الفجر আতায়াতাংশ নাযিল হওয়ার পর এ প্রকৃতির সব হাদীস মানসুখ হয়ে যায়।

তৃতীয় দলীল

তৃতীয় দলীল হলো তালক বিন আলীর (রাঃ) বর্ণিত হাদীস। "হাদীসটিতে পূর্ব দিগন্তে শুভ্র রেখা থাকা পর্যন্ত পানাহার করার অনুমতি রয়েছে। এই রেখা শুধু সুবহে সাদিক পর্যন্তই বর্তমান থাকে। সুতরাং এই হাদীস মতে সুবহে সাদিক উদয় হওয়া পর্যন্ত পানাহার করা চলবে। এর পরে নয়। কারণ সুবহে সাদিক থেকে দিবসের সূচনা হয়। আর দিনের বেলায় রোযাদারের পানাহার করা নিষিদ্ধ। হযরত হোজাইফার (রাঃ) হাদীসে ফজর লগ্ন উদয়ের পরও পানাহার করা বৈধতার কথা উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং তালক বিন আলীর (রাঃ) বর্ণিত রেওয়ায়েত দ্বারা হোজাইফার (রাঃ) হাদীসটি মানসুখ রূপে গণ্য করা হবে।"

www.pathagar.com

'নস্‌খ' হওয়ার দাবীর পর্যালোচনামূলক সমীক্ষা

ইমাম তাহাভী (র) হযরত হোজাইফার (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি মানসূখ হওয়ার যে দাবী উত্থাপন করেছেন নিম্নবর্ণিত কারণে তার সাথে একমত হওয়া সম্ভব নয়।

(ক) প্রথমত 'নস্‌খ' হওয়ার দাবী এ কারণে গ্রহণযোগ্য নয় যে, শাস্ত্রকারদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী বিভিন্ন বিরোধী রেওয়ায়েতগুলো আগে-পরে হওয়ার সন্দেহ রয়েছে। একটি রেওয়ায়েত আগে অপরটি পরে-একথা তারিখসহ অকাট্য দলীল ও সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নিছক সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কোনো রেওয়ায়েতের 'নস্‌খ হওয়ার দাবী করা ঠিক নয়। كما هو المصرح به في كتب الفن এখানে হোজাইফার (রাঃ) বর্ণিত হুজুরের কাছে আগে এবং ইবনে উম্মে মাকতুমের হাদীসটি পরে হয়েছে-একথা দৃঢ় প্রত্যয়সহ জানা নেই। সুতরাং মানসূখ বলা ঠিক নয়।

(খ) ব্যাপারটি শুধুমাত্র হযরত হোজাইফার (রাঃ) একটি রেওয়ায়েত কিংবা তাঁর একটি কাজ ও আমলের সাথে জড়িত নয়; বরং এ বিষয়ের ওপর কতিপয় আসার সহীহ্ সনদসহ বর্ণিত আছে। এসব আসারে কিছু সংখ্যক সাহাবার অনুরূপ কাজ করার কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ), হযরত হোজাইফা (রাঃ), হযরত তালক বিন আলী (রাঃ) এবং হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণ উল্লেখযোগ্য। হাফেজ ইবনে হজর (রাঃ) এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের বরাতে আগের আলোচনায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। আর কথাটা একটু বেখাপ্পাও যে, মুসলিম জনসাধারণের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি নির্দেশ রাসূলের যামানায় রহিত হয়ে গেল অথচ উপরোল্লেখিত খ্যাতনামা সাহাবীগণ সে সম্পর্কে অজ্ঞাত রয়ে গেলেন, এমনকি হুজুরের ইন্তেকালের পরও তাঁরা সেই রহিত নির্দেশ যথারীতি পালন করে চলছেন। সুতরাং যথার্থ এটাই যে, এসব উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবীগণ যখন ঠিক ফজরের সময় পর্যন্ত পানাহার করার পক্ষপাতী তখন এই হুকুম মানসূখ তথা রহিত হয়নি।

(গ) حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود

www.pathagar.com

এই আয়াত দ্বারা মানসুখ করার যে দাবী করা হয়েছে সেটাও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, من الفجر আয়াতাংশ দ্বারা কেবলমাত্র একথাই জানা যায় যে, সাদা ও কালো দিগন্ত রেখার প্রকৃত অর্থ এখানে উদ্দেশ্য নয় বরং দিবসের আলো এবং রাতের অন্ধকার নির্ণয় করা উদ্দেশ্য। আর যারা দু'টি সূতাকে পারস্পরিকভাবে পার্থক্য করার সময় পর্যন্ত খানাপিনা করে তাদের এ কাজ ঠিক নয়। কিন্তু একথা কিভাবে প্রমাণিত হয় যে, تبين শব্দের দ্বারা ফজরের প্রাথমিক সময় উদ্দেশ্য, আলো ছড়িয়ে পড়া পর্যন্ত উদ্দেশ্য নয়। من الفجر নাযিল হওয়ার পরও تبين শব্দ দ্বারা আলো ভালো করে ছড়িয়ে পড়া উদ্দেশ্য হওয়া, জায়েয হবে না কেন? من الفجر এর من শব্দটি বর্ণনামূলক কিংবা কারণমূলক যাই হোক না কেন। আয়াতের অর্থ এই হবে না কেন-"দিনের আলো ভালো করে ছড়িয়ে পড়া পর্যন্ত তোমরা খাও এবং পান কর।"

تبين ক্রিয়াটি من الفجر আয়াতাংশ নাযিলের পর انتشار الضوء (আলো ছড়িয়ে পড়া) ওপর প্রয়োগ করা শুধুমাত্র সন্দেহ নয়, বরং আয়াত নাযিল এবং নবীর ইন্তেকাল এই উভয় কাজের পর হযরত আলীও (রাঃ) تبين শব্দটিকে এই অর্থে প্রয়োগ করেছেন। আগের হাদীসে হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে এভাবে-

انه صلى الصبح ثم قال الان حين تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود

অর্থাৎ হযরত আলী (রাঃ) ফজরের নামায পড়ার পর বলতেন এবার تبين (আলো ছড়িয়ে পড়া) এর সময় হয়েছে। তারপর হযরত হোযাইফাকে (রাঃ) ফজরের সময় উদয়ের পর খানা খাওয়ানো বস্তুত এ সত্য প্রকাশ করারই নামান্তর যে, تبين দ্বারা শুধুমাত্র ফজরের সময় উদয় হওয়াই নয় বরং প্রভাতের আলোকচ্ছটা দিগন্তে ছড়িয়ে পড়াও এর মধ্যে শামিল এবং আলোকচ্ছটা ভালো করে ছড়িয়ে পড়া পর্যন্ত পানাহার করা জায়েয এবং এই হুকুম মানসূখ নয়।

(ঘ) বিভিন্ন 'নস' এবং দ্বন্দ্বময় রেওয়ায়েত মানসূখ হওয়ার দাবী তখনই যথার্থ হতে পারে যখন বিভিন্ন রেওয়ায়েত ও নসের মধ্যে যুক্তিসংগত ব্যাখ্যার মাধ্যমে সামঞ্জস্য বজায় রাখা সম্ভব না হয়। এখানে যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিভিন্ন রেওয়ায়েত ও নসের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব। সুতরাং নসখ হওয়ার দাবীর কোনোই প্রয়োজন নেই।

www.pathagar.com

একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যাটি হলো-খাওয়া-দাওয়া করার নির্দেশের দু'টি দিক আছে। একটি আবশ্যিক عزيمت অপরটি অবকাশ বা رخصت অর্থাৎ এই নির্দেশের একটি কাজ উত্তম অপরটি জায়েয মাত্র। আবশ্যিক বা উত্তম হওয়ার অর্থ হলো রাতের মধ্যেই খানাপিনা শেষ করা। ফজর সময় দেখা দিতেই পানাহার না করা। তবে অবকাশ হিসেবে ফজর সময় দেখা দেয়ার পরও পানাহার করা জায়েয মাত্র। তবে শর্ত হলো- ভোরের আলো ভালো করে ছড়িয়ে না পড়া। এই ব্যাখ্যার দরুন সমস্ত রেওয়ায়েত ও নসের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় থাকে এবং কোনো দ্বন্দ্ব দেখা দেয় না। কারণ, যেসব হাদীস ও রেওয়ায়েত দ্বারা পানাহার করার সময় সুবহে সাদিক পর্যন্ত এর পর নয়–বলে জানা যায় – সে সময়টিকে আযীমত বা উত্তম বলে অভিহিত করতে হবে। অর্থাৎ সুবহে সাদিক হতেই খানা বন্ধ করে দেয়া উত্তম। আর যেসব হাদীস ও রেওয়ায়েত দ্বারা ফজর সময়ের পরও পানাহার করা জায়েয হওয়া প্রমাণিত হয় সে সময়টিকে শুধুমাত্র জায়েয হওয়ার অর্থে বুঝতে হবে। অর্থাৎ অপারগ অবস্থায় এরূপ করা জায়েয। বাকি রইলো কুরআনের تبين শব্দের প্রয়োগ। বস্তুত শব্দটিকে এমন অর্থে প্রয়োগ করতে হবে যাতে করে উভয় সময় এর আওতায় এসে যায়। অর্থাৎ تبين এর শুরু হবে ফজর উদয়ের মাধ্যমে আর শেষ হবে আলো ছড়িয়ে পড়ার সময়। ইমাম ইসহাক এই ব্যাখ্যার প্রতিই ইশারা করেছেন। যথাঃ

قال اسحق هؤلاء رأوا جواز الاكل بعد طلوع الفجر المعترض
حتى يتبين بياض النهار من سواد الليل و بالقول الاول
اقول ولكن لا اطعن على من تأول الرخصة كالقول الثانى
ولا ارى عليه قضاء ولا كفارة - اه (فتح البارى ج ٤ ص ١١٠)

"ইমাম ইসহাক বলেন, এসব লোক ফজর সময় হওয়ার পরও আলোকচ্ছটা ভালো করে ছড়িয়ে পড়া পর্যন্ত পানাহার করাকে জায়েয মনে করেন। আমি নিজে যদিও প্রথম মতের (ফজর সময় দেখা দেয়ার পর খানাপিনা করা না–জায়েয) সমর্থক তথাপি যারা অবকাশ বা Option হিসেবে ফজর সময় হওয়ার পর খানাপিনা করাকে জায়েয মনে করে তাদেরকে তিরস্কার করছি না এবং তাদের উপর কাযা ও কাফ্ফারা ওয়াজিব, একথাও বলছি না।" (ফতহুলবারী, ৪র্থ খন্ড, ১১০পৃঃ)

www.pathagar.com

ইমাম ইসহাকের لا طعن على من تأول الرخصة এ উক্তি দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, ফজর সময় দেখা দেয়ার পর পানাহার করা জায়েয হওয়া একটি অবকাশ জনিত হুকুম। আর ফজর সময় হওয়ায় খানাপিনা বন্ধ করে দেয়া আবশ্যিক।

(ঙ) كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الاحمر

তালক বিন আলীর (রাঃ) এই রেওয়ায়েত দ্বারা 'নসখ' হওয়ার দাবী প্রমাণ হয় না। কারণ, এ রেওয়ায়েতে রক্তিম আভা প্রকাশিত হওয়ার আগ পর্যন্ত পানাহার করার শেষ সময় পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। আর এই রক্তিম আভা সুবহে সাদিকের আলোকচ্ছটা পরিপূর্ণভাবে দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ার পরই বিকশিত হয়ে থাকে। এভাবে এই হাদীসটি ইমাম তাহাভীর (র) রায়ের খেলাফ এবং হযরত হোযাইফার (রাঃ) হাদীসের সহায়তাকারী হয়ে যায়। একথা আমাদের বোধগম্য নয় যে, ফজর সময় উদিত হওয়ার পর খানাপিনার হুকুম এই হাদীস দ্বারা কিভাবে মানসুখ হতে পারে?

(চ) 'মানসুখ' হওয়ার দাবী এ কারণেও বোধগম্য নয় যে, প্রসংগটি সাহাবীর যুগ থেকে পরবর্তী সময়ের ফকীহদের যুগ পর্যন্ত প্রতি সময়ে বিতর্কিত হিসেবে বর্ণিত হয়ে আসছে। প্রায় প্রতি যুগেই মাসআলার প্রতিটি দিকই পালিত ও বাস্তবায়িত হয়ে গেছে। যদি হুকুমটি বাস্তবিকই মানসুখ হয়ে যেতো তাহলে মাসআলাটির সবদিক ওলামা কর্তৃক বাস্তবায়িত হতো না। পরন্তু বিতর্কিতরূপে তার আলোচনাও হতো না। অথচ ঘটনা এর বিপরীত। মাসআলাটি বিতর্কিত বলেই তো এতো কিছু আলোচনার অবকাশ সৃষ্টি হয়েছে।

উপরোক্ত ছয়টি কারণে আমরা এই মাসআলায় ইমাম তাহাভীর (র) 'নসখ হওয়ার' দাবীর সাথে ঐক্যমত পোষণ করি না। বরং এ ব্যাপারে আমাদের অভিমত হলো, মাসআলাটি পূর্ব ও পরের যমানায় বিতর্কিত হিসেবে প্রচলিত। অথবা এর এক দিককে আযীমত ও অপর দিককে 'রূখসত' হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। আর কোনো দিক 'মানসূখ' নয়।

এই হলো মাসআলার প্রকৃত তত্ত্ব। অভিযোগকারী মহোদয়গণ মেহেরবাণী করে এ দৃষ্টিভংগীতে তাঁদের অনুগ্রহ দিকে নিবদ্ধ করুন। শায়খুল ইসলাম

www.pathagar.com

হযরত মওলানা সাইয়েদ হোসাইন আহমদ মাদানী (র) সাহেবের জনৈক স্ব-ঘোষিত খলীফা বুযর্গ আলেম তার একটি বইয়ে লিখেছেন-

" শুভ্ররেখা প্রকাশ পেয়েছে কি পায়নি তাতে তো সন্দেহ হতে পারে। কিন্তু রেখা প্রকাশ পাওয়ার কথা দৃঢ় হয়ে গেলে অতপর খানাপিনা করার অর্থ হলো দিবসের কোনো ভাগে পানাহার করা যা কুরআনের সঠিক তাৎপর্যের সম্পূর্ণ খেলাফ। মওদূদী সাহেবের এই ইজতিহাদ নিছক সিনাজুরী; কুরআনের বাক্যে যার আদৌ কোনো অবকাশ নেই। দিবসের এই সূচনা ও সমাপ্তিকে বুঝার জন্য আল্লাহ্ তায়ালা দিবানিশিকে সাদা কালো সূতার সাথে তুলনা করেছেন। এর তাৎপর্য হলো শুভ্রতা ছড়িয়ে পড়া শর্ত নয়।" (তানকীদী নযর -পৃঃ১১২)

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) সাহেবের অপর একজন খলীফা তার বইয়ে লিখেছেন-

"মওদূদী সাহেব তাফহীমূল কুরআনে লিখেছেন " ঠিক ফজরের উদয়লগ্নে জাগ্রত হলে পর ত্বরায় কিছু খেয়ে পীয়ে নাও। কথাটি কুরআনের সুস্পষ্ট অস্বীকার করা" (সীরাতে মুস্তাকীম)

আশ্চর্য! এসব মহোদয়গণ হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ও গোড়ামিতে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছেন! মাওলানা মওদূদীর (র) সাথে তাদের এই বৈরীতার হেতু কি? এসব ভদ্রতার ছদ্মাবরণকারীগণ বিতর্কিত ও মতানৈক্য বিষয়ের ওপর কলম ধরা মাত্র অন্ধের ন্যায় অন্ধকারে ঢিল ছুড়তে থাকেন। তাঁরা মূলত বুদ্ধিবৃত্তিক ও তাত্ত্বিক আলোচনা এড়িয়ে যেতে চান এবং সে ধরনের আলোচনা করতে অভ্যস্তও নন।

প্রসংগটির বিগত আলোচনার আলোকে এসব অর্বাচীন হযরতদের উত্থাপিত সমালোচনা ও অভিযোগ গুলির জবাব দেয়া কিংবা এগুলি সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করার উপযোগী বলে আমরা মনে করি না। তবে সহৃদয় পাঠকবর্গের কাছে আমাদের আরজ, বিগত পর্যালোচনা ও আলোচনার আলোকে আপনারা নিজেরাই এসব অভিযোগের ওপর চিন্তা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন যে, এ ব্যাপারে মাওলানা মওদূদী (র) সত্যপক্ষ অবলম্বনকারী নাকি অভিযোগ উত্থাপনকারী, মহোদয়গণ? উপরন্তু মাওলানা মওদূদী (র) সাহেব যে অভিমত

www.pathagar.com

ব্যক্ত করেছেন তাতে তিনি কি একক, নাকি তাঁর সাথে উম্মতের প্রখ্যাত আলেমগণও একমত পোষণ করেছেন সেটাও বিবেচনা করার বিষয়।

والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

(আল্লাহই সত্যভাষী এবং তিনিই লক্ষ্য পথের পরম দিশারী।)

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

দু'সহোদরা বোনকে একত্রে বিবাহ করা প্রসংগ

দু'সহোদরা বোনকে একসাথে বিয়ে করার প্রসংগটিও একটি বিতর্কিত মাসাআলা। এ ব্যাপারেও আলেমগণ মাওলানা মওদূদীর (র) ওপর অনেক অভিযোগ আরোপ করেছেন। তাদের অভিযোগ, দু'সহোদরা বোনকে একই সময়ে এক ব্যক্তি বিবাহ করাকে মাওলানা মওদূদী সাহেব জায়েয মনে করেন। অথচ কুরআনের আলোকে একাজ হারাম। কুরআনের ভাষায়ঃ

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

"দু'সহোদরা বোনকে একত্রে বিয়ে করা তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। তবে অতীতে যা হয়েছে তা ধর্তব্য নয়।"

সতর্কবাণী

এই গ্রন্থের ১ম খন্ডে (যা 'উসূলে মাসায়েল' নামে পেশ করা হয়েছে) 'ভূমিকার' শিরোনামে কতিপয় সর্বস্বীকৃত নীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি নীতি হলো الاجتهاد فيما لا نص فيه من الاجتهاد এই স্বীকৃত নীতির আলোকে "দু'সহোদরা বোনকে একত্র বিয়ে করার" বিষয়টি মনে রাখতে হবে। যে দু'সহোদরা বোনকে একসাথে বিয়ে করার পক্ষে মাওলানা মওদূদী (র) অভিমত দিয়েছেন তারা জন্মগতভাবে এক অংগীভূত জোড়া; স্বাভাবিকভাবে পৃথক অংগীভূত দু'বোন নয়। এমন ধরনের এক অংগীভূত জোড়া দু'সহোদরা বোন সম্পর্কে বিশেষভাবে কুরআন হাদীসে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ আমি খুঁজে পাইনি। উম্মতের যাঁরা মুজতাহিদ তাঁদের গবেষণা ও চিন্তা সাধনায়ও এরূপ বিশেষ ঘটনার সুস্পষ্ট ফত্ওয়া পাওয়া দুষ্কর। এ ধরনের ঘটনা সম্পর্কে শরঈ নির্দেশ জানার জন্য ইজতিহাদের সাহায্য নেয়া ছাড়া আর কোনো গত্যান্তর নেই। মুজতাহিদগণের সকলের গবেষণা একরূপ না হওয়া, বরং বিভিন্ন হওয়া তো বলাই বাহুল্য। এখন এই বিশেষ ব্যাপারে মাওলানা মওদূদীর (র) ইজতিহাদ যদি অন্যান্য আলেমদের ইজতিহাদ থেকে ভিন্নতর হয়, তাতে দোষের কি আছে?

www.pathagar.com

ভুল ত্রুটির সম্ভাবনা কিংবা শরঈ আহকাম ও দলীলের বিরোধিতার প্রশ্ন এই বিশেষ ব্যাপারে যেভাবে মাওলানার ইজতিহাদে দেখা দিতে পারে অনুরূপ অন্যান্য আলেমদের ইজতিহাদেও এ জাতীয় ভুল ত্রুটির সম্ভাবনা আছে। মাওলানার ইজতিহাদে শরঈ আহকাম ও দলীল বিরোধী গন্ধ থাকলে অপরাপর আলেমদের ইজহিতাদেও সে বিরোধিতার অভিযোগ উঠতে পারে। কারণ তাদের কারো ইজতিহাদই অহীর ভাষায় নিরূপিত নহে; বরং মানবীয় রায় ও ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর মানবীয় অভিমত যতো উচ্চাংগই হোক না কেন তা ভুলত্রুটি থেকে একেবারে নিখাঁদ ও নির্ভেজাল হতে পারে না। সুতরাং এই মতপার্থক্য সম্পর্কে আমাদের নিরপেক্ষ ও সুস্পষ্ট অভিমত হলো, কোনো ইজতিহাদী মাসআলায় দু'জন মুজতাহিদের মধ্যে যেমন মতবিরোধ থাকতে পারে এখানেও সে ধরনের মতবিরোধ থাকা বিচিত্র নয়। দলীল ও যুক্তির বলিষ্ঠতা ও দুর্বলতার ওপর ভিত্তি করে একজন মুজতাহিদের রায়ের ওপর অপরজনকে যেরূপ প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে, কিন্তু গোমরাহ কাউকেই বলা যায় না, এখানেও তদ্রূপ দলীল ও যুক্তির দৃঢ়তা ও দুর্বলতার ওপর নির্ভর করে এবং কোনো অবস্থাতেই কাউকে গোমরাহ আখ্যা না দিয়ে আমরা মাওলানা মওদূদী (র) ও অন্যান্য আলেমদের ইজতিহাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রাধান্য দানের ভূমিকায় অগ্রসর হতে পারি। যেহেতু কোনো ইজহিতাদই বিতর্কের উর্ধে নয়।

আমাদের মতে মাওলানা মওদূদীর (র) ইজতিহাদ অধিকতর প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য। কেননা, তাঁর ইজতিহাদ একদিকে যুক্তিগ্রাহ্য এবং শরীয়তের নীতির সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যশীল; অপরদিকে এর পশ্চাতে রয়েছে মজবুত ও জোরালো দলীল। তাই এ পর্যায়ে প্রথমত নিম্নে আমরা আসল ব্যাপারের তত্ত্ব উদঘাটন অতপর এ সম্পর্কে মাওলানার (র) দেয়া জবাব তুলে ধরতে আগ্রহী। তারপর মাওলানা (র) যেসব প্রমাণের ওপর নির্ভর করে জবাব দিয়েছেন সেগুলি যুক্তিসংগত এবং শরঈ নীতি সম্মত কিনা? দ্বিতীয়ত তাঁর জবাব সঠিক এবং ইজতিহাদ গ্রহণযোগ্য মনে করার কারণ কি? ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করতে চাই।

প্রকৃত ঘটনার স্বরূপ

এ পর্যায়ে ঘটনা হলো, মাওলানা তখন মুলতান কারাগারে। এরিমধ্যে ভাওয়াল পুরের জনৈক ব্যক্তি একদেহী ভুক্ত দু'টি মেয়ের বিবাহ সম্পর্কে

www.pathagar.com

একটি জটিল প্রশ্নলিখে জবাব চেয়ে তাঁর কাছে কারাগারে পাঠিয়ে দেয়। লোকটি এর জবাবদানে বাধিত করতে মাওলানাকে (র) বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়ে লিখে।

প্রশ্নঃ "জবাবের আশায় নিম্নোক্ত বিষয়টি হযরতের খেদমতে পাঠানো হলো। কোনো সাক্ষাৎকারীর মাধ্যমে পাঠিয়ে দিলে বাধিত হবো।

"আমাদের ভাওয়াল পুরে দু'সহোদরা একদেহীভূত অর্থাৎ জন্মগতভাবে তাদের কাঁধ,পাঁজর ও কোমরের হাড় পর্যন্ত জোড়া লাগা অবস্থায় আছে, কিছুতেই পৃথক করা যায় না। জন্ম থেকে যৌবনে পদার্পন করা পর্যন্ত তারা একসাথে চলা-ফেরা করে। ক্ষুধা, প্রশ্রাব পায়খানা উভয়ের একই সময় অনুভূত হয়; এমনকি একজন যে রোগে আক্রান্ত হয় অপরজনও তাতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

এখন প্রশ্ন হলো, তাদের উভয়ের বিবাহ একজন পুরুষের সাথে হতে পারবে কি পারবে না? যদি একজন পুরুষের সাথে তাদের বিবাহ বৈধ হয়, তাহলে এর শরয়ী দলীল কি? স্থানীয় আলেমগণ একজনের সাথে বিয়ে দেয়া জায়েয মনে করেন না, আবার দু'জনের সাথেও নাজায়েয বলেন। এ পর্যায়ে দু'সহোদরাকে একত্রে বিয়ে করা কুরআনের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। যথা-

وان تجمعوا بين الاختين - الآية

কুরআনের এই নির্দেশের ওপর ভিত্তি করে একদেহীভূত দু'বোনকে দুজন পুরুষের সাথে বিয়ে দিলে নিম্নোক্ত অসুবিধা ও জটিলতা দেখা দেয়। যার কারণে আলেমগণ মৌন ভূমিকা অবলম্বন করেছেন।

একঃ এমতাবস্থায় স্বামী কেবল বিবাহিতা স্ত্রীর সাথেই তার যৌন সম্পর্ক সীমাবদ্ধ রাখতে সক্ষম হবে আর অপর একদেহী বেগানা মেয়েটির সাথে এ ব্যাপারে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হবে, এর নিশ্চয়তা কোথায়?

দুইঃ দ্বিতীয়, মেয়েটি আপন বোনের সাথে একদেহীভূত হওয়ার সাথে সাথে অভিন্ন মানসিকতারও অধিকারী । স্বামী-স্ত্রীর অন্তরঙ্গ লগ্নে সেও প্রভাবিত হবে না, এরি বা যামানত কে দিবে?

তিনঃ দু'জন পুরুষের সাথে বিয়ে হলে যৌন মিলনকালে উভয় বোনের অনুভূতি আঘাতপ্রাপ্ত হবে। সুতরাং লাজ-লজ্জা আক্রান্ত হতে বাধ্য।

www.pathagar.com

এমতাবস্থায় তাদের মধ্যে তখন পারস্পরিক হিংসা ও প্রতিযোগিতামূলক অনুভূতি সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। ফলে (১) وجعل بينكم مودة ورحمة এবং (২) وجعل منها زوجها ليسكن اليها - (اعراف) কুরআনের ভাষায় বিবাহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে বাধ্য।

চারঃ অধিকন্তু বংশবৃদ্ধি , বাপ-মা ও সন্তানের মধ্যে সম্প্রীতি উৎপাদন করাও বিয়ের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। দু'জন পুরুষের বিবাহ এ ক্ষেত্রে কুড়ালের ভূমিকা পালন করবে। আরো অনেক অসুবিধা আছে যেগুলি ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। মেহেরবাণী করে শরীয়তের দৃষ্টিতে এ সমস্যার সমাধান দিয়ে জটিলতা ও সন্দেহের জট খুলে দিন। যাতে করে মেয়ে দু'টির অভিভাবক তাদেরকে পাত্রস্থ করতে পারেন এবং যৌবনে পদার্পণ করার পর সাম্ভাব্য ফিতনায় পতিত হওয়া থেকে রক্ষা পেতে পারে। এই হল পত্রের সারকথা।

এবার মাওলানা মওদূদী (র) এ প্রশ্নের যে জবাব দিয়েছেন তার প্রতি লক্ষ্য করুন।

মাওলানা মওদূদীর (র) জবাব

"আলোচ্য একদেহীভূত মেয়ে দুটির ব্যাপারে চার ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এক, উভয়ের বিয়ে দু'জন আলাদা পুরুষের সাথে হতে পারে। দুই, একজনকে একপুরুষের সাথে বিয়ে দিয়ে অপর জনকে বঞ্চিত রাখা। তিন, উভয়ের বিয়ে একই পুরুষের সাথে হতে পারে। চার, উভয়ই বিয়ে করা থেকে বিরত থাকবে।"

প্রথম দু'টি অবস্থা এমন সুস্পষ্ট না-জায়েয, অযৌক্তিক ও অবাস্তব, যার জন্যে দলীলের প্রয়োজন নেই। শেষ দু'টি অবস্থা অবশ্য গ্রহণযোগ্য। তবে একটি অবস্থা সম্পর্কে স্থানীয় আলেমগণ যেহেতু বলেন, এ অবস্থায় দু'সহোদরাকে একত্রে বিবাহ করার নামান্তর, যা কুরআনে স্পষ্টত হারাম বলা হয়েছে। সুতরাং শেষাবস্থাই গ্রহণ ও বাস্তবায়ন যোগ্য।

আলেমদের একথা বাহ্যত সঠিক মনে হয়। কারণ, দু'টি মেয়ে যময বোন। আর কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশ-দু'সহোদরাকে একই সময়ে বিয়ে করা হারাম। তবে এখানে দু'টি প্রশ্ন দেখা দেয়।

www.pathagar.com

(ক) মেয়ে দু'টিকে আজন্ম কৌমার ব্রত পালন করতে এবং সব সময়ের জন্য বিবাহ থেকে বঞ্চিত করতে বাধ্য করা কি জুলুম নয়?

(খ) জন্মসূত্রে অস্বাভাবিক ও বিরল ঘটনায় পতিত দু'সহোদরার ক্ষেত্রেও কুরআনের উল্লেখিত আয়াতটি প্রযোজ্য হবে কি? আমার ধারণামতে নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত আয়াতটি এরূপ বিশেষ ও অস্বাভাবিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; বরং আয়াতের নির্দেশ স্বাভাবিকভাবে পৃথক পৃথক দেহধারী দু-সহোদরার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ ধরনের দু-সহোদরাকে একই সময় এক ব্যক্তির বিবাহে একত্র করাই মূলত একসাথে দুই বোন বিয়ে করার অর্থ হতে পারে, অন্যথায় নহে। বলাবাহুল্য সাধারণ অবস্থার জন্য আহকাম বর্ণনা করা এবং বিশেষ, বিরল, অস্বাভাবিক ও অসম্ভব অবস্থাসমূহ ছেড়ে দেয়া আল্লাহর নিয়ম। এরূপ অস্বাভাবিক অবস্থার মুখোমুখী হলে সাধারণ হুকুম হুবহু প্রয়োগ করার পরিবর্তে হুকুমের প্রকৃতি বদলিয়ে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সঠিক পদ্ধতিতে পুরা করাই হলো বিবেক-বিবেচনার দাবী। যেমন, আল্লাহ তাআলা রোযার জন্য সুস্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন, ফজর সময় হতেই রোযার সূচনা আর রাতের সূচনা হতেই' ইফতারের সময় হয়ে যায়। যথা-

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود
من الفجر- ثم اتموا الصيام الى الليل-

এই নির্দেশ ভূপৃষ্ঠের সেসব এলাকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে দিবা-নিশির ঘূর্ণয়ন ২৪ ঘন্টার মধ্যে পূর্ণ হয়ে থাকে। হুকুমটি এ আকারে বর্ণনা করার কারণ হলো ভূপৃষ্ঠের অধিকাংশ লোক এসব এলাকায় বাস করে থাকে। উত্তর মেরুর নিকটবর্তী এলাকা যেখানে রাতদিনের অবস্থান কয়েক মাসব্যাপী, সেখানেও এ নির্দেশ হুবহু প্রয়োগ করতে যাওয়া চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

এসব বিশেষ এলাকায়ও ফজর সময় হওয়ার সাথে সাথে রোযার সময় শুরু হয়ে যাওয়া এবং রাত হলেই তা শেষ হয়ে যাওয়া অথবা সেখানে আদৌ রোযা রাখা হবে না বলা কোনো ক্রমেই সঙ্গত হবে না। এমন ক্ষেত্রে হুকুমের বাহ্যরূপের পরিবর্তে এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কোনো যথার্থ উপায়ে পূরণ করাই হবে বিবেকের দাবী। যেমন, ভূপৃষ্ঠের অধিকাংশ আবাদিতে পালনীয় রোযার সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি সময় সেখানকার জন্যে নির্ধারণ করে নেয়া। আমার মতে একদেহীভূত দু'টি মেয়ের ব্যাপারে এ ধরনের নীতি গ্রহণ করা

www.pathagar.com

উচিত। তাদের বিয়ে দু'জন পুরুষের সাথে দেয়া কিংবা আদৌ বিয়ে না দেয়ার প্রস্তাবনা আমার মতে ভুল সিদ্ধান্ত। সুতরাং হওয়া উচিত এই যে,কুরআনের أن تجمعوا بين الأختين নির্দেশের বাহ্যিকরূপ ছেড়ে দিয়ে শুধু এর উদ্দেশ্য পুরা করা কর্তব্য।

এ হুকুমের মূল উদ্দেশ্য হলো–সতীনসুলভ পারস্পরিক কলহ বিবাদের হাত থেকে দু'বোনকে রক্ষা করা। এ ক্ষেত্রে অবস্থা যেহেতু এই যে, উভয়ের বিয়ে হয় একজনের সাথেই হতে হবে, নতুবা কারো সাথেই নয়। সুতরাং বিষয়টি দু'বোনের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয়া উচিত যে, তারা উভয়ে একজনের সাথে একত্রে বিয়ে বসতে সম্মত, নাকি জীবনের তরে কৌমার্যাবস্থা বরণ করে নিতে প্রস্তুত? অতএব, তারা যদি প্রথমাবস্থা গ্রহণ করে, তবে এমন ব্যক্তির সাথে তাদের বিয়ে দেয়া উচিত, যে এদের পসন্দ করে। পক্ষান্তরে তারা যদি দ্বিতীয় প্রস্তাব গ্রহণ তথা আজীবন অবিবাহিত থাকার পক্ষে রায় দেয়, এমতাবস্থায় আমরা যেমন দায়মুক্ত,তদ্রূপ আল্লাহর বিধানও।" (তর্জুমানুল কুরআন খঃ ৪৩, সংখ্যাঃ ২ নভেম্বর, ১৯৫৪ ইং)

এই হল সেই জবাব, উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরে যা মাওলানা মওদূদী (র) মুলতান কারাগার থেকে লিখে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু কোনো কোনো সুবিধাবাদী মহল এবং নেতৃত্বাভিলাষী চক্র নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ও ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে যাকে বিকৃতি ও মিথ্যা রং চড়িয়ে জনগণের সামনে পেশ করছে। বস্তুতঃ এর অন্তরালে এ সকল হযরতদের অপর মহৎ (!) উদ্দেশ্যটি হল–মাওলানা মওদূদীর (র) প্রতি জনমন বিষিয়ে তোলা এবং তাঁর সম্পর্কে সরলপ্রাণ মুসলমানদের মনে বিদ্বেষ ভাবের স্থায়ী অনুভূতি জিইয়ে রাখা।

ব্যক্তিগত অভিমত

এই জবাব সম্পর্কে আমাদের ব্যক্তিগত অভিমত হলো, সত্যানুসন্ধানী দৃষ্টিতে নিরপেক্ষ মন নিয়ে যদি মাওলানার জবাবের ওপর চিন্তা করা যায়, তাহলে এঁর বিরোধিতায় বড়জোর এতোটুকু বলা যায় যে, মাওলানার এই ইজতিহাদ সঠিক নয় এবং সঠিক না হওয়ার কারণ এগুলো। কিন্তু একজন আল্লাহভীরু এবং সত্যপ্রিয় আলেম এমন কথা বলার দুঃসাহস দেখাতে পারেন না যে, মাওলানার এ জবাব গোমরাহী অথবা কুরআনের হুকুমের ইচ্ছাকৃত বিকৃতি। কারণ, ইজতিহাদী মাসআলা, দলীলসমূহের ব্যাখ্যা এবং শরঈ

www.pathagar.com

আহকামের প্রয়োগ প্রক্রিয়ায় যদিও প্রত্যেক আলেম অপর আলেমের সাথে ইজতিহাদ ও তাত্ত্বিক অভিমতে মতপার্থক্য করতে পারেন তথাপি শুধুমাত্র ভিন্নমত পোষণ করার কারণে কাউকে গোমরাহ কিংবা কুরআন বিকৃতকারী বলা যায় না। যাদের অন্তর আল্লাহর ভয় শূণ্য, আখেরাতে জবাবদিহি সম্পর্কে যারা অবচেতন কেবল তাদের মুখেই এ ধরনের কথা শোভা পেতে পারে। কিন্তু কোনো আল্লাহভীরু ও সত্যাশ্রয়ী আলেম নিছক মতপার্থক্যের ওপর ভর করে অপরকে গোমরাহ কিংবা কুরআন বিকৃতকারী চিহ্নিত করার দুঃসাহস দেখাতে পারেন না। অথবা এ কাজ কেবল তারই শোভাপায় যিনি কাউকে বদনাম করার উদ্দেশ্যে সত্য ঘটনার উপর বিকৃতির রং চড়িয়ে উপস্থিত করতে অভ্যস্ত। কিন্তু যারা ইসলামের বৈবাহিক বিধান সম্পর্কে অবগত এবং শরীয়তের বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ চিনতেও পারদর্শী তাদের জন্যে মাওলানার এই জবাবের বিশ্লেষণ যদিও নিস্প্রয়োজন, তথাপি অধিক স্বচ্ছ ও স্পষ্ট করার মানসে জনসাধারণের মনের আকুলতা নিরসনের অভিপ্রায়ে নিম্নবর্ণিত ভাষায় উক্ত জবাবের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা পেশ করা হচ্ছে। প্রদত্ত জবাবের তত্ত্বকথা জনগণের কাছে যেন স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হয়ে উঠে এবং মিথ্যা প্রচারণার ধূম্রজালে প্রভাবিত হওয়া থেকে নিরীহ জনতার যেন রক্ষা পাওয়ার উপায় হয়।

ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ

একদেহী দু'সহোদরার বিয়ে সংক্রান্ত মাওলানার (র) জবাবটি উল্লেখযোগ্য দু'টি তত্ত্বের ওপর ভিত্তিশীল। প্রথমত তত্ত্বদ্বয়ের ভুল ও নির্ভুলতা সম্পর্কে অবগত না হওয়া পর্যন্ত জবাবটি ঠিক কি বেঠিক তা নির্ণীত হওয়া সম্ভব নয়। তাই তত্ত্ব দু'টির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা পেশ করা হচ্ছে। এদ্বারা জবাবের ভ্রান্তি কিংবা অভ্রান্তি আনায়াসে ফুটে উঠবে।

প্রথম তত্ত্ব

আল্লাহর বিধানমতে এই একদেহী সহোদরাদ্বয়ও অপরাপর সাধারণ মেয়েদের ন্যায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার হকদার। যদি তাদেরকে এ থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত রাখা হয়, তাহলে এটা হবে একদিকে অবিচার অন্যদিকে এর ফলে আল্লাহর বিধানের ওপর অভিযোগ আনা অনিবার্য হয়ে ওঠে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় তত্ত্ব

ان تجمعوا بين الاختين কুরআনের এই নির্দেশটি যদিও বাহ্যত অনির্দিষ্ট ও ব্যাপকার্থবোধক। কিন্তু এর প্রয়োগ ক্ষেত্র হবে সাভাবিকভাবে স্বতন্ত্রদেহী এমন দু'সহোদরা যারা পৃথক সত্ত্বা, পৃথক দেহ ও অস্তিত্ব নিয়ে বিচরণশীল। কেননা আল্লাহর নিয়ম হলো সাধারণ ও ব্যাপক ঘটিত অবস্থা ও ঘটনাসমূহের জন্যে আহকাম বর্ণনা করা এবং কদাচিত, দৈবাৎ ও অস্বাভাবিক ঘটনাকে এড়িয়ে যাওয়া। একাঙ্গীভূত হয়ে দু'সহোদরা বোনের জন্মলাভ ' একটি বিরল ও অস্বাভবিক ঘটনা। সুতরাং নিয়ম অনুযায়ী ঘটনাটি কুরআনী বিধানের প্রয়োগমহল না হওয়া উচিত। তদুপরি কুরআনের সাধারণ নির্দেশ এ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করাও সমীচীন নয়।

এই দু'টি তত্ত্বই জবাবের ভিত্তিমূল। দু'টির একটিও শরঈ বিধানের খেলাফ কিংবা পরস্পর বিরোধী নয়, এটা প্রমাণের উদ্দেশ্যে আমরা তত্ত্ব দ্বয়ের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করতে চাই।

প্রথম তত্ত্বের ব্যাখ্যা

এটা এক স্বীকৃত ও অনস্বীকার্য সত্য যে, ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ "আইনসিদ্ধ হওয়ার" বহুবিধ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে চারিত্রিক হেফাজত অন্যতম। এ অর্থের দিকে লক্ষ্য করেই ইসলামের পরিভাষায় বিয়ের একাধিক নামের মধ্যে احصان। "বা দুর্গ" নামটি গুরুত্বসহকারে বাছাই করা হয়েছে। কেননা বিবাহ স্বামী স্ত্রীর জন্যে একটি চারিত্রিক দূর্গ ও বেষ্টনী বিশেষ, যেখানে অবস্থান করে উভয়ই নিজেদের চরিত্র রক্ষা করতে সক্ষম হয়। এই গুরত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন করার অভিপ্রায়ে ইসলাম কোনো ব্যতিক্রম ছাড়া গোটা নারী জাতিকে নিজেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অধিকার দিয়েছে অথবা বৈধ উপায়ে এবং সাম্ভাব্য পন্থায় এই কর্তব্য আদায় করার দায়িত্ব অভিভাবকদের ওপর আরোপ করেছে। ইসলাম কোনো নারীকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করেনি কিংবা এর সুফল থেকে কাউকে বাদও দেয়নি। সুতরাং এক দেহী দু'সহোদরা বোনও অন্যান্য নারীদের মতো চরিত্র হেফাজত করার এই আইনানুগ সুযোগের অধিকারীনী। কারণ শরীয়তের দৃষ্টিতে একজন সাধারণ নারীকে চরিত্র রক্ষা করা, জৈবিক ও চারিত্রিক কারণে বিবাহ বন্ধুনে আবদ্ধ হওয়া, অনৈতিকতার ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে

www.pathagar.com

নিজকে ও সমাজকে রক্ষা করা যেমন জরুরী, তদ্রূপ একদেহী দু'সহোদরার চরিত্র রক্ষা করে সমাজকে পাক পবিত্র রাখাও জরুরী। এ কারণেই ইসলামের পরিবারিক ও বৈবাহিক আইনে অভিভাবকদেরকে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, তারা যেন অবিবাহিত নারী–পুরুষদের সাম্ভাব্য পন্থায়, বৈধ উপায়ে বিয়ের ব্যবস্থা করে দেন। এই বিধানের আওতা থেকে কোনো নারীকেই বাদ দেয়া হয়নি। আল্লাহর বাণী

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

"তোমাদের মধ্যে যারা বিধবা অথবা অবিবাহিত পুরুষ কিংবা নেককার ক্রীত–দাসদাসী আছে তাদের সকলের জন্যে বিবাহের ব্যবস্থা কর।"

(সূরা নূর, ৩২ আয়াত)

এই আয়াতের তাৎপর্যে চিন্তা করলে বিধবা ايامى শব্দের ব্যাপকতায় সেসব মেয়েলোক শামিল বুঝা যায় যারা স্বামী হারা। একদেহী অথবা স্বতন্ত্রদেহী সব ধরনের মেয়েরাই এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। ايامى। শব্দটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে কুরআনের আলোকে একদেহীভূত মেয়েরাও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অধিকার রাখে এবং স্বাভাবিক মেয়েদের ন্যায় তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করাও অভিভাবকদের কর্তব্য।

অপর একটি আয়াত

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ
الْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ - وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ
لَا تَعْلَمُونَ - (البقرة: ٢٣٢)

"মেয়ে পুরুষ উভয় যখন যথানিয়মে পরস্পর বিয়ে করতে রাজী হয় তখন তোমরা তাদেরকে এতে বাধা দিয়ো না। যদি তোমরা আল্লাহর ও আখিরাতের ওপর ঈমান রাখো তাহলে এ ধরনের পদক্ষেপ না করার জন্যে তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। এ থেকে বিরত থাকাই তোমাদের জন্য সবচেয়ে পরিমার্জিত ও সর্বাধিক পবিত্র পদ্ধতি। আল্লাহ্ জানেন কিন্তু তোমরা জানো না।" (বাকারাঃ ২৩২)

www.pathagar.com

আয়াতটিতে অভিভাবকদেরকে স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তোমাদের মধ্যকার কোনো স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পরে বিয়ে করতে রাজী হলে সে বিয়েতে তোমাদের বাধা দেয়া উচিত নয় যদিও এটা তোমাদের খুবই অপসন্দনীয় ও অবজ্ঞেয় হয়। কারণ তাতে একদিকে আইনানুগ অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হবে; অপরদিকে পুরুষ ও মেয়েলোকটির মধ্যে পারস্পরিক মিল মহব্বতের কারণে গোপনে যৌন সম্পর্ক স্থাপনে নিমজ্জিত হওয়ার ও যথেষ্ট আশংকা থাকে। আর এরূপ তৎপরতা বংশীয় মান-মর্যাদায় কালিমা লেপনের কারণ হওয়া বলাই বাহুল্য। এ কারণেই বলা হয়েছে ذلك ازكى لكم واطهر والله يعلم وانتم لاتعلمون এই আয়াতেও একদেহী মেয়ে এবং স্বতন্ত্রদেহী স্বাভাবিকভাবে জন্মলাভকারী মেয়ের মধ্যে মূলত কোনো পার্থক্য করা হয়নি।

একটি হাদীস

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলীকে (রাঃ) বিবাহ সম্পর্কে উপদেশ দেন। নবীর বলার উদ্দেশ্য ছিল-সময় মতো তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করা উচিত। অলসতা ও বে-পরওয়া হওয়া এ ক্ষেত্রে মারত্মক ও বিপজ্জনক প্রমাণিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। সুতরাং তাদের বিবাহের ব্যাপারে তোমরা টালবাহানা করো না, কালক্ষেপন করো না। কেননা তাতে মেয়েটি অধীর হয়ে অবৈধ যৌন কাজে লিপ্ত হয়ে সমাজে অশান্তি সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। হাদীসটির ভাষা নিম্নরূপঃ

ثلث لا تؤخرهن يا على-الايم اذا وجدت لها كفوا... الحديث

"আলী! তিনটি কাজ সময় হওয়ার সাথে সাথেই সম্পন্ন করা উচিত। স্বামী হারা স্ত্রীর সমকক্ষতা পাওয়া মাত্রই তাকে পাত্রস্থ করা উচিত.................।"

এই হাদীসে الايم শব্দটি ব্যাপকার্থে প্রয়োগ হওয়াতে সাধারণ ও স্বাভাবিক মেয়েদের ন্যায় একদেহী মেয়েরাও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধা হওয়ার অধিকার রাখে এবং অভিভাবকগণ তাদের বিয়ের ব্যাপারে অযথা বিলম্ব না করে সময় হতেই বিবাহের ব্যবস্থা করা উচিত।

কুরআন-হাদীসের উপরোক্ত দলীলের ভিত্তিতে একদেহীভূত মেয়েরাও স্বতন্ত্রদেহী মেয়েদের ন্যায় বিয়ে করার অধিকারীনী এবং তাদেরকে বিবাহ

www.pathagar.com

থেকে বঞ্চিত করার কোনোই যুক্তিসংগত কারণ নেই। বঞ্চিত করতে গেলে তাদের ওপর অবিচার করা হবে, পরন্তু আল্লাহর আইনের প্রতিও অভিযোগ আসার পথ প্রশস্ত হবে।

দ্বিতীয় তত্ত্বের ব্যাখ্যা

ان تجمعوا بين الاختين আয়াতে কুরআনের এই নির্দেশ থেকে একদেহী দু'সহোদরাকে ব্যতিক্রম মনে করার দাবী করা হয়েছে। কেননা "আল্লাহর নিয়ম হলো সাধারণ অবস্থার জন্যে আহকাম বর্ণনা করা এবং কদাচিত ও দৈবাতের ঘটনা বাদ দেয়া।" এখন এর বুনিয়াদ ও মূলনীতির ব্যাখ্যা হওয়া দরকার যে, কুরআনী হুকুম স্বাভাবিক ও ব্যাপক ঘটিত বিষয়ে বর্ণিত হয়। আর বিরল ঘটনা এর অন্তর্ভুক্ত থাকে না। পবিত্র কুরআন এ মূলনীতি স্বীকার করে কি না, শরীয়ত বিষয়ে পারদর্শী ওলামা এবং ফকীহগণের অভিমত কি? তাও যাচাই হওয়া দরকার। নিম্নে এ আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হতে চাই। এতে স্বতই প্রমাণিত হবে যে, একদেহীভূত দু'সহোদরা কুরআনের উপরোক্ত হুকুম থেকে ব্যতিক্রম হওয়া যুক্তিযুক্ত ও বিজ্ঞান সম্মত।

কুরআনী আহকাম এবং ব্যতিক্রম

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের শিক্ষা নিয়ে চিন্তা করা হলে একথা পরিষ্কার জানা যায় যে, কুরআনের হুকুম আহকাম সাধারণভাবে ব্যাপক ও বহুল ঘটিত অবস্থার জন্যে হয়ে থাকে। দৈবাৎ ও কদাচিত অবস্থায় আহকাম পৃথক ও ভিন্ন আকারে বর্ণিত হয়। মোটকথা কদাচিত ও বিরল অবস্থা কুরআনের সাধারণ হুকুমের ব্যতিক্রম। এ বিষয়ে অসংখ্য উদাহরণ থাকলেও এখানে মাত্র দু'টি উদাহারণ পেশ করাই আমরা যথেষ্ট মনে করি।

প্রথম উদাহরণ

কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় তিনটি জিনিসকে অকাট্যভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। ১) মৃত জন্তু ২) প্রবাহিত রক্ত ৩। খিনযীর বা শূকর। ইরশাদ হচ্ছেঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ

"মৃত জানোয়ার, রক্ত এবং শূকর তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে।"

www.pathagar.com

তদুপরি আমরা দেখতে পাই অস্বাভাবিক অবস্থার মুখোমুখী হলে এই সাধারণ হুকুম প্রযোজ্য না হয়ে তজন্য স্বতন্ত্র হুকুম প্রযোজ্য হয়ে থাকে। সুতরাং কুরআনই আমাদেরকে অসহায় ও অপারগ অবস্থায় অবৈধ ও হারাম জিনিস প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করার অবকাশ দিয়েছে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এতে কোনো ক্ষতি নেই। কুরআনের ঘোষণাঃ

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ (البقره: ١٧٣)

"কিন্তু অবাধ্যতা ও সীমাতিক্রম করার উদ্দেশ্য না নিয়ে অপারগ ও বাধ্যগত অবস্থায় এসব জিনিসের ব্যবহার করলে তাতে কোনো গুনাহ হবে না।"
(বাকারা, ১৭৩ আয়াত)

অন্যত্র আছে

فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ - (المائده: ٣)

অনন্তর যে ব্যক্তি তীব্র ক্ষুধায় অস্থির অপারগ অবস্থায় সেসব নিষিদ্ধ জিনিস ব্যবহার করে তাহলে আল্লাহ্ অতি মেহেরবান এবং দয়ালু। কিন্তু শর্ত হলো এতে তার হৃদয় পাপাচারে আকৃষ্ট না হওয়া।
(সূরা মায়েদাঃ ৩ আয়াত)

অন্য এক জায়গায় আছে, এসব জিনিস অপারগ অবস্থায় আদৌ হারাম নয়–

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

অথচ আল্লাহ সে সকল জীবের বিস্তারিত বর্ণনা উল্লেখ করে দিয়েছেন, যেগুলো তোমাদের জন্যে (ইতিপূর্বে) হারাম ঘোষণা করেছিলেন; কিন্তু অপারগ ও একান্ত প্রয়োজন মূহূর্তে সেগুলোও (তোমাদের জন্যে) হালাল (বিবেচিত হতে পারে) (সূরা আনআম, ১১৯ আয়াত)

এসব আয়াতে সুস্পষ্টভাষায় বলা হচ্ছে, কুরআনের সাধারণ আহকাম কতিপয় দৈবাৎ ঘটনা ও কদাচিত অবস্থা থেকে ব্যতিক্রম হতে পারে। সাধারণ ও স্বাভাবিক অবস্থার জন্যে যেসব বিধি–নিষেধ রয়েছে সেগুলি হুবহু অস্বাভাবিক অবস্থায়ও প্রয়োগ হওয়া জরুরী নয়।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় উদাহরণ

এভাবে সাধারণ অবস্থায় শির্ক সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশ হলো, শির্ক সম্পূর্ণরূপে হারাম এবং অমার্জনীয় অপরাধ। এতে আগে অর্জিত সমস্ত আমল বরবাদ ও নষ্ট হয়ে যায়। এরশাদ হলোঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ۔ (النساء: ١١٦)

"আল্লাহ তায়ালা শির্ক গুণাহ মাফ করেন না। শির্ক ছাড়া অন্য গুণাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন।" (সূরা নিসা, ১১৬ আয়াত)

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ۔

"যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে তার জন্যে আল্লাহ তায়ালা জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন।" (সূরা মায়েদা, ৭১ আয়াত)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মুমিনের জন্যে শির্ক গুণায় জড়িয়ে পড়া জায়েয নেই। যদিও সে সাংঘাতিক বিপর্যয় অবস্থার মুখোমুখী হয়।"

নবীর বাণীটি নিম্নরূপঃ لا تشرك بالله شيئا وان قتلت اوحرقت ۔ الحديث

"নিহত হওয়া কিংবা আগুণে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ভয় থাকলেও তোমরা আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক করো না।" (হাদীস)

আয়াত ও হাদীসে যে শির্কের কথা বলা হয়েছে তাতে সাধারণ শির্ক উদ্দেশ্য। সেটা চাই মৌখিক হোক কিংবা আন্তরীক এ কারণেই অপারগ-অক্ষম অবস্থায় কেউ মৌখিক শির্ক করা থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে মৃত্যুবরণ করলে সে শাহাদতের মর্যাদা পাবে। আর স্বাভাবিক ও স্বাধীন অবস্থায় মৌখিক শির্ক করাও অমার্জনীয় অপরাধ। কিন্তু এরপরও আমরা দেখতে পাই কতিপয় বিরল অবস্থা ও ঘটনাকে এই সাধারণ হুকুম থেকে ব্যতিক্রম বা বহির্ভূত ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন, প্রাণনাশের নিশ্চিত আশংকা দেখা দিলে সে সময় নিজের জান বাঁচানোর জন্যে মুখে শির্কের শব্দ উচ্চারণ করার অনুমতি স্বয়ং কুরআনেই রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ

www.pathagar.com

"তবে যাকে বাধ্য বা জবরদস্তী করা হয় এমতাবস্থায় যে, তার অন্তর ঈমানের ওপর অত্যন্ত মজবুত ও দৃঢ় থাকে।"

একজন লোক সত্যানুসন্ধানী হয়ে এসব আয়াতের ওপর চিন্তা করলে এসত্য সকলের কাছে দিবা-লোকের ন্যায় উদ্ভাসিত হয় যে, সাধারণ ও স্বাভাবিক অবস্থায় যেসব হুকুম-আহকাম প্রযোজ্য না হওয়ার নীতি স্বয়ং কুরআনই স্বীকার করেছে। বরং স্বাভাবিক ও সাধারণ অবস্থায় এক ধরণের হুকুম প্রয়োগ হলে অস্বাভাবিক অবস্থায় অন্য ধরণের হুকুম বাস্তবায়ন হতে পারে। অন্যথায় মৃত জানোয়ার, শূকর ইত্যাকার হারাম জিনিস অপারগ ও বাধ্যগত অবস্থায় খাওয়া হালাল হতোনা এবং অপারগ অবস্থায় মৌখিক শির্ক করাও জায়েজ হতোনা।

ফকীহগণও এ নীতি সমর্থন করেছেন

উপরোক্ত আলোচনার পর ইসলামী শরীয়তের অভিজ্ঞ আলেম ও ফকীহগণের এ সম্পর্কিত দৃষ্টিভংগী কি এবং তাঁরাও এ নীতি গ্রহণ করেছেন কি না? সেটাও লক্ষ্যণীয় ব্যাপার। সুতরাং আমরা যখন তাঁদের রচিত গ্রন্থরাজির প্রতি দৃষ্টি দেই তখন আলেম ও ফকীহগণ এই নীতি গ্রহণ করেছেন বলেই প্রমাণিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ দু'টি ঘটনা আমরা নিম্নে উল্লেখ করছি। তাতে এ বিষয়ে ফকীহদের দৃষ্টিভংগী স্বচ্ছ হয়ে আমাদের কাছে ফুটে উঠবে।

প্রথম উদাহরণ

পাঁচওয়াক্ত নামায ও বুলগেরিয়াবাসী[১]

অন্যান্য ফরযের ন্যায় সমগ্র মুসলমানদের ওপর দিনরাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায অপরিহার্য ফরয। একথায় কুরআন ও হাদীস উভয়ই এক ও একক। আলেমদের দৃষ্টিতে এর অপরিহার্যতা এতো অকাট্য ও সুদৃঢ় যে, গোটা উম্মতের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নামায অস্বীকারকারী ইসলামের গন্ডীর ভিতর থাকতে পারে না এবং এক মিনিটের জন্যও মুমিন দাবী করতে পারে না।যথা

---

১. দক্ষিণ মেরুর একটি দেশ যেখানে ৬ মাস পর্যন্ত একাধারে রাত থাকে।

১০

www.pathagar.com

اجمع المسلمون علی ان کل من وجبت علیه صلوة
من المکلفین ثم ترکها جاحدًا لوجوبها کفر۔ (عنایه شرح
ہدایہ ج ۱ ص ۱۶۱ - میزان الشعرانی ج ۱ ص ۱۴۱)

"অর্থাৎ গোটা উম্মতে মুসলীমার সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত যে, নামাযের ফরয অস্বীকারী ব্যক্তি কাফের–বেঈমান।"

(ইনায়াহ, শরহেহিদায়াহ, ১ম খন্ড, ১৬১ পৃঃ
শা'রানী রচিত মীযানঃ ১ম খন্ড, ১৪১ পৃঃ)

পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার এই হুকুম কোনো নির্দিষ্ট ভূমি বা দেশের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, বরং গোটা দুনিয়াবাসীর সাথে সম্পৃক্ত। কুরআন সারা দুনিয়ার মুসলমানের জন্যে হুকুম দিয়েছেঃ-

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى

"সব নামাযের হেফাজত (আদায়) কর বিশেষত মধ্যম সময়ের

এর ব্যাখ্যায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ

خمس صلوات فی الیوم واللیلة افترضهن الله علی العباد

আল্লাহ্ তায়ালা বান্দার ওপর রাতদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা ফরয করে দিয়েছেন। ইসলামের ফকীহগণও নবী আলাইহিস সালামের এই বাণীর ওপর ভিত্তি করেই নিজেদের রায় প্রদান করেছেন। শায়খ ইবনে হুমাম হানাফী (র) বলেন, শবে মিরাজে পাঁচ ওয়াক্ত নামায গোটা দুনিয়াবাসীর জন্যে ফরয করা হয়েছে কোনো নির্দিষ্ট জায়গা এই নির্দেশের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। আবার কোনো দেশের অধিবাসী এই নির্দেশের বহির্ভূত নয়। তিনি লিখেছেন -

فرض الله الصلوات خمسًا بعد ما امر اولا بخمسين ليلة الاسراء ثم
استقر الامر علی ذالك الخمس شرعا عاما لاهل الآفاق لا تفصيل فيه بين
قطر وقطر۔ (فتح القدير بحواله شامی ج ۱ ص ۲۳۴)

"মিরাজ রাতে ৫০ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়েছিল। পরে শিথিল করে আল্লাহ্ তায়ালা তা পাঁচ করে দেন। সারা বিশ্ববাসীর জন্যে এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায সাধারণভাবে ফরয ঘোষিত হয়। এই সাধারণ ঘোষণায় কোনো জায়গা ও দেশকে ব্যতিক্রম বা নির্দিষ্ট করা হয়নি। বিশ্ববাসী মানুষের মধ্যে কোনো পার্থক্যও করা হয়নি।"

www.pathagar.com

এতদসত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই অভিজ্ঞ আলেমগণ বিশেষ কোনো দেশবাসীকে এহেন অকাট্য দলীল প্রমাণিত কোনো কোনো ফরজ নামায থেকে অব্যাহতি লাভের ফতওয়া দিয়েছেন। এবং বলেছেন, কোনো কোনো নামায তাদের উপর ফরয নয়। তাদেরকে এই সাধারণ নির্দেশের বহির্ভূত রাখার ভিত্তি হলো- নামায ফরয হওয়ার শর্ত সময় হওয়ার অনুপস্থিতি। সুতরাং এরি প্রেক্ষিতে বুলগেরিয়াবাসীদের উপর ইশার নামায ফরয কিনা এ ব্যাপারে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। ইমাম বাককালীর (র) মতে বুলগেরিয়াবাসীদের ওপর ইশার নামায ফরয নয়। ইমাম হলওয়ানী (র) যদিও প্রথমত ইমাম বাককালীর (র) বিরোধিতা করেছেন কিন্তু পরে মত পরিবর্তন করে ইশার নামায ফরয না হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। শামীর ১ম খন্ড, ৩৩৬ পৃষ্ঠায়, ফতহুল কাদীর, কবীরী ইত্যাদি ফিকাহ গ্রন্থে এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ রয়েছে। ইচ্ছা করলে যে কেউ দেখে নিতে পারেন।

এবার আপনারাই বলুন। বুলগারিয়াবাসীদের ওপর ইশার নামায ফরয না হওয়ার ফতওয়া দিয়ে সুদৃঢ় ও অকাট্য হুকুম থেকে ব্যতিক্রম করা অস্বাভাবিক ও বিরল অবস্থায় হয়েছে কি হয়নি? যদি হয়ে থাকে তাহলে মানতেই হবে যে, সাধারণ ও স্বাভাবিক অবস্থায় প্রযোজ্য হুকুম অস্বাভাবিক ও বিরল অবস্থায় প্রযোজ্য না হওয়ার নীতি ফকীহগণও স্বীকার করেছেন। তদুপরি তারা এও মেনে নিয়েছেন যে, বিরল অবস্থার হুকুম ভিন্নতর হওয়াই সঙ্গত। সুতরাং এ নীতি গোমরাহী কিংবা ফাসেকী নয়। বরং এটাই হলো আলেম ও ফকীহদের অনুসৃত চিরাচরিত নীতি।

দ্বিতীয় উদাহরণ

পবিত্রতা লাভে অক্ষম ব্যক্তির নামায-

কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ, অযু করে পাক হওয়া নামাযের জন্য একটি অপরিহার্য শর্ত। অযু ছাড়া নামায পড়ার অনুমতি নেই এবং তাতে নামায শুদ্ধ হবে না। এমনকি কতিপয় ফকীহ ইচ্ছাকৃতভাবে অযু ব্যতিরেকে নামায পড়াকে কুফরী বলেছেন। (দোর্রে মুখতারঃ ১ম খন্ডঃ ২৩ পৃষ্ঠা)

অযু করে পবিত্রতা হাসিল করার শর্ত কুরআন-হাদীসের সম্মিলিত ফয়সালা। কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

www.pathagar.com

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ الخ

"যখনই তোমরা নামাযের জন্যে দাঁড়াবে মুখ ধৌত করবে এবং কনুই পর্যন্ত হাত ধুয়ে নিবে........."।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ مفتاح الصلوٰة الطهور

"পবিত্রতা নামাযের চাবি।" আরো বলা হয়েছে لا تقبل صلوٰة بغير طهور

"পবিত্রতা ব্যতীত নামাজ গ্রহণীয় ও সহীহ হবে না।"

এতদসত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই, ফকীহগণ কতিপয় অস্বাভাবিক ও বিরল অবস্থায় অযূ ব্যতিরেকে নামায পড়াকে জায়েয বলে ফত্ওয়া দিয়েছেন। এদ্বারা স্পষ্টত প্রমাণ হয়- ফকীহগণ "কুরআনের স্বাভাবিক নিঃশর্ত বিধান স্বাভাবিক, ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আর বিরল ঘটনার জন্যে ব্যতিক্রমধর্মী বিধানের বৈধতা" নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছেন। এর সমর্থনে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে।

দুরে মুযতাবের ১ম খন্ডে ২৩২ পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছেঃ

পবিত্রতা হাসিলে অক্ষমের প্রথম প্রকার-

والمحصور فاقد الطهورين بان حبس في مكان نجس ولا يمكنه اخراج تراب
مطهر وكذا العاجز عنهما لمرض يؤخرها عنده وقالا يتشبه بالمصلين وجوبا
فيركع ويسجد ان وجد مكانا يابسا والا يؤمي ايماء ثم يعيد به يفتى واليه صح رجوعه الخ

যাকে অপবিত্র জায়গায় আটক করে রাখা হয়েছে তার পাক মাটী পাওয়ার সুযোগ নেই, একইভাবে রোগের কারণে অযূ বা তায়াম্মম করতে অক্ষম এই উভয় ব্যক্তির فاقد الطهورين তথা পবিত্রতা হাসিলে অপারগ হিসাবে গণ্য। ইমাম আবূ হানীফার (র) মতে এর দু'জনেই নামায পরে পড়বে অর্থাৎ, পবিত্রতা হাসিলের চেষ্টা ও অপেক্ষায় শেষ ওয়াক্তে নামায আদায় করবে। আর তাঁর দু' শাগরিদ ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদের মতে তারা নামাযীদের সাদৃশ্যতা গ্রহণের উদ্দেশ্যে অবশ্যই নামায পড়বে; জায়গা পেলে রুকূ ও সেজদা করবে। আর না পেলে ইশারা ইংগীতে পড়বে। কিন্তু পরে নামায পুনরায় পড়ে নিবে। এরি উপর ফতওয়া এবং ইমাম আবূ হানীফা (র) পরবর্তীতে এমতই গ্রহণ করেছেন।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় প্রকার

অযু ব্যতীত নামায পড়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং পরে কাযা করাও জরুরী নয়- নিম্নোক্ত বাক্যে এমন মতের উল্লেখও লক্ষ্য করা যায়ঃ

مقطوع الرجلين واليدين اذا كان فى وجهه جراحة

يصلى بغير طهارة ولا يتيمم ولا يعيد على الاصح درر

যার উভয় হাত পা কাটা এবং মুখে আঘাত,সে অযু ও তায়াম্মুম ব্যতিরেকেই নামায পড়তে পারবে। বিশুদ্ধ মতে তার নামায কাযাও করতে হবে না। (দুররুল মুখতার)

এখানে সব ধরনের পবিত্রতা ব্যতীত নামায পড়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং নামায কাযা করারও নির্দেশ নেই। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এ জাতীয় নামায শরীয়তে গ্রহণযোগ্য। এ ব্যাখ্যার অন্তরালে নিশ্চিত প্রমাণ রয়েছে যে, অস্বাভাবিক ও জরুরী অবস্থায় সাধারন অবস্থায় গৃহীত নীতি প্রযোজ্য নয় এবং এই নীতি আলেম ও ফকীহদের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ও গৃহীত অভিমত। জরুরী অবস্থার জন্যে সাধারণ অবস্থা থেকে ভিন্নতর কোনো হুকুম প্রযোজ্য হতে পারে। সুতরাং একদেহী দু'সহোদরের ব্যাপারে মাওলানা মওদূদীর (র) পেশকৃত অভিমতে মতপার্থক্য থাকা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। কিন্তু তাই বলে অভিমতটিকে গোমরাহী কিংবা জেনে শুনে কুরআনের বিকৃতি বলা কিছুতেই ঠিক হতে পারে না। মাওলানা মওদূদীর (র) অভিমতের ওপর কোনো কোনো ইলমী মহল থেকে যেসব অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে সেগুলি এবার আমরা পেশ করতে আগ্রহী। পরবর্তীতে এর জবাব উল্লেখ করা হবে।

অভিযোগ

মাওলানা মওদূদীর (র) উপরোক্ত জবাবের ওপর কোনো কোনো বুযুর্গ অভিযোগ উত্থাপিত করে বলেছেন, মাওলানা মওদূদীর (র) এই জবাব "একদেহী দু' সহোদরা কোনো একজন পুরুষের সাথে একই সময়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে" কুরআনী বিধানের সুস্পষ্ট বিরোধী। এ দ্বারা একই সময়ে দু'সহোদরা বোনকে এক ব্যক্তির একত্রে বিবাহ করা হারাম বুঝা যায়। অথচ তাঁর জবাবে সেটাই পরিদৃষ্ট হয়। পরন্তু দু' সহোদরা বোনকে একই সময় এক ব্যক্তির বিবাহ করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত উম্মত এক ও অভিন্ন

www.pathagar.com

মত পোষণ করে। মাওলানার (র) জবাবটি এদিক থেকে ইজমার খেলাফ ও পরিপন্থী। সুতরাং এ জবাব কিছুতেই সঠিক ও নির্ভুল হতে পারে না। বরং জ্ঞাতসারে কুরআনী হুকুমের বিরোধিতা হিসেবেই গণ্য হতে পারে।

তিনটি জবাব

এই অভিযোগের কয়েকটি জবাব দেয়া যায়ঃ যার প্রথম জবাব হল ঃ মাওলানা মওদূদীর (র) দেয়া জবাব ان تجمعوا بين الاختين আয়াত বিরোধী বলার সপক্ষে প্রথমত প্রমাণ করতে হবে যে, কুরআনের এই নির্দেশটি অস্বাভাবিক, জরুরী ও বিরল অবস্থায়ও প্রযোজ্য এবং একদেহীভূত দু'সহোদরা ان تجمعوا بين الاختين কুরআনের এই হুকুমের নিশ্চিত অন্তর্ভুক্ত। এভাবে ইজমায়ে উম্মতের খেলাফ হওয়ার বেলায়ও প্রমান করা দরকার যে, ইতিপূর্বে একদেহীভূত দু'সহোদরা বোনকে এক ব্যক্তির সাথে বিয়ে দেয়ার প্রসংগ সমকালীন উম্মতের সামনে এসেছিল এবং সমগ্র উম্মত এরূপ বিবাহ জায়েয না হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন অথচ শক্তিশালী দলীল দ্বারা আজ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি যে, একদেহী দু'সহোদরা কুরআনের উল্লেখিত হুকুমের আওতাভূক্ত অথবা অতীতে এ ধরনের ব্যাপারে সমগ্র উম্মত ঐক্যবদ্ধভাবে মত ব্যক্ত করেছেন। বরং আমরা ইতিপূর্বে বিশদভাবে আলোচনা করেছি যে, একদেহী দু'সহোদরা বোনের হুকুম এদের একত্রে বিয়ে করা হারাম সম্পর্কীত কুরআনী হুকুমের অন্তর্ভুক্তই নয় ; বরং ব্যক্তিক্রম। বস্তুত কুরআনের সে হুকুমটি কেবলমাত্র স্বাভাবিক অবস্থায় পৃথক দেহধারী হয়ে জন্মলাভকারিনী বোনদ্বয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একদেহীভূত হয়ে অস্বাভাবিক আকারে জন্মলাভ কারীনী দু'সহোদরা বোনের বেলায় এই হুকুম প্রযোজ্য নয়। হুকুমের প্রয়োগ ক্ষেত্র বিষয়ে কুরআনিক নীতি আমরা ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করেছি। এখন ان تجمعوا بين الاختين আয়াতের মর্মানুযায়ী জন্মগতভাবে একদেহীভূত দু'সহোদরা বোনও আপাতঃ দৃষ্টিতে উপরোক্ত আয়াতের আওতাভূক্ত এবং তাদেরকে একই সময় এক ব্যক্তির সাথে বিয়ে দেয়া মানবতা বিরোধী। সুতরাং তাদেরকে আজীবন কুমারীত্ব গ্রহণে বাধ্য করা হোক। যদি এ জাতীয় মন্তব্য হয়, তাহলে স্বয়ং অভিযোগকারীগণও এ থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় নেই। কারণ, কুরআনে আছেঃ وانكحوا الايامى منكم[১]

---

১. আর তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিতদের বিয়ের ব্যবস্থা করে দাও।

www.pathagar.com

ولا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم [২]

এবং হাদীসে আছেঃ الايم اذا وجدت لها كفوا - [৩]

এগুলোও তো নস বা শরঈ হুকুম। তদুপরি কুরআন-হাদীসের এসব ভাষ্যে আপাতঃ দৃষ্টিতে একাঙ্গীভূত দুই সহোদরাকে বিয়ে থেকে চির দিনের জন্য মাহরুম না করার কড়া নির্দেশ রয়েছে। এখন যদি তাদেরকে আজীবন কৌমার ব্রত পালন করতে বাধ্য করা হয়, তাহলে এদ্বারা উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসের নির্দেশের খেলাফ কাজ প্রমাণ হবে না কি? তদ্রূপ অকারণে কুরআন-হাদীস বিরোধী কাজে লিপ্ত হওয়া কি অনিবার্য হয় না? উপরন্তু এ জাতীয় নীতির ফলে একদিকে নিরীহ অবলাদের উপর নির্মম অত্যাচার, অপরদিকে এটা কিখোদায়ী আইনের প্রতিবাদ প্রমাণ হয় না? জবাব যদি ইতিবাচক হয় আর হওয়াই সঙ্গত, তাহলে এটাই করা হোক না কেন যে, একাঙ্গীভূত এ দু'সহোদরাকে ان تجمعوا بين الاختين আয়াতের মর্ম থেকে এ জন্য ব্যতিক্রম সাব্যস্ত করা হোক যে, এদের ব্যাপারটা বিরল–ব্যতিক্রমধর্মী আর কুরআনের বিধান সাধারণ অবস্থায় প্রযোজ্য। সুতরাং এ নীতির প্রেক্ষিতে এক ব্যক্তির সাথে একত্র বিবাহ জায়েয স্বীকার করা হোক। ফলে একদিকে তাদের ওপর যুলমও করা হবে না, অপরদিকে কুরআনী আইনেরও খেলাফ হলোনা। অধিকন্তু কুরআন হাদীসের সমস্ত হুকুম যথাস্থানে কার্যকরও রয়ে গেল।

দ্বিতীয় জবাব

এই জবাবটি বুঝার পূর্বে ভূমিকা স্বরূপ কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা দরকার। প্রথমত প্রায় সকল ফকীহ একথায় একমত যে, দু'সহোদরা বোনকে একই সঙ্গে এক ব্যক্তির বিয়ে করা শরীয়তে হারাম ঘোষণা করার মূল কারণ হলো রক্ত সম্পর্কের বিচ্ছিন্নতা। কেননা এ ধরনের সমাবেশে দু'বোনের মধ্যে সংসারে সতীনসুলভ প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে ওঠে যা রক্ত সম্পর্ককে ফাটল ধরায় এবং একে অবশ্যই প্রভাবিত করে। এ কারণেই দু' বোনকে একই সঙ্গে একই পুরুষের কাছে বিয়ে দিতে শরীয়ত হারাম সাব্যস্ত করেছে যাতে করে

---

২. তখন তাদের তোমরা একাজে বাধা দিও না যে, নিয়মানুযায়ী পরস্পর সম্মত হয়ে তারা স্বামীর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হবে।

৩. বিধবা অথবা স্বামীহারা নারীর বিয়ে দিয়ে দেবে সমকক্ষ ঘর পাওয়া মাত্র।

www.pathagar.com

আত্মীয়তার সম্পর্কের মধ্যে কোনো বিরূপ প্রভাব না পড়ে। এই নিষিদ্ধ হুকুম কেবলমাত্র দু' সহোদরা বোনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং এমন দু' নারীর ক্ষেত্রেও পরিব্যপ্ত যাদের একজন পুরুষ অপরজনকে নারী ধরা হলে তাদের মধ্যে পরস্পর বিয়ে হারাম সাব্যস্ত হয়। যথাঃ

ويحرم ان يجمع الرجل بين الاختين بنكاح وسرى حكمها

الى كل امرأتين لو فرضت احداهما ذكرا حرمت

الاخرى عليه بعلة قطيعة الرحم - اهـ (عنايه شرح هدايه ج ٣ ص ١٢١)

দু' বোনকে একই সময়ে বিবাহের মাধ্যমে এক ব্যক্তির অধীনে একত্রিত করা হারাম। একই হুকুম এমন দু'জন নারীর বেলায়ও প্রযোজ্য যাদের একজনকে পরুষ কমে করা হলে তাদের মধ্যে পরস্পর বিয়ে হারাম সাব্যস্ত হয়। রক্ত সম্পর্কে ফাটল ধরার কারণে এই নিষেধাজ্ঞা প্রবর্তিত হয়।

কারণযুক্ত হুকুমের বিধান

দ্বিতীয়ত সাধারণভাবে শরীয়তের নীতি হলো, কোনো হুকুম যখন কোনো নির্দিষ্ট কারণের ভিত্তিতে নিরূপিত হয়, তখন যেখানেই সে কারণ পাওয়া যাবে হুকুমটিও তথায় সংশ্লিষ্ট থাকবে। আর কারণ না থাকলে হুকুমও বর্তমান থাকবে না। এটা সার্বিক বিধান না হলেও অধিকাংশিক বিধান অবশ্যই। ইসলামী শরীয়তে এই বিধানের বহু উদাহরণ রয়েছে। এখানে মাত্র দু'টি বিধান উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রথম উদাহরণ

সূরায়ে তওবায় আল্লাহ তায়ালা যাকাতের ব্যয় খাত নির্ধারণ করেছেন আটটি। তন্মধ্যে মনের আকর্ষণ বা তুষ্টি সাধনও একটি খাত। ইসলামের প্রাথমিক যুগে যারা এখনো ইসলাম গ্রহণ করেনি কিন্তু শীঘ্রই গ্রহণ করার আশা করা যাচ্ছিল অথবা কবুল করেছে ঠিকই কিন্তু মনের নিভৃত কোণে একান্তরূপে ইসলাম এখনো ঠাঁই পায়নি তাদের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল এই খাতটি। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল যাকাত প্রদানের মাধমে তাদের তুষ্টি সাধন করা এবং আকর্ষণ লাভ করা। প্রাথমিক যুগে ইসলাম ছিল দুর্বল, শক্তি ছিল কম। সুতরাং ইসলামের পক্ষে অমুসলিম ও নও মুসলিমদের সহায়তা পাওয়া অথবা তাদের অন্তরে ইসলামের আকর্ষণ জোরদার করার উদ্দেশ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.pathagar.com

ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশাতেই তাদেরকে যাকাত দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। রসূলের ইন্তিকালের পর হযরত আবু বকরের (রাঃ) শাসনামলের প্রথম দিকে এই প্রথা জারী থাকে। আবু বকরের (রাঃ) শাসনামলের শেষদিকে ইসলাম একটি রাজনৈতিক শক্তি, মজবুত সংগঠনরূপে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাড়াঁয় এবং কারো মন আকর্ষণ করে দয়া বা অনুগ্রহ পাওয়ার মুখাপেক্ষী থাকেনি। তাই হযরত ওমর (রাঃ) একথা বলে তাদের এতদসংক্রান্ত নথিপত্র ছিড়ে ফেললেন যে, "আজ আর ইসলাম তোমাদের দয়া ও অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী নয়। তোমরা হয় সাচ্চা ঈমানদার হয়ে যাও, নতুবা জিহাদের জন্যে তৈরী হও।" সে সময় থেকেই তাদের যাকাত নামীয় সাহায্য বন্ধ করে দেয়া হয়। এতত্ত্ব অধিকাংশ আলেম স্বীকার করেছেন।

উপরোক্ত খাতটিতে যাকাতের মাল ব্যয় করা কুরআনী হুকুম। এর প্রধান কারণ ছিলো ইসলামের দুর্বলতা। কাজেই ইসলামের প্রতি মনের আকর্ষণ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে তাদেরকে যাকাত দেয়া হতো। আবু বকরের (রাঃ) শাসনামলের শেষদিকে এ কারণ না থাকার দরুন হুকুমের কার্যকারিতা বিলোপ করা হয়। এতে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, যে কার্যকারণের দরুন শরীয়তের বিধান আইনের রূপ লাভ করে তা বর্তমান না থাকলে বিধানটিও বলবৎ থাকে না।

দ্বিতীয় উদাহরণ

গনীমতের মাল সম্পর্কে কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ হলো তার এক-পঞ্চমাংশ পাঁচ ভাগ করে নিম্নোক্ত ৫টি খাতে ব্যয় করতে হবে। (১) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (২) তাঁর নিকটাত্মীয় (৩) ইয়াতীম (৪) মিসকীন (৫) মুসাফির। কুরআনের ভাষা হলো,

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ - الآية

"জেনে রাখ। তোমাদের যুদ্ধ লব্ধ মালের এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্যে এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন আর মুসাফিরের জন্য।" (সূরা আনফাল ৪১ আয়াত)

এক-পঞ্চমাংশ মালে গনীমত নবী মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশাতে এই পদ্ধতিতেই বন্টন করা হত। রসূল সাল্লাল্লাহু

www.pathagar.com

আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) নিকটাত্মীয়দের সে অংশ বন্ধ করে দেন। খেলাফতে রাশেদার পরবর্তী যুগে পঞ্চমাংশ মালে গনীমতের বন্টন ব্যাপারে ফকাহাদের মত পার্থক্য দেখা গেল। ইমাম শাফেয়ী (র) এবং ইমাম আহমদের (র) মতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এর বন্টন ধারা যেভাবে ছিল সেভাবেই এ যুগেও গৃহীত হবে। ইমাম মালেক (র) ও ইমাম আবু হানিফার (র) মতে এ ধারায় কিছুটা পরিবর্তন করতঃ পাঁচ খাতের পরিবর্তে তিন খাত অর্থাৎ ইয়াতীম, মিসকীন এবং মুসাফির এই তিন প্রকার হকদারকে দিতে হবে। রসূল ও তাঁর নিকটাত্মীয়ের খাত বর্তমানে রহিত হয়ে গেছে। তাঁদের ভাষ্য নিম্নরূপ–

واختلفوا فى قسمة الخمس فقال ابو حنيفة ومالك يقسم
على ثلثة اسهم لليتامى سهم وسهم للمساكين وسهم لابن
السبيل واما سهم النبى صلى الله عليه وسلم فقد سقط
بموت النبى صلى الله عليه وسلم كما سقط الصفى وسهم
ذوى القربى كانوا يستحقون فى زمن النبى صلى الله عليه
وسلم بالتعين وبعده فلا سهم لهم وقال الشافعى و
احمد يقسم على خمسة اسهم - سهم للرسول وهو باق
لم يسقط بموته - وسهم لذوى القربى وسهم للمساكين
وسهم لليتامى وسهم لابناء السبيل - اه

(رحمة الامة ج ٢ ص ١٦٦)

"পঞ্চমাংশ বন্টনের ব্যাপারে ইমামগণ মতপার্থক্য করেছেন। ইমাম আবু হানিফা (র) এবং ইমাম মালেকের (র) মতে পঞ্চমাংশ মালে গনীমত তিন খাতে ব্যয় করতে হবে। ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফির এই তিন প্রকার হকদারকে সমান হারে ভাগ করে দিতে হবে। রসূলের অংশ সাফীর [১] ন্যায় তাঁর তিরোধানে রহিত হয়ে গেছে। তাঁর আত্মীয়গণ কেবলমাত্র নবীর জীবদ্দশাতেই একটি অংশ ভোগ করার অধিকারী। তাঁর ইন্তিকাল হওয়ায়

১. গনীমত লব্ধ মালের যে অংশ সরদার নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নেন উহাকে 'সাফী বলা হয়।

www.pathagar.com

আত্মীয়দের সে অধিকার আর অবশিষ্ট থাকবে না। ইমাম শাফেয়ী (র) এবং আহমদের (র) মতে পাঁচটি খাত পূর্ববত বহাল থাকবে। হুজুরের খাত তাঁর ইন্তিকালে রহিত হবে না। দ্বিতীয় খাত তাঁর নিকটাত্মীয়ের, তৃতীয় মিসকীন, চতুর্থ ইয়াতীম এবং পঞ্চম খাত মুসাফিরের জন্যে।

(রহমাতুল উম্মাহ, দ্বিতীয় খন্ড, ১৬৬পৃষ্ঠা, মীযান, দ্বিতীয় খন্ড, ১৭৭-১৭৮পৃষ্ঠা, ফাতহুল কাদীর, দ্বিতীয় খন্ড, ২৪৬ পৃষ্ঠা)

ইমাম আবু হানিফা (র) এবং ইমাম মালেকের (র) মতে হুজুরের ইন্তিকালে তাঁর খাত রহিত হওয়ার কারণ হলোঃ

وسہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سقط بموتہ کما سقط
الصفی لانہ علیہ السلام کان یستحقہ برسالتہ ولا نبی بعدہ
وسہم ذوی القربی کانوا یستحقونہ فی زمن النبی صلی اللہ علیہ
وسلم بالنصرۃ - اھ ہدایہ ج ۲ کتاب السیر) واذا ثبت ان
النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطاہم للنصرۃ لا للقرابۃ
وقد انتہت النصرۃ انتہی الاعطاء لان الحکم ینتہی
بانتہاء علتہ - اھ (عنایہ بہامش فتح القدیر ج ۵ ص ۲۴٦)

"রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালে 'সাফীর' ন্যায় 'খুমুসের' অংশও রহিত হয়ে থাকে। কেননা নবী আলাইহিস সালাম নবী ও রসূল হওয়ার কারণেই অংশের অধিকারী হন। নবী বর্তমান না থাকলে অংশ বর্তমান থাকতে পারে না। এরূপে নবী আলাইহিস সালামের নিকটাত্মীয়গণ একটি অংশের অধিকারী ছিলেন আত্মীয়তার সূত্রে নয়, বরং সাহায্য সহায়তা করার কারণে। সহায়তা করার কর্তব্য মৃত্যুর পর আদিষ্ট থাকে না। সুতরাং এই খাতও অবশিষ্ট থাকবে না। কেননা, কারণের পরিসমাপ্তিতে হুকুমের কার্যকারিতা স্বতই শেষ হয়ে যায়।"

(হেদায়া, ২য় খন্ড, কিতাবুস সিয়ার, ফত্হুল কাদীর সূত্রে ইনায়াহ্, ৫ম খন্ড, ২৪৭ পৃষ্ঠা)

রসূল ও তাঁর নিকট আত্মীয়ের খাত দু'টি সম্পর্কে কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল। কিন্তু সেটা ছিল এক বিশেষ কারণের অধীন আর রসূলের

www.pathagar.com

ইন্তিকালের সাথে সাথে সে কারণও বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সুতরাং ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম মালেকের মতে হুকুমটিও বহাল থাকতে পারে না। এতে প্রতীয়মান হয় যে, কারণমুক্ত আহ্‌কামের কারণ বর্তমান না থাকলে সে হুকুমও অবশিষ্ট থাকে না। ভূমিকা স্বরূপ এই কথাগুলি স্মরণ রাখার পর উত্থাপিত অভিযোগের দ্বিতীয় জবাব পেশ করা হচ্ছে।

উপরোল্লেখিত ব্যাখ্যায় একথা প্রমাণিত হলো যে, দু'সহোদরা বোনের একত্রিত বিবাহ হারাম হওয়ার প্রধান কারণ হলো রক্ত সম্পর্কের বিচ্ছিন্ন হওয়া। কেননা, সতীন হওয়ার কারণে দু'বোনের মধ্যে প্রতিহিংসা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। আর হিংসায় আত্মীয় সম্পর্ক প্রভাবিত হওয়া বলাই বাহুল্য। এখানে একদেহী দু'বোনের অনুভূতি প্রকৃতিগতভাবে এক ও অভিন্ন। সুতরাং তাদের মধ্যে হিংসার আগুন জ্বলে উঠার প্রশ্নই উঠে না। অনুভূতি ও রুচিতে তারতম্য থাকলে প্রতিহিংসা সৃষ্টি হওয়ার প্রশ্ন উঠে। উভয়ের মধ্যে হিংসা দ্বেষ নেই। সুতরাং রক্ত সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ারও অবকাশ থাকে না। যখন কারণ থাকবে না তখন হারাম হওয়ার হুকুম কেমন করে অবশিষ্ট থাকবে? কারণ, ফকীহদের একটি স্বীকৃত নীতি হলো الحكم ينتفي بانتفاء العلة। অর্থাৎ, কারণ দূর হয়ে গেলে হুকুম বহাল থাকে না। অতএব, একদেহী দু'বোন ان تجمعوا بين الاختين। আয়াত দ্বারা হারাম হওয়ার আওতাভুক্ত নাও হতে পারে। কার্য কারণের অনুপস্থিতিতে যাকাতের ব্যয়খাত 'তালীফে কুলুব' বন্ধ হওয়া এবং পাওয়ার কারণ হারিয়ে ফেলার দরুন রসূলের আত্মীয়গণ এক-পঞ্চমাংশ মালে গনীমত থেকে বঞ্চিত হওয়া যদি বৈধ ও স্বীকৃত হয়, তাহলে একদেহী দু'বোনের মধ্যে কার্যকারণ অনুপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের উভয়ের একই ব্যক্তির কাছে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম হবে কেন? যদি এই একদেহী দু'বোন আজীবন কুমারী ব্রত পালন করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে তাহলে তাদের জন্যে সহজতর কোনো উপায় খুঁজে বের করা শরীয়তেরই কর্তব্য। আর এই সহজতর উপায়টি হলো তাদেরকে বিবাহ করতে রাজী এমন ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিয়ে দেয়া। তাতে একদিকে যৌনাচার রক্ষা পাবে, অপরদিকে আল্লাহর শাশ্বত বিধান বিতর্কের উর্ধে থাকবে। আর যদি তারা চির কুমারিত্ব স্বেচ্ছায় বরণ করে নেয়, তাহলে তো আমরা দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে নিষ্কৃতি পেলাম এবং আল্লাহর বিধানও সব ধরনের আপত্তি থেকে পবিত্র রইলো।

www.pathagar.com

এতোটুকু কথা বলার দরুন যদি মাওলানা মওদূদীকে (র) গোমরাহ অথবা কুরআন বিকৃতকারীরূপে আখ্যায়িত করা হয়, তাহলে আজ থেকে শত শত বছর আগেকার ইমামদেরকে অনুরূপ ফত্ওয়ার শিকার হতে হয়। কেননা তাঁরাও 'তালীফে কুলূব' নামীয় যাকাতের খাত এবং রসূলের নিকটাত্মীয়কে এক-পঞ্চমাংশ মালে গনীমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার রায় দিয়েছেন।

তৃতীয় জবাব

আনুসাংগিক দলীল প্রমাণ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে যদি আমরা স্বয়ং কুরআনের শব্দ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করি তাতেও এই সিদ্ধান্তে পৌছা অযৌক্তিক নয় যে, দু'সহোদরা বোন যারা স্বাভাবিক নিয়মে আলাদাভাবে জন্ম লাভ করেছে তারা ان تجمعوا بين الاختين এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। আর যে সহোদরা দু'বোন একদেহী হ'য়ে জন্মগ্রহণ করলো তারা এই হুকুমের আওতাভুক্ত না হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এই দাবী যেহেতু উসূলে ফিকাহের একটি বিধানের ওপর নির্ভরশীল, সুতরাং সেই বিধানটি নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করার প্রয়াস নেয়া হচ্ছে।

উসূলে ফিকাহের একটি বিধান

উসূলে ফিকাহের আলেমগণ সম্মত বিধানের মর্যাদা দিয়ে একথা স্বীকার করেছেন যে, শরঈ বিধান সমূহের সাধারণ হুকুমকে পূর্বাপর সম্পর্কের কারণে পরিবর্তন পরিবর্ধন করা যেতে পারে এবং এটা কোনো নাজায়েয কাজ নয়। যেমন, কোনো আয়াত বা হাদীস সাধারণভাবে ইস্যুকৃত। স্বকীয় ব্যাপকতার কারণে কতিপয় অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল। কিন্তু এর পরে এমন কোনো নিদর্শন পেয়ে যাওয়া যার ফলে কতিপয় অবস্থা এই সাধারণ ও ব্যাপক হুকুমের বহির্ভূত থাকা প্রমাণ করে। পূর্বাপর সম্পর্কের কারণে সাধারণ হুকুম থেকে উক্ত কতিপয় অবস্থাকে বহির্ভূত মনে করা উসূলে ফিকাহের আলেমদের স্বীকৃত নীতি। নীচের উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে ভালো করে বুঝা যেতে পারে।

এক জাতীয় শস্য বেচা-কেনা সম্পর্কে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء

"খাদ্যকে খাদ্যের বিনিময়ে বেচা-কেনা করোনা। কিন্তু বিনিময় যদি সমান হয় তবে করতে পার।" এই হাদীসটি ব্যাপতার দিক থেকে 'সম পরিমাণের অবস্থা' ব্যতীত খাদ্যের বিনিময়ে খাদ্য বেচা কেনা করার সব অবস্থা নাজায়েয হওয়ার দলীল।

এখন প্রথম হাদীসের দাবী অনুযায়ী بيع الحفنة بالحفنتين এক হাফ্নাহ্ (এক ছা পরিমাণ) দু'হাফনার বিনিময়ে কেনা বেচা করা নাজায়েয হওয়ার কথা। কেননা এ ক্ষেত্রে সমতা রক্ষিত হয়নি যা হাদীসে الا سواء بسواء বাক্য দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। আর এই কারণের সূত্র ধরে হানাফী ফকীহগণ এক হাফনাহ দুই হাফনার বিনিময়ে বেচা-কেনা করাকে জায়েয বলেছেন এবং এটাকে হাদীসের সাধারণ হুকুম বহির্ভূত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এ সম্পর্কে তাদের বক্তব্য হলো- لا تبيعوا الطعام بالطعام

এ হাদীসটি যদিও সাধারণ এবং এক হাফনাহ দু'হাফনার বিনিময়ে বেচা-কেনা করার বিষয়টিও এর অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু হাদীসের শেষাংশে 'সমতাকে' এ হুকুম থেকে খারিজ করা হয়েছে। আর সমতার অর্থ হলো শরীয়তের নির্ধারিত পরিমাণ। শরয়ী পরিমাণ অর্ধ ছা'র কম নয়। সুতরাং এখানে সমতার অর্থ হলো অর্ধছা' বা এক ছা'র মাধ্যমে অর্জিত পরিমাণ। আর অর্ধ ছা'এর কম পরিমাণ বস্তু খাদ্য দ্রব্যে আদৌ ঠিক হতে পারে না; বরং বেশী পরিমাণ খাদ্যেই এটা ঠিক হতে পারে। এর পরিপ্রেক্ষিতে হাদীসের প্রথম অংশে لا تبيعوا الطعام بالطعام যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে তদ্বারা বেশী পরিমাণ খাদ্যই উদ্দেশ্য হবে যা অর্ধ ছা'র কম নয়। এমতাবস্থায় এক হাফনাহ্ ও দু' হাফনার পরিমাণ খাদ্যের পরিমাণের অন্তর্ভুক্তই নয়। বেচা-কেনার আসল বিষয় যেহেতু 'জায়েয' হওয়া, সুতরাং দু'হাফনার বিনিময়ে এক হাফনাহ বেচা-কেনা করলে তা হাদীসের প্রথমাংশে অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার কারণে মূলত জায়েয হিসাবে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।

লক্ষ্য করে থাকবেন যে, হাদীসের প্রথমে لا تبيعوا الطعام بالطعام অংশে যে নিদর্শন রয়েছে তা সম্পূর্ন সাধারণ ও ব্যাপক যা হাফনার পরিমাণকেও অন্তর্ভুক্ত করেছে কিন্তু শেষাংশের الا سواء بسواء নির্দেশ দ্বারা প্রথম অংশের সাধারণ হুকুম থেকে হাফনাকে খারিজ করা হয়েছে। সুতরাং এখানকার আলোচ্য বিষয় কুরআনের আয়াতের ان تجمعوا بين الاختين হুকুমটি সাধারণভাবে প্রযোজ্য যার মধ্যে এক দেহীভূত দু' সহোদরা বোন শামিল। কিন্তু

www.pathagar.com

পরবর্তী নিদর্শন الا ما قد سلف اختين। শব্দ দ্বারা এমন দু'বোন উদ্দেশ্য যারা স্বাভাবিকভাবে দু'টি স্বতন্ত্র দেহধারী। কারণ الا ما قد سلف বাক্যাংশ দ্বারা ইসলামপূর্ব সময়ে জাহেলী যুগে দু' সহোদরা বোনকে একত্রে একই সময়ে বিবাহ করার প্রথা বিলোপ করাই আল্লাহ তায়ালার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য। যে দু'বোন পৃথক দেহধারী তারাই এই কারণে হারাম হুকুমের পর্যায়ভুক্ত হবে। আর এক দেহীভূত দু' সহোদরা বোন মূলত এই হুকুমের আওতাভুক্তই নয়। সুতরাং কুরআনের হুকুমও তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু যারা একদেহীভূত দু'সহোদরা বোনকে স্বাভাবিক জন্মলাভকারী পৃথক দেহধারী দু'বোনের ওপর অনুমাণ করতঃ একদেহীভূত বোনদ্বয়কে একই ব্যক্তির সাথে বিবাহ দেয়া হারাম হওয়ার দাবী করেন তাদের بيع الحفنة بالحفنتين কে لا تبيعوا الطعام بالطعام নিষেধের অন্তর্ভুক্ত স্বীকার করতে হবে। অন্যথায় এর জন্য তাদের কুরআন হাদীস থেকে দলীল পেশ করা উচিত।

দু' বোনকে একত্রে বিবাহ করা সম্পর্কে ইমামদের অভিমত

দু' বোনের একদেহীভূত হয়ে জন্মলাভ করার মতো ঘটনা অতি বিরল। এরূপ বিরল ঘটনা সম্পর্কে শরঈ বিধানের আওতায় যদি কোনো আলেম নিজের মত এভাবে ব্যক্ত করে যে, একদেহীভূত দু'সহোদরা বোনের বিবাহের হুকুম ان تجمعوا بين الاختين কুরআনের এই হুকুমের সাথে সম্পৃক্ত নয়, তাহলে এ অভিমত এমন অযৌক্তিক ও অবাস্তব নয় যে, তাকে কুফর ও গোমরাহীর ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাতে হবে।

আমরা দেখতে পাই, আমাদের আগেকার আলেম ও ইমামগণ পৃথক সত্তা বিশিষ্ট দু'বোনের বিবাহ সম্পর্কেও মতপার্থক্য করেছিলেন। তাঁদের কারো ইজতেহাদী রায় বাহ্যতঃ কুরআনের ان تجمعوا بين الاختين আয়াতের খেলাফ। কিন্তু আগেকার আলেমগণের দৃষ্টিভংগী এতো সংকীর্ণ ছিল না যে ইজতেহাদী রায়ে মতবিরোধ দেখা দিলে তাতে একে অপরকে কাফের বা গোমরাহ বলতে হবে। অথবা কুফরী বা বিভ্রান্ত হওয়ার ফতওয়াবাজী করেছেন এমন নজির তাদের জীবনে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এজন্যই ان تجمعوا بين الاختين আয়াতের নির্দেশ প্রয়োগের ক্ষেত্র বিষয়ে তাঁদের ইজতিহাদী মতবিরোধ

www.pathagar.com

হয়েছে বটে; কিন্তু তাঁরা একে অপরকে 'গোমরাহ' বিশেষণে আখ্যায়িত করেন নাই। অনুরূপ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রচারনার ঝড় তোলার অনুশীলনেও অগ্রনী ভূমিকা নেন নাই।

মতপার্থক্যের ব্যাখ্যা

'দু' সহোদরা বোনকে একই সময়ে একত্রে বিয়ে করা তোমাদের জন্যে হারাম'– কুরআনের এই হুকুমটি বাহ্যত দু'টি অবস্থাকে শামিল করে। এক অবস্থায় মালীকানা সূত্রে সহবাসে উভয়কে একত্রিত করা এবং একই সূত্রে একই সময়ে উভয়ের সাথে মিলিত হওয়ার ফায়দা লাভ করা।

দ্বিতীয় অবস্থায় দু'বোন একই সময়ে এক ব্যক্তির বৈবাহিক মালীকানায় একত্রিত হওয়া এবং বিবাহসূত্রে এক ব্যক্তি উভয়ের সাথে সহবাস করা। সূত্র বৈবাহিক কিংবা খরিদ যাই হোক না কেন এই উভয় অবস্থাকেই কুরআন দৃশত হারাম ঘোষণা করেছে। অথচ আমরা দেখতে পাই, পূর্বাপর নিদর্শণের আলোকে কোনো কোনো ইমাম প্রথম অবস্থাকে এই হুকুমের খারিজ সাব্যস্ত করে বলেছেন, "খরিদাসূত্রে মালীক হয়ে এক ব্যক্তি একই সময় দু'সহোদরা বোনের সাথে মিলিত হওয়া বৈধ এবং এরূপে একত্রিত করা কুরআনের আলোকে হারাম নয়।" এই মত ব্যক্ত করেছেন ইমাম দাউদ জাহেরী (র) এবং ইমাম আহমদেরও (র) অনুরূপ একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। 'রহমাতুল উম্মত' গ্রন্থের ২য় খন্ড, ৩৭ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত উক্তি উল্লেখ করে বর্ণিত আছে–

ویحرم الجمع بین الاختین فی النکاح وکذا یحرم
الجمع فی الوطی بملک الیمین وقال داود لا یحرم
الجمع بین الاختین فی الوطی بملک الیمین وهو
روایة عن احمد - اه (رحمة الامة ج ۲ ص ۳۷)

"অর্থাৎ, "দুই সহোদরাকে এক ব্যক্তির একত্রে বিয়ে করা হারাম। অনূরূপ মালিকানা স্বত্ব বলে দুই বোনের সাথে সহবাস করাও হারাম। কিন্তু দাউদ যাহেরীর মতে মালিকানা ক্ষমতা বলে দু'সহোদরার সাথে দৈহিক মিলনে একত্রিত হওয়া হারাম নহে। এক রেওয়ায়েতে ইমাম আহমদও এমতের সমর্থক।"

www.pathagar.com

ইমাম শারনীও (র) ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যথা–

ومن ذالك قول الائمة بتحريم الجمع بين الاختين
في الوطي بملك اليمين مع قول داود باباحة الجمع
بين الاختين في الوطي بملك اليمين وهو رواية
عن احمد - اه (ميزان للشعراني ج ٢ ص ١١٣)

"এ ব্যাপারে ইমামদের বক্তব্য হলো—খরিদ সূত্রে মালীকানায় দু'সহোদরা বোনের সাথে এক ব্যক্তির সহবাস করা হারাম যদিও ইমাম দাউদ যাহেরী এটাকে হালাল বলেছেন এবং ইমাম আহমদেরও (র) অনুরূপ একটি উক্তি রয়েছে।" (মীযানঃ খঃ ২ পৃঃ ১১৩)

আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন, ইমাম আহমদ (র) এবং দাউদে যাহেরী (র) উভয়ই প্রথম অবস্থা সম্পর্কে দৃশ্যত কুরআনের খেলাফ ফত্‌ওয়া দিয়ে বললেন, এরূপ একত্রিত করা হালাল, হারাম নয়। অথচ কুরআন বাহ্যত একাজকে হারাম ঘোষণা করেছে। তাঁদের এই ফত্‌ওয়া দৃশ্যত কুরআন বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত তাঁদেরকে কেউ গোমরাহ কিংবা কুরআন বিকৃতকারীরূপে আখ্যায়িত করেনি। তাঁদের বিরুদ্ধে আলেমগণ কোনো হাংগামাও করেননি এবং প্রতিপক্ষ দলও সৃষ্টি করেননি। এরূপ তৎপরতা আগের যুগের আলেমদের দৃষ্টিতেও প্রশংসিত ছিল না। বিশেষত এ মতপার্থক্য যখন দ্বীনের মৌলিক নীতি ও আকীদা নিয়ে নয় বরং শাখা প্রশাখা নিয়ে, তখন এ নিয়ে ফত্‌ওয়াবাজি করা কখনো প্রশংসাহার্য হতে পারে না।

তারপর দ্বিতীয় অবস্থা সম্পর্কে আলেমদের ব্যাখ্যা লক্ষ্য করুন–

والجمع بين الاختين حرام في النكاح ... وقال ابو
حنيفة يصح نكاح الاخت على اختها غير انه لا يحل
له وطي المنكوحة حتى يحرم الموطوئة على نفسه
اه (رحمة الامة ج ٢ ص ٢٧ - ميزان للشعراني ج ٢ ص ١١٣)

"দু' সহোদরা বোনকে একই সময় এক ব্যক্তির কাছে বিবাহ দেয়া হারাম। তবে ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, এক বোন স্ত্রী হিসেবে থাকা অবস্থায় অপর বোনকে বিবাহ করা সহীহ। কিন্তু বিবাহিত বোনের সাথে মিলিত

www.pathagar.com

হওয়া জায়েয নয় যতোক্ষণ না সহবাসকৃত বোনকে নিজের জন্যে হারাম মনেকরবে।"

(রহমাতুল উম্মাহ, ২য় খন্ড, ৩৭ পৃঃ মীযান, ২য় খন্ড, ১১৩ পৃঃ)

আমাদের হানাফী মজহাবের কিতাবগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজেও একথাগুলো পাওয়া যায়নি। সুতরাং এ সম্পর্কে আবূ হানীফার (র) এটাই যে বাস্তব অভিমত একথা দৃঢ়তার সাথে বলা যায় না। 'ইমাম শা'রানী' এবং 'রহমাতুল উম্মত' গ্রন্থকার সম্ভবত কোথাও পেয়ে থাকবেন। যদি এই দু' বুযর্গের বিবরণ সঠিক হয় তাহলে এ সম্পর্কেও বলা যায় যে, তাদের রায় বাহ্যত কুরআনের খেলাফ। কেননা, কুরআন দু'বোন একত্রিক করাকে সাধারণভাবে হারাম ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ দ্বিতীয় বোনের বিবাহ মূলত সহীহ হয়নি। অথচ ইমাম আযম (র) বলেন, বিবাহ সহীহ। তবে আগের বোনের সাথে সহবাস করা হারাম সাব্যস্থ করলে তবেই দ্বিতীয় বোনের সাথে মিলিত হওয়া জায়েয অন্যথায় সহবাস করা হারাম।

অভিযোগকারী হযরতগণের কাছে একটি আরজ

অভিযোগকারী হযরতগণের কাছে আমাদের আবেদন, উপরোক্ত তিনজন ইমাম (ইমাম আহমদ, দাউদে যাহেরী, ইমাম শা'রানীর মতে ইমাম আবূ হানীফা) সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কি। (মায়াযাল্লাহ) তারাও কি গোমরাহ এবং কুরআন বিকৃতকারী কিংবা এ ধরনের ফত্ওয়া দেয়ার কারণে গোমরাহ? আর তাঁরা কুরআন বিকৃত করার অপরাধে অপরাধী ননকি? যদি জবাব হ্যাঁবোধক হয়, তাহলে বলুন পূর্ববর্তী আলেমদের বে-ইজ্জতি করা এর চেয়ে বেশী আর কি হতে পারে? আর যদি জবাব না বোধক হয় এবং অবশ্যই না বোধক, তাহলে মেহেরবানী করে বলুন, আয়াতের সাধারণ হুকুম থেকে অস্বাভাবিক ও বিরল ঘটনা একদেহীভূত দু'সহোদরাকে বহির্ভূত করার কারণে মাওলানা মওদূদীকে (র) গোমরাহ ও কুরআন বিকৃতকারীরূপে আখ্যায়িত করার আর উপরোক্ত তিনজন ইমামকে এভাবে আখ্যায়িত না করার যুক্তিসংগত কারণ আপনাদের জানা আছে কি? অথচ তাঁরাও নিজেদের ইজতিহাদের ভিত্তিতে কোনো কোনো অবস্থায় বাহ্যত কুরআনের খেলাফ রায় প্রদান করেছেন। মাওলানা মওদূদী (র) ইজতিহাদ করে একটি অস্বাভাবিক ও অতি বিরল ঘটনাকে সাধারণ হুকুম থেকে ব্যতিক্রম হিসেবে রায় প্রদান

www.pathagar.com

করলেন। এই রায় আপনাদের ধারণা মতে যদি ভ্রান্ত ও অপরাধমূলক হয়, তাহলে দোষ বা ত্রুটির প্রকৃতি ও ধরন এক ও অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও উপরোক্ত ইমামগণকে আপনারা বিশেষ অনুগ্রহ পাওয়ার উপযুক্ত মনে করছেন। তাহলে মাওলানা মওদূদীকে (র) এই বিশেষ অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করার সংগত কারণটি আমাদের মেহেরবানী করে বলবেন কি? অথচ একদেহীভূত দু'সহোদরাকে আয়াতের সাধারণ হুকুম থেকে বহির্ভূত করা দৃশ্যত এমন অপরাধ নয়, যা খরিদাসূত্রে দু'বোনের সাথে একই সময়ে এক ব্যক্তির সহবাস করা দৃশ্যত যতটুকু গুনাহের কাজ কিংবা এক সহোদরা বোনকে স্ত্রী হিসেবে ব্যবহার করা অবস্থায় অপর বোনকে বিয়ে করা সঠিক ঘোষণা করাই বাহ্যত যতটুকু অপরাধমূলক কাজ মনে হয় সে তুলনায় মাওলানা মওদূদীর রায়ে অপরাধের প্রশ্নই আসে না।

যা হোক, দলীলের ব্যাখ্যা, আহকামের প্রয়োগ এবং ইজতিহাদী মাসআলায় দ্বীনের ইমামগণ ছিলেন সব সময় উদার ও দিল দারাজ। পারস্পরিক মতপার্থক্য তাঁদের মধ্যেও ছিল। কিন্তু তাই বলে কেউ কাউকে কখনো গোমরাহ, ফাসেক কিংবা অন্য কোনো গাল মন্দ করেননি। তবে যারা ইচ্ছাকৃত ভাবে জ্ঞাতসারে কুরআন ও হাদীসের নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করেছে তাদের কথা আলাদা। তাদের গোমরাহ হওয়া তো বলাই বাহুল্য। অতএব, আজকের দিনেও আগেকার আলেম ফাজেল ও বুযর্গগানে দ্বীনের আদর্শ ও পদাঙ্ক অনুসরণ করতঃ ইজতিহাদী খুঁটিনাটি ব্যাপারে উদারতা ও প্রসারতার ভূমিকা পালন করা উচিত। খুঁটিনাটি ও সামান্য বিষয়ে মত পার্থক্যের সূত্র ধরে কুফর, ফাসেকী ও গোমরাহীর বান নিক্ষেপ করা কোনো ক্রমেই সমীচীন নয়।

والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

(আল্লাহই সত্যভাষী এবং লক্ষ্য পথের দিশারী)

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

বিনা অযুতে তিলাওয়াতের সিজদা করা প্রসংগ

যেসব বিষয়কে কেন্দ্র করে মাওলানা মওদূদীকে (র) অভিশপ্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে এই প্রসংগটিও সে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়ে মাওলানার ব্যক্তিগত মত হলো—সিজদায়ে তিলাওয়াতের জন্যে অযু করা শর্ত নয়। অযু ছাড়াও তিলাওয়াতের সিজদা আদায় করা যায়। তাফহীমুল কুরআনের ২য় খন্ডের ১১৬ পৃষ্ঠায় সূরায়ে আ'রাফে সিজদায়ে তিলাওয়াতের শর্তাবলীর ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি লিখেছেনঃ

"জমহূরের মতে এই সিজদার জন্যে সেসব শর্ত কার্যকর যেগুলো নামাযের জন্যে প্রয়োজন। অর্থাৎ অযু করা, কিবলাহমুখী হওয়া এবং নামাযের সিজদার ন্যায় যমীনে কপাল লাগানো। কিন্তু সিজদায়ে তিলাওয়াত সম্পর্কে আমরা যতোগুলো হাদীস পেয়েছি তাতে এসব শর্তের কোনো দলীল কোথাও নেই। এতে প্রতীয়মান হয় যে, যে ব্যক্তি যে অবস্থায় সিজদার আয়াত শ্রবণ করবে সে ঐ অবস্থায় সেখানেই মাথা ঝুকিয়ে দিবে। অযু করা, কিবলাহ মুখী হওয়া, যমীনে কপাল লাগানো ইত্যাদি শর্তাবলী পাওয়া না পাওয়ার প্রশ্ন নেই। পূর্ববর্তী আলেমদের কেউ কেউ এ পদ্ধতিতে সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করতেন।"

অভিযোগ

তাঁর এই রায়ের ওপর অভিযোগ উঠেছে, মাওলানা মওদূদী (র) এর মাধ্যমে নিজের সংস্করণ প্রিয়তার প্রদর্শনী করেছেন এবং গোটা জাতি থেকে পৃথক পন্থা নিজের জন্যে নির্ধারণ করেছেন এবং তিনি একটি অভিনব আলাদা নীতি আবিষ্কার করার প্রয়াসী। একজন হকপন্থী আলেমের জন্য এটা শোভন হতে পারে না। তদুপরি একজন সত্যপ্রিয় লোকের মর্যাদাও এরূপ আশা করা যায় না। শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়েদ হোসাইন আহমদ মাদানী সাহেবের (র) খলীফা মুহতারাম মাওলানা কাযী মযহার হোসাইন সাহেব তাঁর 'তানকীদী নযর' (সমালোচনামূলক দৃষ্টি) গ্রন্থের ১০৮ পৃষ্ঠায় তাফহীমূল কুরআনের উপরোক্ত বাক্যের বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা করে লিখেছেনঃ

www.pathagar.com

"এই হলো জাতির বর্তমান মুজাদ্দিদের সিজদায়ে তিলাওয়াতের স্বরূপ; এতে না অযু করার দরকার না কিবলাহ মুখী হওয়ার আর না যমীনে মাথা ঠেকানোর। কেউ মওদূদী সাহেবকে জিজ্ঞাস করুন, আপনি এটাকে শরঈ সিজদা নাম দিয়েছেন কোন কারণে? আল্লাহ জানেন, জামায়েতে ইসলামীর আমীর জমহুরে ওলামার বিরোধী ফত্ওয়া দিয়ে কি মজা পান? এ ধরনের ফত্ওয়া ইসলামে ঐক্যের উপকরণ নাকি অনৈক্যের? আশ্চর্য। তিনি আবার নিজের মতের সমর্থনে পূর্ববর্তী আলেমগণের উক্তি পেশ করেন। অথচ তাঁর মতে সে সব আলেম সত্য ও ন্যায়ের মাপকাঠিই নয়। সুতরাং আপনার ফত্ওয়ার স্বপক্ষে কুরআন-হাদীসের দলীল পেশ করলে তবেই সেটা গ্রহণযোগ্য হতে পারে।"

তারপর তিনি আরো লিখেছেনঃ

(২) "যে শ্রেণীর লোকদের জন্যে আপনি দ্বীনের মধ্যে সহজ ও সরলতা খুঁজে বেড়াচ্ছেন কাল যদি সে শ্রেণীর লোকেরাই প্রশ্ন তোলে যে, সিজদায়ে তিলাওয়াত আল্লাহর জন্যে, সিজদায়ে নামাজও তো আল্লাহরই জন্যে; তাহলে সিজদায়ে নামাযের জন্যে অযুর প্রয়োজন কেন? আপনার এই ইজতিহাদের ভিত্তিতে তারা যদি বিনা অযুতে নামায আদায় করা শুরু করে দেয়, তাহলে আপনার কাছে এর প্রতিকারের ব্যবস্থা কি হবে?"

মাওলানা মওদূদীর (র) লিখিত তাফহীমুল কুরআনের উপরোক্ত বাক্যের উপর এই হলো অভিযোগ। এই অভিযোগ উত্থাপন করে অভিযোগকারীগণ খুবই গর্বিত। এই অভিযোগের ব্যাখ্যা ও জবাব দেয়ার পূর্বে সিজদায়ে তিলাওয়াত সম্পর্কে লিখিত মাওলানা মওদূদীর (র) বক্তব্যকে আমরা হাদীস ও রেওয়ায়েতের আলোকে শুদ্ধ অশুদ্ধ হওয়ার যাচাই বাছাই করতে চাই। তারপরই অভিযোগের জবাবের পালা।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

সিজদায়ে তিলাওয়াত সম্পর্কে মাওলানা (র) যা কিছু লিখেছেন তার ওপর চিন্তা করলে সেগুলোকে নিম্ন বর্ণিত তিনটি ধারায় পেশ করা যায়ঃ

(ক) সিজদায়ে তিলাওয়াতের জন্যে জমহুর আলেমদের মতে নামাযের সিজদার শর্তাবলী অর্থাৎ অযু করা, কিবলাহমুখী হওয়া, যমীনে মাথা রাখা জরুরী।

www.pathagar.com

(খ) তবে সিজদায়ে তিলাওয়াত সম্পর্কিত হাদীসে এসব শর্তের কোনো প্রমাণ নেই। হাদীস দ্বারা যতোটুকু জানা যায় তাহলো সিজদার আয়াত যে যেখানে যে অবস্থায় শুনবে সে অবস্থায়ই মাথা ঝুকিয়ে দেবে।

(গ) প্রথম যুগের আলেমগণ এভাবে সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করতেন বলে আমরা প্রমাণ পেয়েছি।

উপরোক্ত তিনটি ধারার মধ্যে প্রথম ধারা নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। কেননা জমহুরের মতে সিজদায়ে তিলাওয়াত ও সিজদায়ে সালাতের শর্তাবলী এক ও অভিন্ন, এ ব্যাপারে কারো মত বিরোধ নেই। জমহুর যে এ মতের ধারক আলেমদের সকলেই এতে একমত। অবশ্য শেষ দু'টি ধারার কোনো কোনো অংশে মতপার্থক্য করা যায়। তবে এর অপর অংশ—বিনা অযুতে সিজদায়ে তিলাওয়াত করা জায়েয না হওয়ার পক্ষে হাদীস ভিত্তিক কোনো প্রমাণ যে নেই এটাও প্রায় নিশ্চিত ও স্বীকৃত কথা।

অধিকন্তু এটাও দিবালোকের ন্যায় সত্য যে, প্রথম যুগের বিশিষ্ট বুযুর্গবৃন্দের কেউ কেউ বিনা অজুতে সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করা জায়েয মনে করতেন। তাঁদের মতে সিজদায়ে তিলাওয়াতের জন্য অযু শর্ত নহে। এর সমর্থনে কোনো হাদীস মৌজুদ নেই। তাই আমরা এখন আলোচনায় আনতে চাই সত্যি কি এ ব্যাপারে কোন হাদীস বর্ণিত নেই? উপরন্তু সে সকল বুযুর্গানে দ্বীনের উল্লেখও আমরা প্রয়োজন মনে করি যাদের মতে সিজদা তিলাওয়াতের জন্য অযু শর্ত নহে।

এ পর্যায়ে বুখারী ও মুসলিম অথবা অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে সিজদায়ে তিলাওয়াত সম্পর্কে যেসব রেওয়ায়েত পাওয়া যায় এদ্বারা বড় জোর এতোটুকু কথা প্রমাণিত হয় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়াতে- সিজদা পাঠ করার পর তিনি নিজেও সিজদা করেছেন এবং তাঁর সাথী সংগী অন্যান্য সাহাবীগণও সিজদা করেছেন। অধিকন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদার জন্যে অনুপ্রাণিত করেছেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে কিংবা ইশারা ইংগীতে কোথাও নির্দেশ দান করেননি যে, সিজদায়ে তিলাওয়াতের জন্যে অজু করা দরকার। কিংবা বিনা অযুতে সিজদায়ে তিলাওয়াত করা জায়েয নেই।" বরং কোনো কোনো রেওয়ায়েত দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রমাণ হয় যে, অজু ছাড়া সিজদা করা হয়েছে এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা অস্বীকার করেননি। এ প্রসঙ্গে নিম্নের হাদীসগুলোর প্রতি লক্ষ্য করুনঃ

www.pathagar.com

অনুপ্রেরণা মূলক হাদীস

(١) عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكى۔ يقول يا ويله: امر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وامرت بالسجود فابيت فلى النار۔

"আবূ হোরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যখন কেউ সিজদার আয়াত পাঠ করতঃ সিজদা করে তখন শয়তান তার থেকে পৃথক হয়ে বিলাপ করে বলতে থাকে—শতধিক আমার প্রতি। আদম সন্তান সিজদার নির্দেশ পেয়ে সিজদা করে জান্নাতের উপযোগী হলো আর আমি সিজদার নির্দেশ পেয়ে তা অস্বীকার করে হলাম দোযখের উপযুক্ত" (ইবনে মাজা, ১ম খন্ড, ৩২৫ পৃঃ, কুরআনের সাজদা অধ্যায়)

(٢) عن ابن عباس قال كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم واتاه رجل فقال انى رأيت البارحة فيما يرى النائم كانى اصلى الى اصل شجرة فقرأت السجدة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودى فسمعتها تقول اللهم احطط عنى بها وزرا واكتب لى بها اجرا و اجعلها لى عندك ذخرا قال ابن عباس فرأيت النبى صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد فسمعته يقول فى سجوده مثل الذى اخبره الرجل عن قول الشجرة - (ابن ماجه مصرى ج ١ ص ٣٢٥)

"ইবনে আব্বাস (র) বলেন, "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মজলিশে আমার উপবিষ্ট থাকা অবস্থায় একজন লোক এসে আরজ করলেন ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি স্বপ্ন দেখলাম একটি গাছের কাছে নামায পড়ছি। নামাযে সিজদার আয়াত পাঠ করে সিজদা করলাম। আমার সিজদার কারণে গাছ তরুলতাও সিজদা করলো। তারপর আমি শুনলাম, গাছগুলো ফরিয়াদ করছে—আয় আল্লাহ! এই সিজদার বদৌলতে আমাদের গুনাহ মাফ করে

www.pathagar.com

দাও এবং বিনিময়ে প্রতিদান নির্ধারণ কর। এই সিজদা তোমার কাছে আমার সম্পদ হিসেবে সংরক্ষণ করো। ইবনে আব্বাসের বর্ণনা মতে তারপর যখনই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিলাওয়াতের সিজদা করতেন তখনই তিনি এই লোকটির গাছের বরাত দেয়া বর্ণিত দোয়া করতেন।" (ইবনে মাজা মিসরীয় ছাপা, ১ম খন্ড, ৩২৫ পৃঃ)

উপরোক্ত হাদীসদ্বয় সিজদায়ে তিলাওয়াতের জন্য স্পষ্ট অনুপ্রেরণাদায়ক। এবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের সিজদা করার প্রমাণভিত্তিক হাদীসের উল্লেখ করতে চাই। এই হাদীসগুলি 'ফেলী হাদীস' শিরোনামে বর্ণিত হলো।

ফে'লী (বাস্তব) হাদীস সমূহ

(۱) عن ابی الدرداء قال سجدت مع النبی صلی الله علیه
وسلم احدی عشرة سجدة - (ابن ماجه مصری ج ا ص ۳۲۶)

"হযরত আবু দার্দা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ১১টি সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করেছি।" (ইবনে মাজা মিসরী ছাপা, ১ম খন্ড, ৩২৬ পৃষ্ঠা)

(۲) عن ابی هریرة قال سجدنا مع رسول الله علیه وسلم
فی اذا السماء انشقت واقرا باسم ربك الذی خلق
(ابوداود - ج ا ص ۱۹۹)

"আবু হোরাইরা (রাঃ) বলেন, আমি اذا السماء انشقت এবং اقراء باسم ربك الذی خلق এই দু'টি সূরার সিজদায়ে তিলাওয়াত রসূলের সাথে আদায় করেছি। (আবূ দাউদ, ১ম খন্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা)

(۳) عن ابی رافع قال صلیت مع ابی هریرة العتمة فقرا
اذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه السجدة قال
سجدت بها خلف ابی القاسم صلی الله علیه وسلم فلا
ازال اسجد بها حتی القاه - (ابوداود - ج ا ص ۱۹۹ - بخاری
ج ا ص ۱۰۲)

www.pathagar.com

"আবূ রাফে বলেন, আমি আবূ হোরাইরার (রাঃ) সাথে ইশার নামাজ পড়ি। তিনি সূরায়ে اذا السماء انشقت পড়ে সিজদা করলেন। আমি বললাম, এটা কেমন সিজদা করলেন? জবাবে আবূ হোরাইরা (রাঃ) বললেনঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে এই সিজদা করেছি এবং তাঁর সাথে পূনর্মিলন না হওয়া অবধি এভাবে সিজদা করে যাবো"

(আবূ দাউদ, ১ম খন্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা; বুখারী, ১ম খন্ড, ১০৬ পৃষ্ঠা)

আবূ হোরাইরা (রাঃ) ইশার নামাযে সিজদা করেছিলেন এ রেওয়ায়েতে একথা স্পষ্টত প্রমাণ হয়। এতে আরো প্রতীয়মান হয় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সিজদাটি নামাযে রত থাকা অবস্থায় আদায় করেছেন। তবুও এই হাদীস দ্বারা সিজদার জন্যে অযু করা শর্ত প্রমাণ করা যায় না। বড়জোর এতোটুকু বলা যায় যে, সিজদাটি আদায় হয়েছিল অযু অবস্থায়।

(৪) عن ابى سعيد الخدرى انه قال قرأ رسول الله
صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ص فلما بلغ
السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه - (ابوداود)

"আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বারে সূরায়ে পড়লেন। যখন সিজদার আয়াত পড়লেন তখন তিনি মিম্বর থেকে নীচে নেমে সিজদা করলেন এবং লোকগণও তাঁর সাথে সিজদা করেন।" (আবূ দাউদ)

(৫) عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقرأ علينا القرآن فاذا مر بالسجدة كبر و
سجد وسجدنا معه - (ابوداود)

"ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে কুরআন পড়িয়ে শুনাতেন। সিজদার আয়াত পড়েই তিনি আল্লাহু আকবর বলে সিজদা করতেন। আমরাও তাঁর সাথে সিজদা করতাম।" (আবূ দাউদ)

এসব রেওয়ায়েত নবী (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণের সিজদায়ে তেলাওয়াত করার দলীল। কিন্তু এর একটিতেও সিজদার জন্যে অযু করার নির্দেশ নেই।

www.pathagar.com

নিম্নে এমন রেওয়ায়েত উল্লেখ করতে চাই যেগুলোতে কোনো সময় সিজদার জন্যে অযুর প্রতি বাহ্যত গুরুত্বারোপ করা হয়নি। বরং অযু ব্যতিরেকেই সিজদা করা হয়েছে।

বিনা অযুতে সিজদায়ে তিলাওয়াতের হাদীস

(١) عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ
عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب و
الساجد فى الارض حتى ان الراكب ليسجد على يده ـ

(ابوداؤد)

"ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের সময় আয়াতে সিজদা তিলাওয়াত করলে সকলেই সিজদা করেন। সিজদাকারীদের মধ্যে কিছু লোক ছিলেন বাহনের ওপর আরোহী কিছু যমীনের ওপর সিজদাকারী। এমনকি আরোহীগণ নিজেদের হাতের ওপরই সিজদা করেন।" (আবূ দাউদ)

(٢) عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقرأ علينا السورة فى غير الصلوة فيسجد ونسجد معه
حتى لا يجد احدنا مكانا لموضع جبهته ـ (ابوداؤد)

"হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের বাহিরে আমাদের সামনে আয়াতে সিজদা তিলাওয়াত করে সিজদা করতেন। আমরাও তাঁর সাথে সিজদা করতাম। এমনকি ভীড়ের কারণে আমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ যমীনে সিজদা করার জন্যে জায়গা পেতোনা।" (আবূ দাউদ)

ব্যাখ্যা

হাদীস দু'টির বাক্য ও শব্দাবলী নিয়ে চিন্তা করলে এ সত্য দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয় যে, এ ক্ষেত্রে কতিপয় লোক বিনা অযুতে সিজদা করে থাকবেন। নিম্ন বর্ণিত কারণগুলো আমাদের ধারণার সহায়ক!

www.pathagar.com

প্রথম কারণ

প্রথম হাদীসে বলা হয়েছে, সিজদার এই ঘটনা মক্কা বিজয়ের সময় করা হয়েছে। সে সময় নবীর (সাঃ) সাথে ছিলেন শত সহস্র সাহাবী। হাদীস দ্বারা আরো প্রমাণিত হয় যে, সিজদাটি নামাযের অবস্থায় ছিল না বরং অন্য সময় ছিল। কারণ, হাদীসে বলা হয়েছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন এক সমাবেশে কিরাত পড়েন যেখানে আরোহীও ছিল এবং তারা বাহনের ওপরই সিজদা করেন। অথচ শত্রুর প্রবল ভয় ব্যতীত বাহনের ওপর ফরয নামায আদায় করা জায়েয নেই। উপরন্তু একথাও উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, তিলাওয়াতটি হয়েছিল একটি বিরাট জন সমাবেশে। সেখানে লোক এতোবেশী ছিল যে, ভীড়ের দরুন আরোহীগণের সিজদার জন্যে নীচে নামার জায়গাই মিলে নাই। এসব কারণ একত্রিত করে চিন্তা করলে একথা কখনো বিবেকসম্মত হতে পারে না যে, সেখানকার উপস্থিত অসংখ্য লোকেরা সকলেই অযু অবস্থায় ছিলেন।

হাদীসে বর্ণিত অবস্থাই যদি প্রকৃত অবস্থা হয়ে থাকে, তাহলে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, এ ক্ষেত্রে কোনো কোনো সাহাবী অযু ব্যতিরেকে সিজদা করেছেন। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীসটি অযু ব্যতীত সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করা জায়েয হওয়ার একটি দলীল হতে পারে।

দ্বিতীয় কারণ

দ্বিতীয় হাদীসটিতে স্পষ্টত বলা হয়েছে যে, আয়াতে সিজদার তিলাওয়াত ছিল নামাযের বাইরে একটি জন সমাবেশে। সমাবেশটিও ছিল এতো বিপুল সংখ্যক লোকের যে, ভূমিতে সিজদা করার জায়গাও পাওয়া যাচ্ছিল না। এতে দৃশ্যত মনে হয় সমাবেশের সকলেই অযুসহ ছিলেন না। এতো বড় জামাতের সকলেই প্রথম থেকে অযুসহ উপস্থিত ছিলেন—এমন কথা মুক্তবুদ্ধি স্বীকার করতে পারে না, যদিও এটা অসম্ভব কাজ নয়। সমাবেশের কিছু লোকের অযু বাদে সিজদা করা অযু ব্যতিরেকে সিজদা জায়েয হওয়ার দলীল বৈ কি।

٣- عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم
سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون و
الجن والانس - (بخارى، ج ١ ص ١٤٦ - باب سجود المسلمين)

www.pathagar.com

'ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরায়ে 'নাজম' এর আয়াতে সিজদা তিলাওয়াত করলে মুসলমান, মুশরিক, জিন ও ইনসান সকলেই হুজুরের সাথে সিজদাবনত হয়ে পড়ে।"

(বুখারী, ১ম খন্ড, ১৪৬ পৃষ্ঠা, বাব সুজুদুল মুসলিমীন মাআল মুশরিকীন)

ইমাম বুখারী (র) ঐ অধ্যায়ে আরো লিখেছেন ঃ

والمشرك نجس ليس له وضوء وكان ابن عمر يسجد
على غير وضوء - اه

"মুশরিকরা হলো অপবিত্র নাপাক। তাদের অযু শরঈ অযু হওয়ার প্রশ্নই আসে না। আর হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) তো অযু ব্যতিরেকেও সিজদা করতেন।"

এই হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যারা সিজদা করেছিলেন তদের মধ্যে কিছু লোক অযু ব্যতিরেকে ছিলেন এবং তারা সিজদাও করেছিলেন অযু ব্যতীত। অযু ব্যতীত সিজদায়ে তিলাওয়াত জায়েয হওয়ার আগের দু'টি হাদীসের ন্যায় এটাও অপর একটি দলীল।

এ পর্যন্ত যা কিছু পেশ করা হয়েছে তা দ্বিতীয় ধারার সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ, এ বিষয়ে যেসব রেওয়ায়েত আছে তাতে অযুসহ হওয়ার যে শর্ত করা হয়েছে তার কোনো দলীল নেই। কেননা, উপরোক্ত হাদীসগুলোর একটিতেও এমন কথা নেই যে, সিজদায়ে তিলাওয়াতের জন্যে অযু করা শর্ত। এবার তৃতীয় ধারা অর্থাৎ পূর্ববর্তী কোনো কোনো বুযর্গের এ পদ্ধতিতে সিজদা আদায় করার আলোচনা করা হবে।

প্রথম যুগের বুযর্গদের মতে বিনা অযুতে সিজদায়ে তিলাওয়াত করা জায়েয

প্রথম যুগের হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ), ইমাম শা'বী (র) এবং পরবর্তী যুগের ইমাম বুখারী (র) সম্পর্কে একথা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, তাঁরা বিনা অযুতে সিজদায়ে তিলাওয়াত করাকে জায়েয মনে করতেন। আমাদের এসব কথা নিছক ধারণা নয়। অনেক বিজ্ঞ মুহাদ্দিস এবং ব্যাখ্যাতা তাঁদের সম্পর্কে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, বিনা অযুতে সিজদা করা

www.pathagar.com

তাঁরা জায়েয মনে করতেন। নিম্নে আমরা হাদীসের ইমামদের এ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা উপস্থাপনার প্রয়াস নিতে চাই।

হাদীস বিশারদদের ব্যাখ্যা সমূহ

উপরে ইমাম বুখারীর (র) ترجمة الباب এ "ইবনে ওমরের (রাঃ) বিনা অযুতে সিজদায়ে তিলাওয়াত করার" ব্যাপারে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) এবং হাফিজ ইবনে হযর আসকালানী (র) উভয়ই লিখেছেনঃ

هكذا في رواية الاكثرين وللاصيلي بحذف "غير" هذا
هو اللائق بحاله لانه لم يوافقه احد على جواز السجود
بغير وضوء الا الشعبي ولكن الاصح اثباته لما روى
ابن ابي شيبة كان ابن عمر ينزل عن راحلته
فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما
يتوضأ۔

واما ما روى البيهقي باسناد عن ابن عمر انه قال لا
يسجد الرجل الا وهو طاهر۔ فيجمع بينهما بانه اراد
بقوله وهو طاهر الطهارة الكبرى او يكون هذا
على حالة الاختيار وذالك على حالة الضرورة۔ اه

(فتح البارى۔ ج ٢ ص ٤٤٣)

"অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণের রেওয়ায়েতে 'গাইর' (ব্যতীত) শব্দ সমেত আসারটি বর্ণিত আছে। তবে 'আসিলীর' রেওয়ায়েতে শব্দটি নেই। বস্তুত ইবনে ওমরের (রাঃ) এটা মর্যাদারও অনুকূল। কারণ, বিনা অযুতে সিজদায়ে তিলাওয়াত জায়েয হওয়াকে ইবনে ওমর (রাঃ) সমর্থন করেছেন, একথা ইমাম শা'বী (র) ছাড়া আর কেউ বলেননি। তবে 'গাইর' শব্দসহ আসারটি হওয়ার কথাই অধিকতর সঠিক। কেননা, ইবনে আবূ শাইবাহ (র) ইবনে ওমর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, "ইবনে ওমর (রাঃ) প্রস্রাব করার জন্যে বাহন থেকে নীচে নামলেন। পুনরায় আরোহণ করতঃ আয়াতে সিজদা তিলাওয়াত করতেন এবং অজু ব্যতিরেকে সিজদা

www.pathagar.com

করতেন।" বাইহাকীতে সহীহ সনদসহ ইবনে ওমরের (র) অযু ব্যতীত সিজদা না করার যে বর্ণনা রয়েছে তার সাথে এই বর্ণনার সাজুয্য এভাবে রক্ষা করা যায় যে, বাইহাকীতে বর্ণিত 'তাহারাত' (পবিত্রতা) শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বড় পবিত্রতা। অথবা বাইহাকীর রেওয়ায়েতটি সাধারণ অবস্থার জন্যে এবং অধিকাংশের রেওয়ায়েত জরুরী অবস্থার জন্য প্রযোজ্য।

(ফতহুল বারী, ২য় খন্ড, ৪৪৩ পৃঃ)

উপরোল্লেখিত বাক্যের সার কথা

উপরোক্ত আলোচনার ওপর চিন্তা করা হলে নিম্নোক্ত ধারাগুলো সুস্পষ্ট হয়ে উঠেঃ

(ক) বিনা অযুতেও সিজদায়ে তিলাওয়াত করা ইবনে ওমরের (রা) মতে জায়েয।

(খ) এ ব্যাপারে যে ভিন্নমুখী রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের দু'টি ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে; (১) বাইহাকী বর্ণিত রেওয়ায়েতটি لا يسجد الرجل الا وهو طاهر 'তাহের' বা পবিত্রতা দ্বারা ইবনে ওমরের (রাঃ) উদ্দেশ্য হলো বড় পবিত্রতা। অর্থাৎ নাপাকী বা গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় গোসল ব্যতিরেকে সিজদা করা না জায়েয হওয়া। আর ইবনে আবু শাইবার রেওয়ায়েত فيسجد وما يتوضأ 'তাহারাত' বা পবিত্রতার বড় পবিত্রতা (ফরয গোসল) নয়। বরং অযু না করা। অর্থাৎ ছোট খাটো নাপাকী অবস্থায় সিজদা করা হতো এবং এটা জায়েয।

(২) ইবনে ওমরের (রাঃ) মতে স্বাধীন ও স্বাভাবিক অবস্থায় সিজদায়ে তিলাওয়াতের জন্য তাহারাত এবং অযু করা শর্ত। বাইহাকীর রেওয়ায়েতটি এদিকেই ইংগিত করেছে। জরুরী ও বাধ্য-বাধকতা মূলক অবস্থায় তাহারাত বা অযু করা শর্ত নয়। ইবনে আবু শাইবার রেওয়ায়েত يسجد وما يتوضأ একথারই ইংগীতবহ। আর وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء অর্থাৎ, ইবনে ওমরের (রাঃ) অযু ব্যতীত সিজদা করার তাৎপর্যও এটাই।

ইবনে ওমরের (রাঃ) সাথে এ ব্যাপারে ইমাম শা'বীও একমত পোষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, "বিনা অযুতে সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করা জায়েয এবং তাতে কোনো ক্ষতি নেই।"

www.pathagar.com

হযরত মাওলানা আনোয়ার শাহ সাহেবের (র) ব্যাখ্যা

সমকালীন ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক ও হাদীস বিশারদ আলেম মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী, দেওবন্দী (র) সাহেব তিরমীজীর অধ্যাপনা সময়ে একথার ব্যাখ্যায় বলেছেন, "ইমাম বুখারী (র) এবং ইমাম শা'বী (র) উভয়ই ইবনে ওমরের (রাঃ) মতো বিনা অযুতে সিজদায়ে তিলাওয়াত করাকে জায়েয মনে করতেন এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে তাতে কোনো ক্ষতি নেই।" শাহ সাহেবের (র) বক্তৃতাবলীর সমষ্টি عرف الشذى শীর্ষক গ্রন্থের ১ম খন্ডের ৮ পৃষ্ঠায় ব্যক্ত হয়েছেঃ

واما سجدة التلاوة فقال الشعبي والبخاري لا

يشترط التوضى كما اخرج البخاري عن ابن عمر انه

كان يسجد على غير وضوء - اه

"সিজদায়ে তিলাওয়াতের জন্যে ইমাম শা'বী এবং বুখারীর মতে অযু করা শর্ত নয়। এ উদ্দেশ্যেই ইমাম বুখারী ইবনে ওমরের (রাঃ) অযু ব্যতিরেকে সিজদা করার আসারটিকে উল্লেখ করেছেন।"

উপরোক্ত বাক্য একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, শাহ সাহেবের মতে ইমাম শা'বী (র) এবং ইমাম বুখারী (র) বিনা অযুতে সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করা জায়েয মনে করতেন এবং অজু করা সিজদার জন্যে শর্ত নয়। তা ছাড়া বাক্য দ্বারা একথাও জানা যায় যে, ইমাম বুখারী (রা) ইবনে ওমরের (রা) যে উক্তি উল্লেখ করেছেন তাতে শাহ সাহেবও নিজের এমতের সপক্ষে প্রমাণ ও সমর্থন পেশ করতে চান যে, অযু ছাড়াও এ সিজদা করা জায়েয। শাহ সাহেব ব্যতীত অপরাপর হাদীস ব্যাখ্যাকারীগণ ও এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, ইমাম বুখারীর (র) মতে অযু ব্যতিরেকে সিজদায়ে তিলাওয়াত করা জায়েয; অযু করা শর্ত নয়। তাঁর অভিমতের সমর্থনে এই বিশেষ অধ্যায়ে ইবনে আব্বাসের (র) অত্র হাদীস উল্লেখ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি একথাও উল্লেখ করেন, والمشرك نجس ليس له وضوء "মুশরিক লোক অপবিত্র, যার অযুর প্রশ্ন অবান্তর"।

আবার ইবনে ওমরের আসারও উল্লেখ করেন وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء
"হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) অযু ব্যতীত সিজদায়ে তিলাওয়াত করতেন"

নিম্নে হাদীস ব্যাখ্যাকারদের ব্যাখ্যার প্রতি লক্ষ্য করুন।

www.pathagar.com

হাদীস ব্যাখ্যাকারীগণের দৃষ্টিতে ইমাম বুখারীর অভিমত

এ মাসআলা সম্পর্কে ইমাম বুখারীর (র) মত কি এবং ترجمة الباب দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য কি এ নিয়ে সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাকারগণ মতভেদ করেছেন। উপরোক্ত উক্তি ও আসার উল্লেখ করার উদ্দেশ্য বিনা অযুতে সিজদা করা জায়েয হওয়া কি—না হওয়া। আর والمشرك نجس ليس له وضوء একথার উল্লেখ করার উদ্দেশ্য ইবনে ওমরের (রাঃ) কথা খন্ডন করা কি না? পরন্তু ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েত এখানে উল্লেখ করার উদ্দেশ্যই বা কি?

আমার যতোটুকু ধারণা তাতে কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার তাদের ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারীর এ ব্যাপারে প্রকৃত অভিমত না জানা এবং একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে না পারার কথা বলেছেন। তবে কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার এ সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে, এ বিষয়ে ইমাম বুখারীর মত ছিল বিনা অযুতে সিজদায়ে তিলাওয়াত জায়েয হওয়া। ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েত উল্লেখ করে তাঁর এই মত প্রমাণ করা উদ্দেশ্য যে, সিজদায়ে তিলাওয়াতের জন্যে অযু করা শর্ত নয়। একই ভাবে ইবনে ওমরের (রাঃ) আসারও ترجمة الباب এ বিনা অযুতে সিজদায়ে তিলাওয়াত জায়েয হওয়ার দলীল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

শায়খুল ইসলাম হাফেজ ইবনে হাজর (র) লিখেছেনঃ

وقد اعترض ابن بطال على هذه الترجمة فقال ان اراد
البخاري الاحتجاج لابن عمر بسجود المشركين فلا حجة فيه
لان سجودهم لم يكن على وجه العبادة وانما كان لما
يلقى الشيطان وان اراد الرد على ابن عمر بقوله: والمشرك
نجس فهو اشبه بالصواب -

ইবনে বাত্তাল এই অধ্যায়ে অভিযোগ করেছেন যে, যদি ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য হয় ইবনে ওমরের রেওয়ায়েত দ্বারা মুশরিকদের সিজদা করার দলীল লওয়া তাহলে এখানে দলীল হওয়ার কোনোই অবকাশ নেই। কারণ মুশরিকদের এই সিজদা ইবাদাত হিসেবে ছিল না বরং এটা ছিল শয়তানের প্ররোচনার কারণে। আর যদি والمشرك نجس দ্বারা ইবনে ওমরের (রাঃ)

www.pathagar.com

কথাকে খন্ডন করার ইচ্ছা হয় তাহলে সেটাই বরং অধিকতর বিশুদ্ধ হওয়ার নিকটবর্তী।

ইবনে বাত্তালের উত্থাপিত অভিযোগে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, তিনি ইমাম বুখারীর (র) আসল মযহাব সুস্পষ্টভাবে জ্ঞাত নন। ইমাম বুখারীর ترجمۃ الباب দ্বারা উদ্দেশ্য কি, তাও তিনি জানতেন না। বরং তিনি এ ব্যাপারে বিস্ময়াভিভূত মনে হয়।

কিন্তু ইবনে রশীদ ইবনে বাত্তালের (র) অভিযোগের যে জবাব দিয়েছেন তাতে একদিকে ইমাম বুখারীর (র) আসল অভিমত পরিষ্কার হয়ে যায়, অপরদিকে ترجمۃ الباب এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যও সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়। ইবনে হজর আসকালনী (র) ইবনে রশীদের জবাবটি এভাবে ব্যক্ত করেছেন।

واجاب ابن رشيد بان مقصود البخاريؒ تاكيد مشروعية السجود بان المشرك قد اقر على السجود وسمى الصحابى فعله سجودا مع عدم اهليته فالمتأهل لذالك احرى بان يسجد على كل حالة -

ويحتمل ان يجمع بين الترجمة واثر ابن عمر بان يبعد فى العادة ان يكون جميع من حضر من المسلمين كانوا عند قراءة الآية على وضوء لانهم لم يتاهبوا لذالك - واذا كان كذالك فمن بادر منهم السجود خوف الفوات بلا وضوء واقره النبى صلى الله عليه وسلم على ذالك استدل بذالك على جواز السجود عند المشقة بالوضوء ويؤيده ان لفظ المتن وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس فسوى ابن عباس فى نسبة السجود بين الجميع وفيهم من لا يصح منه الوضوء فيلزم ان يصح السجود ممن كان بوضوء وممن لم يكن بوضوء - اه (فتح البارى ج ۲ ص ۵۵۴)

www.pathagar.com

"ইবনে রশীদ (র) ইবনে বাত্তালের অভিযোগের এই জবাব দিয়েছেন যে, শুধুমাত্র সিজদাকে শরঈ রূপ দেয়াই ইমাম বুখারীর এখানে উদ্দেশ্য। আর সে রূপটি হলো—মুশরিক সিজদার উপযোগী না হওয়া সত্ত্বেও তার এ কাজ সিজদারূপে স্বীকার করে নেয়া এবং সাহাবীও [ইবনে আব্বাস (রাঃ)] তাদের এ কাজকে সিজদাই গণ্য করেছেন। সুতরাং সিজদা করার উপযোগী মুসলমানের সর্বাবস্থায় সিজদা করা জায়েয হওয়ার কথা তো বলাই বাহুল্য। আবার ترجمہ এবং ইবনে ওমরের আসার এভাবেও সামঞ্জস্যশীল হতে পারে যে, আয়াতে সিজদা তিলাওয়াত করার সময় সেখানকার উপস্থিত সকল মুসলমানেরই অযুসহ থাকা সাধারণতঃ বিবেকপ্রসূত নয়। কেননা এজন্যে তাঁরা সকলেই প্রথম থেকেই প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং যারাই সিজদা পরিত্যক্ত হওয়ার আশংকায় বিনা অযুতে সিজদা করলেন তাদেরকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেননি। এতে প্রমাণিত হয় যে, অসুবিধার অবস্থায় বিনা অযুতেও সিজদা করা জায়েয। কথাটির সমর্থনে হাদীসের মতন উপস্থাপন করা যেতে পারে। মতনে আছে—"হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মুসলমান, মুশরিক, জিন, ইনসান সকলেই সিজদা করেছিল।" ইবনে আব্বাস (রাঃ) সমভাবে সকলের কাজকে সিজদা নামে অভিহিত করেছেন। অথচ সে সময় বিনা অযুতে সিজদাকারী লোকও ছিল। তাতে অপরিহার্য রূপে প্রতীয়মান হয় যে, এই সিজদা অযুসহ তো জায়েয, অযু ব্যতীতও নাজায়েয নয়।

জবাবের সার কথা

ইবনে রশীদ (র) ইবনে বাত্তালের অভিযোগের যে জবাব দিয়েছেন তার সার কথা হলো— ইমাম বুখারী বিনা অযুতে সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করা জায়েয মনে করতেন। প্রমাণ ترجمۃ الباب এ উল্লেখিত والمشرك نجس ليس له وضوء. ইবনে ওমরের আসার وكان ابن عمر يسجد على غير এভাবে ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতটিও ইমাম বুখারীর স্বপক্ষে দলীল হওয়ার কারণগুলো নিম্নে লক্ষ্যণীয়ঃ

(ক) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সমাবেশে এই আয়াতে সিজদা তিলাওয়াত করেছিলেন সেখানে লোকের সমাগম হয়েছিল হাজার হাজার। সকলেই পূর্ব থেকে অযু করে তৈরী ছিলেন এমন কথা বুদ্ধিবৃত্তিক হতে পারে না। সকলেই যখন নবীর সাথে সিজদায় শরীক হলেন তিনি তাদের

www.pathagar.com

অযু সম্পর্কে জানতে চাইলেন না ; বরং তাদের এ কাজকে স্বীকার করে নিলেন তখন প্রতীয়মান হলো যে, এই সিজদা নবীর কাছে গ্রহণীয় ও স্বীকৃত হয়েছে। অন্যথায় নবী আলাইহিস সালাম অবশ্যই অস্বীকার করতেন অথবা অন্তত অযুর কথা জিজ্ঞেস তো করতেন।

(খ) দ্বিতীয় কারণ, হাদীসে চার ধরনের লোকের কথা বলা হয়েছে। মুসলমান, মুশরিক, জিন ও ইনসান। তদুপরি সিজদার সম্পৃক্তি সকলের দিকে সমভাবে করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) সকলের কাজকে সিজদা নামে আখ্যায়িত করেছেন। এতে বুঝা যায়, হযরত ইবনে আব্বাসের মতে এটা ছিল শরঈ সিজদা। অন্যথায় তিনি সকলের প্রতি সিজদা সম্পৃক্ত করতেন না এবং একাজকে সিজদা নামেও আখ্যায়িত করতেন না। এই কাজ যখন শরঈ এবং গ্রহণযোগ্য সিজদারূপে সাব্যস্ত হলো অথচ তাদের মধ্যে মুশরিকও ছিল, যাদের শরঈ অযুসহ হওয়ার প্রশ্নই উঠে না, তখন সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সিজদায়ে তিলাওয়াতের জন্য অযু করা শর্ত নয়; বরং অযু ব্যতীতও এই সিজদা আদায় করা যায় এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা জায়েয।

সম্ভবত এই রেওয়ায়েত এবং এ ধরনের অন্যান্য রেওয়ায়েতের কারণে ইবনে ওমর (রাঃ) এবং ইমাম শা'বী (র) এই সিজদার জন্যে অযু শর্ত না হওয়ার নিজস্ব অভিমত কায়েম করেন। ইমাম বুখারীও (র) সম্ভবত এই উদ্দেশ্যেই ইবনে ওমরের (রাঃ) এই আসারটি وكان ابن عمرؓ يسجد على غير وضوء উল্লেখ করেছেন।

সাঈদ বিন মুসাইয়্যিবের (র) অভিমত

শীর্ষস্থানীয় কোনো কোনো শাফঈ মতাবলম্বী আলেমের ব্যাখ্যা অনুযায়ী জানা যায় যে, সাঈদ বিন মুসাইয়্যিবের মতেও সিজদায়ে তিলাওয়াতের জন্যে অযু এবং পবিত্রতা طهارة শর্ত নয়। কেননা তাঁর মতে ঋতুবতী মেয়েলোক আয়াতে সিজদা শ্রবন করতেই তাকে ইশারায় সিজদা করতে হবে। অথচ হায়েজ অবস্থায় মেয়েদের অযু থাকার প্রশ্নই আসে না। ইবনে মুসাইয়্যিবের ফত্ওয়া নিম্নরূপঃ

قال ابن المسيب الحائض اذا سمعت آية السجدة تومى برأسها ايماء وتقول سجد وجهي للذى خلقه وصوره - اه

www.pathagar.com

"সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব বলেছেন, ঋতুবতী মহিলা আয়াতে সিজদা শ্রবণ করতেই মাথার ইশারায় সিজদা করতে হবে এবং বলবে, আমার মাথা সে সত্তার প্রতি সিজদা করছে যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে আকৃতি দানকরেছেন।"

(শা'বানীর মীযান কুবরা, ১ম খন্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা,
রহমতুল উম্মাহ, ১ম খন্ড, ৫৩ পৃষ্ঠা)

সলফের মধ্যে ইবনে মুসাইয়্যিবের (র) মতো ব্যক্তিত্বকে লক্ষ্য করেই মাওলানা মওদূদী (র) বলেছেনঃ

"প্রথম যুগের এমন কিছু ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় যাদের আমল এ ধরনেরছিল।"

তবে একথা সত্য যে, বিনা অযুতে সিজদায়ে তিলাওয়াত করা না জায়েয হওয়ার প্রসংগটি গোটা মুসলিম জাতির মধ্যে ব্যাপকতা লাভ করেনি। বরং সংখ্যা লঘিষ্ট ও সংখ্যা গরিষ্ঠের মধ্যে মত বিরোধরূপে বিরাজমান। এ দিক থেকে প্রসংগটি মৌলিক নয় বরং শাখা বা অংশ বিশেষ। অধিকাংশ আলেমের মতে সিজদার জন্যে অযু করা শর্ত আর কম সংখ্যক আলেমের মতে অযু করা শর্ত নয়। বিনা অযুতে সিজদা করা জায়েয। যেহেতু বিষয়টি বিতর্কিত; সুতরাং কোনো একটি পক্ষের সমর্থকদের গোমরাহ, কাফির বলা কিছুতেই সংগত হতে পারে না। মৌলিক বিষয়কে অস্বীকার করার সাথেই কুফরী বা গোমরাহী সম্পৃক্ত হতে পারে খুঁটিনাটি বা শাখা-প্রশাখাগত বিষয়কে কেন্দ্র করে গোমরাহ বা কাফের বলা মূর্খতা বৈ আর কিছুই না।

এবার মাওলানা মওদূদীর (র) বিরুদ্ধে অভিযোগকারী সুহৃদগণ বুকে হাত দিয়ে বলুন, সাহাবীগণের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ), তাবেঈদের মধ্যে ইমাম শা'বী (র) এবং সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব (র), মুহাদ্দিসগণের মধ্যে ইমাম বুখারী (র) প্রমুখ ইসলামের শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব যখন সিজদায়ে তিলাওয়াত অযু ছাড়া আদায় করা জায়েয মনে করতেন, আর মাওলানা মওদূদী (র) সাহেবও এটাকে জায়েয মনে করেন, তাহলে অভিযোগকারী সুধীজনেরা তাঁকে এবং তাঁর জামায়াতকে কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করলেন? কিংবা সাধারণ অসাধারণ প্রত্যেক সভা-সমিতিতে মাওলানা মওদূদী (র) গোমরাহ এবং তার জামায়াত মুসলমানদের মধ্যে গোমরাহী ছড়াচ্ছেন বলে ডংকা বাজাচ্ছেন কোন্ কারণে?

www.pathagar.com

মওদূদী (র) সাহেব এরূপ মনোভাব ব্যক্ত করার অপরাধে আপনারা যখন তাঁকে গোমরাহ সাব্যস্থ করে থাকেন তাহলে অনুরূপ মতামত পোষণকারী উপরোক্ত মহান ব্যক্তিদেরকে আপনাদের নিক্ষেপিত গোমরাহীর বান থেকে রক্ষা করবেন কি উপায়ে? ফতওয়াবাজীর এহেন প্লাবন দেখে আমাকে বলতেই হয়, আমরা বড় দুর্ভাগা। ব্যক্তিপূজা ও দলীয় গোঁড়ামীর বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে ছোট-খাটো ব্যাপার নিয়ে আমরা একে অপরের খেলাফ এমন বেফাঁস ফত্ওয়া জারী করেছি যার আঘাতে আমাদের প্রথম যুগের এমন মহান ব্যক্তিরাও আহত হচ্ছেন, যাদেরকে আমরা আল্লাহ ও রসূলের সাথে নিজেদের সম্পর্কের মাধ্যম বলে ধারণা করে থাকি। এ ধরনের মাসআলায় মাওলানা মওদূদীর (র) বিরোধিতা করা যারা নিজেদের ফরয কাজ মনে করেন তারা বড়জোর যে অধিকারটুকু পেতে পারে তাহলো মাওলানাকে এ ব্যাপারে শুধুমাত্র একক মনে করা।

কিন্তু তাই বলে মাওলানাকে ব্যক্তিগতভাবে গোমরাহ হওয়ার ফতওয়া দেয়ার অধিকার কারো থাকতে পারে না। অথবা ভুল প্রোপাগাণ্ডার দরুন মাওলানার বিরুদ্ধে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করাও সম্ভব নয়। অন্যথায় একথা তাদের ভালো করে স্মরণ রাখা উচিত, এ ধরনের প্রোপাগাণ্ডা এবং ফতওয়াবাজি দ্বারা মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামীর এতটুকু ক্ষতি হওয়ার পরিবর্তে নিজেদের সকল কৃতিত্বের অট্টালিকা বিধ্বস্ত এবং অর্জিত সুনাম সম্পদের ধ্বংস ঠেকানো সম্ভব নহে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা কোনো মৌলিক মাসআলা নয়

মাসআলার প্রকৃতি এবং শরঈ মর্যাদার সাথে যতোটুকু সম্পর্ক তাতে আমি পূর্ণ আস্থার সাথে বলতে পারি যে, বিষয়টি দ্বীনের এমন বুনিয়াদ ও মৌলিক বিষয় বলে কেউ দাবী করতে পারে না যাতে মতবিরোধ দেখা দিলে কুফর ও ইসলাম, গোমরাহ ও হেদায়াতের দ্বিমুখী পথের সৃষ্টি হতে পারে। অন্যান্য খুঁটিনাটি ব্যাপারের মতো এটাও শাখা প্রশাখাগত ব্যাপার, যার মধ্যে দলিলের ভিত্তিতে দ্বিমত পোষণ করা আগেও জায়েয ছিল এখনও জায়েয। কোনো একটি মত সমর্থনকারীকেও কাফের কিংবা গোমরাহ বলা যায় না।

একইভাবে সিজদায়ে তিলাওয়াতের জন্যে অযু শর্ত করাও মৌলিক বিষয় নয়। এ ব্যাপারে কুরআন হাদীসে এর সুস্পষ্ট নির্দেশও নেই। আজ পর্যন্ত এমন

www.pathagar.com

কোনো আয়াত কিংবা হাদীস পাওয়া যায়নি যার মধ্যে অযু করা শর্ত এবং পবিত্রতা হাসিল করা জরুরী হওয়ার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসের অগাধ ভান্ডারে অযু করা শর্ত হওয়ার একটি সহীহ হাদীস পাওয়া গেলেও ইবনে ওমর (রাঃ), ইমাম শা'বী (র), ইমাম বুখারীর (র) মতো মহান ব্যক্তিবর্গের পক্ষে সেই দলীল ভিত্তিক হুকুমের খেলাফ কাজ করা কিংবা ফতওয়া ঝাড়ার কল্পনাই করা যায় না। অবশ্য চার ইমাম এই বিষয়ের একটি ইস্যুতে এক ও অভিন্ন মত পোষণ করেন কোনো সন্দেহ নেই। ইস্যুটি হলো—তাদের সর্ববাদী মতে সিজদায়ে তিলাওয়াতের জন্য অযু ও তাহারাত শর্ত, অযু ব্যতিরেকে আদৌ জায়েয নয়। তবে এ সত্যও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তাদের এই সিদ্ধান্ত কুরআন-হাদীসের কোনো দলীল ভিত্তিক হুকুমের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। বরং ইজতেহাদী ও উদ্ভাবনী সিদ্ধান্ত মাত্র। আর ইজতিহাদে মতপার্থক্য করা নতুন বিষয় নয়। প্রথম থেকেই মতপার্থক্যের ধারা চলে আসছে। পরন্তু জমহুরের খেলাফ দলীলের ভিত্তিতে অভিমত গ্রহণ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে অপরাধ নহে। ফিকাহের বিস্তারিত গ্রন্থরাজি এ ধরনের এখতেলাফে পরিপূর্ণ। তদুপরি জমহুরের খেলাফ মত পোষণকারী কেবলমাত্র মাওলানা মওদূদীই (র) একক ব্যক্তি নহেন। বরং সিজদায়ে তিলাওয়াতের ব্যাপারে ইতিপূর্বে বহু আলেম, বরেণ্য ইমাম, তাবেঈ ও সাহাবী দ্বিমত পোষণ করেছেন। কিন্তু আজ অবধি কেউ তাদেরকে গোমরাহ বলেনি এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রেপাগান্ডার ঝড় বইয়ে দেয়নি।

মৌলিক মাসায়েলের প্রকৃতি

সিজদায়ে তিলাওয়াত সম্পর্কে প্রথম থেকে জমহুরের গৃহীত নীতিতে নিঃসন্দেহে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। আর এই নীতিই সঠিক হওয়ার অধিক নিকটবর্তী মনে হয়। তাদের গৃহীত নীতি এককভাবে আবদুল্লাহ বিন ওমর অথবা ইমাম শা'বী কিংবা ইমাম বুখারীর গৃহীত নীতির সমান মূল্য কখনো হতে পারে না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে যদি মাওলানা মওদূদী (র) জমহুরের গৃহীত নীতির খেলাফ রায় প্রকাশ না করতেন তবে সেটাই হতো উত্তম ও যুক্তিযুক্ত। মাওলানার রায় জোরালো কিংবা সঠিক হওয়ার অধিক নিকটবর্তী কি-না কথা এটা নয়। বরং কথা হলো—মাওলানা যে বিষয়ে জমহুর আলেমদের সাথে মত পার্থক্য করেছেন সে বিষয়টি মৌলিক কিনা, শরীয়তের অকাট্য দলীল দ্বারা উহা প্রমাণিত কিনা, কিংবা বিষয়টির ওপর

www.pathagar.com

ইজমা হয়েছে কিনা? নাকি বিতর্কিত প্রসংগটি শাখা–প্রশাখাগত? আমার ধারণামতে বিষয়টি ছোটখাটো ব্যাপারের সাথে সংশ্লিষ্ট। শাখা–প্রশাখা কিংবা ইজতিহাদী ব্যাপারে দলীলের ভিত্তিতে অধিকাংশের খেলাফ মত পোষণ করা হারাম নয়, কিংবা গোমরাহও নয়। আর এটাকে কেন্দ্র করে কোনো আলেমকে গোমরাহীর ফতওয়া দেয়াও জায়েয নহে।

মৌলিক বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিলে কোনো এক পক্ষকে গোমরাহ হওয়ার ফতওয়া দেয়া যেতে পারে। মৌলিক বিষয়ের বৈশিষ্ট্য এটাই। মৌলিক বিষয়ের প্রকৃতি হলো—তা কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট আহকাম অথবা উম্মতের সম্মিলিত ফয়সালার ওপর নির্ভরশীল হওয়া। কিন্তু সিজদায়ে তিলাওয়াতের জন্যে তাহারাত শর্ত হওয়া কুরআন–হাদীসের সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয় এবং উম্মতের ইজমাও এ ব্যাপারে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সুতরাং দলীলের ভিত্তিতে জমহুরের সাথে অনৈক্য মত পোষণ করার এখানে অবকাশ রয়েছে। যদিও এটা উত্তম কিংবা কল্যাণকর নহে। অতএব, মাওলানা মওদূদীর (র) দ্বিমত পোষণ করা এ ক্ষেত্রে কখনো হারাম কিংবা গোমরাহী হতে পারে না।

তাছাড়া মাওলানা মওদূদী (র) তার নিজস্ব নীতিতে একক ও নিঃসঙ্গ নন; বরং তিনজন শীর্ষস্তরের আলেম এবং ইমাম তাঁর সমর্থনে পরিদৃষ্ট হয়। সাহাবীদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ), দ্বিতীয় ইমাম শা'বী (র) এবং তৃতীয় ব্যক্তি হলেন হাদীস শাস্ত্রের আমীরুল মু'মিনীন ইমাম বুখারী (র)। মাওলানা মওদূদীর (র) শত শত বছর পূর্বে এহেন শীর্ষ পর্যায়ের আলেম ও ইমাম কর্তৃক গৃহীত রায় ও নীতিকে গোমরাহ বলা চরম ধৃষ্টতা বৈ নয়।

অভিযোগের জবাব

মাসআলার উপরোল্লেখিত ব্যাখ্যার আলোকে যদি মুহতারাম হযরত মাওলানা কাযী মযহার হোসাইন সাহেবের অভিযোগের ওপর চিন্তা করা হয় তাহলে আমার ধারণা মতে তার পৃথক জবাব দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু তবুও সংক্ষিপ্ত জবাব পেশ করছি যাতে সঠিক অবস্থা সুস্পষ্টভাবে সামনে আসে।

www.pathagar.com

প্রথম ধারা

মুহতারাম কাযী সাহেবের উথাপিত অভিযোগের প্রথম ধারায় ব্যক্ত হয়েছে— "মাওলানা মওদূদীর (র) মতে সিজদায়ে তিলাওয়াতের জন্য যখন অযু করা, কেবলামুখী হওয়া এবং যমীনে মাথা রাখা শর্ত নয় তখন এটাকে শরঈ সিজদা নাম দেয়া হয় কেন?" কিন্তু কাযী সাহেব একথা তলিয়ে দেখেননি যে, কোনো বিষয়কে শরীয়তের রূপ দিতে হলে সেটা শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রমাণ হওয়া যথেষ্ট। বিনা অযুতে সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করা জায়েয হওয়া শরীয়তে প্রমাণিত। ইতিপূর্বে এর উপর প্রমাণ সিদ্ধ আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং এটাকে শরঈ সিজদা বলাতে দোষের কিছু নেই।

আমরা কি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারি যে, কোনো কাজ শরঈ হওয়ার জন্যে যদি অযু অবস্থায় আদায় করা জরুরী হয় কিংবা কিবলাহমুখী হওয়া শর্ত হয়, তাহলে মেহেরবানী করে জবাব দেয়া হোক বিনা অযুতে তিলাওয়াতে কুরআনকে শরঈ তিলাওয়াত বলা হবে কিনা? যদি তাই হয়, তাহলে বিনা অযুতে তিলাওয়াতকে শরঈ নাম দেয়ার হেতু কি? বিনা অযুতে তিলাওয়াতের সিজদা দিলে তাকে শরঈ সিজদা নাম দিতে আপনি প্রস্তুত নন, অথচ উভয়টিই শরীয়ত কর্তৃক প্রমাণিত এবং উভয় কাজেই অযু করার নির্দেশ নেই।

এভাবে যদি কোনো ব্যক্তি শহরের বাহিরে নিজের বাহনের উপরেই নফল নামায পড়ে নেয় তাহলে ফকীহদের মতে এ নামায সঠিক হবে। তার কিবলাহমুখী হওয়াও জরুরী নয়। আবু দাউদের একটি হাদীসে বর্ণিত আছে— নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার বাহিরে বাহনের উপরে নফল নামায পড়েন; তখন তিনি কিবলাহমুখী ছিলেন না। "এমতাবস্থায় যমীনে মাথা রাখাও শর্ত নয় বরং ইশারাই যথেষ্ঠ" ফকীহগণ এ মতও প্রকাশ করেছেন।

এ ধরনের নামায সকল ফকীহের মতে জায়েয এবং শরীয়ত সম্মত। অথচ এ নামায কিবলাহমুখী হয়ে যমীনে কপাল রেখে অনুষ্ঠিত হয়নি। সুতরাং সিজদায়ে তিলাওয়াতে এমন কি বৈশিষ্ট্য আছে যে, তা শরঈ নামে অভিহিত হওয়ার জন্যে কিবলাহমুখী হওয়া এবং যমীনে কপাল রাখা জরুরী? আপনার কাছে এর যুক্তিগ্রাহ্য কারণ থাকলে তা পেশ করা হোক। বিগত আলোচনায়

www.pathagar.com

মীযানের বরাত দিয়ে সাঈদ বিন মুসাইয়্যেবের যে রায় আমি পেশ করেছি সেখানে ঋতুবতী মেয়েদের ইশারাপূর্ণ সিজদাকে কি সিজদা নামে আখ্যায়িত করা হয়নি? সেখানে কি এ বাক্য বর্ণিত নেই- سجد وجهي للذي خلقه وصوره

দ্বিতীয় ধারা

মুহতারাম জনাব কাযী সাহেবের অভিযোগের দ্বিতীয় ধারাটি হলো—"জমহুরের খেলাফ ফতওয়া দানে মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি হয় এবং জাতীয় ঐক্যে ফাটল দেখা দেয়। সুতরাং জমহুর বিরোধী ফতওয়া দেয়া জায়েয নেই বরং স্বার্থ কেন্দ্রিক বিষয়।"

জবাব

জমহুর বিরোধী ফত্ওয়া দানে মুসলিম ঐক্যে ফাটল ধরে, অনৈক্য সৃষ্টি হয় এবং জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হয় অথবা এর অর্থ আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তি স্বার্থ হাসিল করা এ তথ্য কাযী সাহেব কোথেকে আবিষ্কার করলেন তা আমাদের জানা নেই। ইবনে ওমরের (রাঃ) মতো ব্যক্তিত্বও এ ব্যাপারে জমহুর বিরোধী ফতওয়া দিলেন, ইমাম শা'বী (র) অধিকাংশ আলেমের খেলাফ মত প্রকাশ করলেন এবং ইমাম বুখারীও (র) এ বিষয়ে জমহুরের সাথে একাত্ম হতে পারলেন না; বরং বিরোধিতা করলেন। তাহলে আপনি কি এ দুঃসাহস দেখাতে চান যে, এসব বিশ্ব বরেণ্য মনীষীগণ জমহুর বিরোধী ফতওয়া দিয়ে মুসলিম ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছেন কিংবা অনৈক্য সৃষ্টি করেছেন বা এ ধরনের তৎপরতা আত্মকেন্দ্রিক ও ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধার প্রণোদিত? তাছাড়া আপনি কি বলতে পারবেন যে, চার মযহাবের ইমামদের মধ্যে বিরাজমান বিতর্কিত মাসআলা কোনো ইমামের রায় জমহুরের খেলাফ নেই? আপনার ইমামে আযম আবূ হানিফাকে (র) যিনি শত সহস্র খুঁটিনাটি ব্যাপারে জমহুর বিরোধী অভিমত ব্যক্ত করেছেন—কিভাবে মূল্যায়ন করবেন? এ সমস্ত ইমামবর্গও ইসলামের ঐক্যে ফাটল এবং অনৈক্য সৃষ্টি করেছিলেন কি? অথবা (মায়াযাল্লাহ) ইমাম চতুষ্টয় সহ উপরোল্লেখিত মনীষীগণ কি নিছক আনন্দের আতিশয্যে এ ধরনের জমহুর বিরোধী ফতওয়া দিয়েছেন? এসব প্রশ্নের জবাব যদি না বোধক হয় তাহলে জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা মওদূদী সাহেবের (র) একটি ফতওয়া দানে আপনারা তাঁর ওপর এতো নাখোশ কেন? তাঁর ফতওয়ায় মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য এবং মুসলিম ঐক্যে ফাটল ধরবে কেন?

www.pathagar.com

মুহতারাম ভাই সাহেব! মুসলিম ঐক্যে অনৈক্য জমহুর বিরোধী মত প্রকাশে সৃষ্টি হয় না। অনৈক্য, মত পার্থক্য ও ফাটলের সৃষ্টি হয় আপনাদের মতো আলেমদের ভুল নীতি ও অযাচিত কর্ম তৎপরতায়। আপনারা ভদ্রমহোদয়গণ ছোট-খাটো, খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলোকে বড় বড় মৌলিক বিষয়ের মর্যাদা দিয়ে রেখেছেন। এসব ছোট-খাটো ব্যাপারে আপনাদের গৃহীত মতামতের বিরোধী মত প্রকাশ করতেই আপনাদের কুফরী, গোমরাহী, ফাসেকী ইত্যাকার ফতওয়াবাজী শুরু হয়ে যায় এবং একে কেন্দ্র করে তার বিরুদ্ধে মুসলমানদের মধ্যে প্রোপাগান্ডা করার তুলকালাম কান্ড শুরু করে দেন। সাধারণ নিরীহ মুসলমানদের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল করতে আপনারাই উঠে পড়ে কোমর বেঁধে লেগে যান যে, এই লোকটি নিজে গোমরাহ এবং অপরকেও গোমরাহ করার পায়তারা করছে, সে আহলে সুন্নাত জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন। তার সংগঠন মুসলমানদের মধ্যে গোমরাহী ও বেদ্বীনী প্রচার ও প্রসার করে বেড়ায়। আপনাদের এ ধরনের কথা ও প্রোপাগান্ডায় সরল প্রাণ মুসলমানগণ প্রভাবিত হয়। ফলে তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য দেখা দেয়া স্বাভাবিক। আপনাদের ন্যায় শিষ্ট লোকরা যদি নিজেদের পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দের পদাংক অনুসরণ করে অন্যান্যদেরকেও শাখা-প্রশাখাগত বিষয়ে ভিন্ন মত প্রকাশ করার অধিকার দিতেন এবং আপনাদের গৃহীত মতের খেলাফ দলীলভিত্তিক ফতওয়া শুনতে মন-মানসিকতাসহ তৈরী থাকতেন, তাহলে কখনো এই হৈ-হুল্লোড় সৃষ্টি হতো না আর কোনো অপ্রীতিকর অবস্থাও দেখা দিতো না। সুতরাং আজকের এই হাংগামা ও হৈ চৈ আপনাদের ভ্রান্ত নীতি ও অযাচিত কর্ম তৎপরতার ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট। অপরের ঘাড়ে এর দায় দায়িত্ব চাপানো সত্যের অপলাপ নয় কি? বরং এটা একটি চক্রান্ত যা প্রতিপক্ষের উপর চাপিয়ে দেয়ার অশুভ পাঁয়তারায় সৃষ্ট।

তৃতীয় ধারা এবং তার জবাব

আপত্তির তৃতীয় ধারা হলো "বিস্ময়কর ব্যাপার যে, আপনি নিজের স্বপক্ষে প্রথম যুগের মনীষীবৃন্দের উক্তিসমূহ পেশ করছেন, অথচ তারা তো আপনার মতে সত্যের মাপকাঠিই নয়। আপনার ফতওয়ার ওপর কুরআন-হাদীসের প্রমাণ থাকলে তা গ্রহণ করার প্রশ্ন ছিল।" মাওলানার উক্তি সজ্ঞাত।

মুহতারাম জনাব কাযী সাহেব এখনো 'মিয়ারে হক' এর ব্যাপারে জামায়াতে ইসলামী ও মাওলানা মওদূদীর (র) ভূমিকা সম্পর্কে একেবারেই

www.pathagar.com

অনবহিত। সম্মানিত সাহাবীগণ সত্যের মাপকাঠি হওয়া না হওয়া সম্পর্কে জামায়াত ও মাওলানার (র) দৃষ্টিভংগী কখনো এ রূপ ছিল না যে, সাহাবীদের কথা ও কাজ দলীল হতে পারে না। বরং এ ব্যাপারে তার ভূমিকা হলো কুরআন-হাদীসের কষ্টিপাথরে সাহাবায়ে কিরামদের কথা ও কাজ যাচাই বাছাই করা হবে। যাচাই-বাছাই করার পর যে কথাই কুরআন-হাদীসের আলোকে উত্তীর্ণ হবে তা হবে গ্রহণীয় আর বিরোধী হলে সেটা হবে বর্জনীয়। মাওলানা মওদূদী (র) অথবা জামায়াতে ইসলামী সাহাবীগণের কথা ও কাজকে দলীল মনে করে না–এমন কথা নির্জলা মিথ্যা এবং সরাসরি অপবাদ। এহেন অপবাদ থেকে মুক্ত থাকার কথা তিনি একাধিক বার প্রকাশ করেছেন।

এবার মাওলানা মওদূদীর (র) উপরোল্লেখিত ভূমিকার আলোকে আপত্তির তৃতীয় ধারার জবাব দেয়া যেতে পারে। ইবনে ওমরের (রাঃ) উক্তি উল্লেখ করে মাওলানা মওদূদীর (র) দলীল পেশ করার কারণ হলো একথাটি যাচাই-বাছাই করার পর মারফু' রেওয়ায়েতের সাথে সুসামঞ্জস্যশীল হিসেবে প্রমাণিত ও স্বীকৃত এবং হাদীসের অফুরন্ত ভান্ডারে সহীহ সনদসহ স্থান প্রাপ্ত। এ কারণেই ইবনে ওমরের (রাঃ) কথা এ ব্যাপারে দলীল হতে পারে। অথবা এ উক্তি অন্তত সিজদায়ে তিলাওয়াতের জন্যে অযু করা শর্ত না হওয়ার ব্যাপারে সহায়ক হতে পারে। তাছাড়া জনাব কাজী মযহার হোসাইন সাহেব একথার ওপরও নজর দেননি যে, মাওলানা মওদূদী (র) সাহেব আসল মাসআলা বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ ও তিরমীযীতে উল্লেখিত মারফু এবং সহীহ রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণ করেছেন। এসব কথার প্রতি আমরা প্রথমেই আলোকপাত করেছি। ইবনে ওমর (রাঃ) সহ অন্যান্য সলফে সালেহীনের কথা সেসব দলীলের সমর্থনে মাওলানা মওদূদী (র) পেশ করেছেন যাতে জানা যায় যে, এহেন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বুযুর্গানও এই প্রক্রিয়ায় সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করতেন। "আপনার মতে সলফে সালেহীন মিয়ারে হক নয়"। মাওলানার মন্তব্য সূবাদে এ ধরনের আপত্তি করার কানাকড়িও মূল্য না থাকা এবার সহজেই অনুমেয়। "কুরআন-হাদীসের দলীল পেশ হলে তা গ্রহণীয় হওয়ার যে দাবী আপনি করেছেন তা আপনার মনের সঠিক অভিব্যক্তি বলে মনে হয় না। কারণ মাওলানা মওদূদী (র) এ বিষয়ে যে রায় ব্যক্ত করেছেন তার ভিত্তি হলো সহীহ রেওয়ায়েত এবং মারফু হাদীসসমূহ যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। কৈ, আপনি তো তা গ্রহণ করেন নি।

www.pathagar.com

দাঁতভাংগা জবাব

একথা ক্ষণিকের তরে যদি আমরা মেনে নেই যে, মওদূদী (র) সাহেবের মতে সলফে সালেহীন মূলত 'মিয়ারে হক' নয় এবং ইবনে ওমরের (রা) কথায় দলীল পেশ করা সঠিক নয়, তাহলে আপনার মতে তো তাঁরা 'মিয়ারে হক' অথচ ইবনে ওমরের (রা) অযূ ব্যতীত সিজদায়ে তিলাওয়াত করার প্রক্রিয়া সহীহ্ রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও সে কথা আপনার অমান্য করার প্রতিকার কি? একদিকে আপনি সাহাবায়ে কিরামদেরকে সত্যের মাপকাঠি মনে করেন এবং তাদের প্রত্যেক কথা ও কাজের অনুসরণ করাকে ওয়াজিব মনে করেন আর যে কেউ এমন মনে করবে না সে গোমরাহ হয়ে যাবে; অপরদিকে আপনি নিজেই ইবনে ওমরের (রাঃ) মতো একজন সাহাবা তথা সলফে সালেহীনের অভিমতের ইত্তেবা করাকে ওয়াজিব মনে করা তো দূরের কথা জায়েযও মনে করেন না। এবার আপনি নিজেই বলুন, সাহাবায়ে কিরামদের 'মিয়ারে হক' হওয়ার আকীদা এবং আপনার কর্মপদ্ধতির সাথে মিল কতটুকু আছে?

অতপর আসুন আপনার পরবর্তী অভিযোগে। আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (র) তাঁর লিখিত 'ফয়জুল বারীতে' এ বিষয়ে ইবনে ওমরের (র) অভিমতকে নিশ্চিত নয় বরং সন্দেহ যুক্ত বলেছেন। কেননা ওসাইলীর وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء রেওয়ায়েতে غير শব্দটি অনুপস্থিত। এর জবাবে আমার বক্তব্য– একথায় একমত হওয়া মুশকিল। কেননা, প্রথমতঃ শাহ্ সাহেবের (র) বক্তব্য এ ব্যাপারে স্ববিরোধী। 'আরফে শাযীর' প্রথম খন্ডের ৮ পৃষ্ঠায় শাহ্ সাহেবের (র) যে বক্তব্য লিপিবদ্ধ আছে তাতে দেখা যায় ইবনে ওমর (রাঃ), ইমাম শা'বী এবং ইমাম বুখারী এই তিন মনীষী অযূ ব্যতিরেকে সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করা জায়েয মনে করতেন।"

'দ্বিতীয়তঃ ওসাইলির রেওয়ায়েতে যদিও غير শব্দটির অনুপস্থিতি দেখা যায় কিন্তু তাতেও ইবনে ওমরের (রাঃ) অভিমত সন্দেহযুক্ত হতে পারে না। কেননা, হাফেজ ইবনে হাজর (র) এবং আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) এই দুই হাদীস বিশারদ তাঁর অভিমতটি স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন এই মন্তব্য দ্বারা যে, غير শব্দসহ রেওয়ায়েতটিই অধিকতর সহীহ ও বিশুদ্ধ। ফতহুল বারীর ২য় খন্ডের ৪৪৩ পৃষ্ঠায় হাফেজ ইবনে হাজর আসকালানী (র) লিখেছেন

www.pathagar.com

ولكن الا صح اثباته সুতরাং নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ইবনে ওমরের (রাঃ) মতে অযু ব্যতিরেকে সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করা জায়েয।

ইবনে ওমরের (রাঃ) মতে অযু ব্যতিরেকে সিজদায়ে তিলাওয়াত করা জায়েয হওয়া যখন নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হলো তখন আপনাকে দু'টি কথার একটি অবশ্যই মানতে হবে। হয় সিজদায়ে তিলাওয়াতের জন্যে অযু করা শর্ত নয় এ সত্য আপনাকে স্বীকার করতেই হবে। এমতাবস্থায় মওলানা মওদূদী সাহেবের ওপর আপনার অভিযোগ করার অধিকার অবশিষ্ট থাকে না। অথবা যদি আপনি শর্ত হিসেবে মেনে নেন তাহলে সাহাবায়ে কিরাম মিয়ারে হক এবং সর্বাবস্থায় তাদের প্রতিটি কথা ও কাজের অনুসরণ অপরিহার্য হওয়ার আপনার তথাকথিত আকীদা নস্যাৎ এবং তাঁদের কোনো কথা ও কর্মের পর্যালোচনা জায়েয না হওয়ার বিশ্বাস নির্মূল হয়ে যায়। এবার কোন্ দিকে যাবেন? সেটাই দেখার বিষয়। فهل الى خروج من سبيل ؟

চতুর্থ ধারা এবং তার জবাব

মুহতারাম জনাব কাযী সাহেবের অভিযোগের চতুর্থ ধারা হলোঃ

"যে শ্রেণীর লোকদের জন্যে আপনি দ্বীনকে সহজ করার প্রক্রিয়া খুঁজছেন; তারাই যদি কালকে আপনার কাছে এসে আব্দার করে বসে, সিজদায়ে তিলাওয়াত আল্লাহর জন্যে সিজদায়ে নামাযও তো আল্লাহরই জন্যে। তাহলে সিজদায়ে নামাযের জন্যে অযু করা জরুরী কেন। তারপর তারা আপনার ইজতিহাদের পরিপ্রেক্ষিতে অযু ব্যতীত নামায আদায় শুরু করে দিলে সে অবস্থায় আপনার নিকট এর প্রতিকার কি হবে?"

মুহতারাম কাযী সাহেবের "সহজ পন্থার অন্বেষণ" বাক্য দ্বারা যদি উদ্দেশ্য হয় মাওলানা মওদূদীর (র) দ্বীনে এমন সহজ প্রক্রিয়া খোঁজার অন্বেষণ করা যার অবকাশ আদৌ নেই অথবা তাতে দ্বীনের বিধি-নিষেধে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়ে যায় তাহলে এটা হলো সেই কুধারণার পরিণতি এসব ভদ্র মহোদয়গণ যার ঘূর্ণীচক্রে দীর্ঘদিন যাবত মাওলানা মওদূদী (র) সম্পর্কে নিমগ্ন আছেন। অন্যথায় সিজদায়ে তিলাওয়াতের জন্যে অযু করা শর্ত না মানলে দ্বীনের কোনো হুকুমে পরিবর্তন আসে না। আর এটা এমন কোনো সহজতাও নয় যা মেনে চলার অবকাশ শরীয়তে দেয়া হয়নি। আবদুল্লাহ বিন ওমর (র), ইমাম শা'বী, ইমাম বুখারীও কি দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন প্রয়াসী ছিলেন?

www.pathagar.com

অথবা তাঁরা কোনো বিশেষ শ্রেণীর জন্যে এমন সহজ ব্যবস্থা প্রবর্তন করে দিলেন যা করার অনুমতি তাঁদের ছিল না? আদৌ না, এহেন চিন্তা না করাই ভাল। আমরা সূচনাতে যেসব হাদীসের কথা আলোচনা করেছি তাতে সিজদায়ে তিলাওয়াতের জন্যে অযূ করা শর্ত না হওয়ার অবকাশ পাওয়া যায়। অন্যথায় ইবনে ওমর (র), ইমাম শা'বী (র) এবং ইমাম বুখারীর (র) মতো মনীষীগণ কখনো এ মত পোষণ করতেন না যে, সিজদায়ে তিলাওয়াতের জন্যে অযূ থাকা শর্ত নয়।

মুহতারাম কাযী সাহেবের 'সহজ পন্থার অন্বেষণ' বাক্যাংশ দ্বারা যদি শরীয়তের স্বীকৃত সহজ যা শরীয়তের পরিভাষায় 'রুখসত' নামে অভিহিত হয় এবং যা জরুরী সময়ে কোনো বিশেষ শ্রেণীর জন্যেই নয় বরং গোটা উম্মতের জন্য তদানুযায়ী আমল করা জায়েয, তাহলে মওদূদী সাহেবের (র) ওপর এই অপবাদের বোঝা কোন্ কারণে? الدين يسر (দ্বীন সহজ) এবং يسروا ولا تعسروا- (সহজ কর, কঠিন করো না) এসব কথা কি ইসলামের স্বতন্ত্র নীতি নয়? এবার আসুন, আপনার আশংকানুযায়ী এক শ্রেণীর লোকদের বিনা অযুতে নামায পড়ার আব্দার প্রসংগে। এ সম্পর্কে আপনাকে আমরা নিশ্চিয়তা দিতে পারি যে, কোনো মুসলমানই এহেন ভ্রান্তির শিকার হতে পারে না। কারণ, কলেমায় বিশ্বাসী প্রত্যেক মুসলমানের কাছে এ সত্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, নামাযের সিজদা এর অঙ্গসমূহের অন্যতম। নামাযের জন্য অযূ করা শর্ত হওয়ার কথা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন مفتاح الصلوة الطهور (নামাযের চাবি অযু)। আরো ঘোষণা করেছেন لا يقبل الله صلوة بغير طهور (আল্লাহ পবিত্রতা বা অযূ ছাড়া নামায কবুল করেন না) বস্তুত সিজদা নামাযের প্রধান অংগের অন্যতম বিধায় এখানে নামাযের صلوة জন্যে طهور অযুর কথা বলা হলেও তা প্রকারান্তে সিজদা বা অন্যান্য প্রধান অংগেও প্রযোজ্য হবে। সুতরাং নামাযের সিজদার জন্যে অযূ করার নির্দেশটি কুরআন-হাদীসের দলিল সুস্পষ্টভাবে বর্তমান। অপরদিকে সিজদায়ে তিলাওয়াতের জন্য অযূ শর্ত হওয়া প্রমাণ সিদ্ধ নয়। কুরআন হাদীস ভিত্তিক এমন কোনো প্রমাণ দাঁড় করানো যাবে না যা সিজদায়ে তিলাওয়াতের জন্যে অযূ করা শর্তরূপে প্রমাণ করা সম্ভব।

www.pathagar.com

এতোবড় সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একজন মুসলমান কিভাবে এই অহমিকার শিকার হতে পারে যে, সিজদায়ে তিলাওয়াতের জন্যে অযূ করা যখন শর্ত নয় তখন সিজদায়ে সালাতের জন্যেও শর্ত হতে পারে না। বিনা অযুতে নামাযের সিজদাও জায়েয। ধরুন, এমন একটা শ্রেণী মিলেও গেল যারা উভয়ের পার্থক্য থেকে দৃষ্টি এড়িয়ে উভয় সিজদাকে একই পর্যায়ে রাখতে সচেষ্ট। এই শ্রেণীর লোকদের নিয়ে আপনাদের দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত না হওয়া উচিত। কেননা এ শ্রেণীর লোকদেরকে সঠিক পথ নির্দেশনা দিতে, বুঝাতে আল্লাহ তায়ালা মাওলানা মওদূদীকে জ্ঞান, বিচার-বুদ্ধি অযাচিতভাবে দান করেছেন। এই পর্যায়ের লোকদের মনে সৃষ্ট অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও যুগ জিজ্ঞাসার যথার্থ ও যুক্তিগ্রাহ্য জবাব দেয়ার ক্ষমতা আল্লাহ তাঁকে দান করেছেন। শুধুমাত্র পাকিস্তানে নয়; বরং গোটা ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন জাতি, দল ও মতের সাথে সম্পৃক্ত অগণিত যুবক, ইসলামের সহজ সরল পথ পরিহার করে নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতার আবর্তে ঘূর্ণায়মান, এমনকি খৃষ্টবাদে দীক্ষা নিতে উদগ্রীব, এ জাতীয় বহু লোক মাওলানা মওদূদী (র) রচিত সাহিত্য ভান্ডার হাতে নিয়ে সেসব বেড়াজাল ছিন্ন করে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে ফিরে এসেছে। তারা নিজেরা ফিরে এসেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং অন্যান্য পথহারা লোকদেরকেও ইসলামের সহজ সরল পথে ফিরিয়ে আনতে জীবনপন সংগ্রামে রত আছেন। এমতাবস্থায় যদি এমন একটি গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়েই যায় যার, সিজদায়ে তিলাওয়াত ও সিজদায়ে সালাতের পার্থক্য এড়িয়ে যাবে তাদেরকেও সঠিক পথের নির্দেশ দান করতে মাওলানা মওদূদী (র) প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন। কিন্তু শর্ত হলো সে বিভ্রান্ত দলটিকে আপনাদের ন্যায় বুযুর্গেরা গোমরাহী ও পথ ভ্রষ্টতার অতলে তলিয়ে না দিলেই হয়।

একটি সত্যের প্রকাশ

বিষয় বস্তুর শেষ পর্বে একথা আরজ করা কর্তব্য মনে করছি যে, জমহুরে সাহাবা, অধিকাংশ তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈ এবং চার মযহারের সকল ইমামগণই সিজদায়ে তিলাওয়াতের জন্য অযু করা শর্ত হওয়ার ব্যাপারে একমত সেটা অস্বীকার করার কোনোই অবকাশ নেই।

জমহুরের অভিমতে সাবধানতা বেশী। যে কারণে উহা বিশুদ্ধির অধিকতর নিকটবর্তী হওয়ার সন্দেহাতীত প্রমাণ। জমহুরের গৃহীত সিদ্ধান্তের যে মূল্য তা

www.pathagar.com

এককভাবে আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) অথবা ইমাম শা'বী (র) কিংবা ইমাম বুখারীর (র) রায়ের মধ্যে কখনো হতে পারে না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে মাওলানা মওদূদী (র) যদি এ বিষয়ে জমহুরের রায়ের সাথে একাত্ম হতে পারতেন তাহলে সেটাই ছিল উত্তম। জমহুরের মুকাবিলায় ২/৪ জন লোকের রায় এবং ইজতিহাদের ওপর ভিত্তি করে কোনো সিদ্ধান্তে পৌছা কিংবা তাঁদের থেকে আলাদা ইজতিহাদ করে তাতেই স্থবির থাকা কোনোক্রমেই কল্যাণকর হতে পারে না[১] তবে এই মতটি জোরালো এবং সঠিক হওয়া অধিকতর কাছাকাছি কিনা একথা আলোচনা করা উদ্দেশ্য নয় বরং দেখার বিষয় হলো মাওলানা মওদূদী (র) এ বিষয়ে জমহুরের সাথে যে মতপার্থক্য করেছেন সেটা ইসলামের কোনো মৌলিক বিষয় কিনা এবং যে মত প্রকাশ করেছেন তা শরঈ নস্ কিংবা ইজমায়ে উম্মতের খেলাফ রায় কি না। আমার যতোটুকু ধারণা তাতে মনে হয় এই বিতর্কিত বিষয়টি ছোট-খাটো এবং ইজতিহাদী বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। খুটীনাটি ও ইজতিহাদী বিষয়সমূহে অধিকাংশের খেলাফ মত প্রকাশ করা প্রবৃত্তি তাড়নার ভিত্তিতে না হয়ে শরঈ দলীলের ভিত্তিতে হলে তখন সেটা গোমরাহী হবে না কিংবা এটা কোনো নতুন কথাও নয়। এটা কোনো ক্রমেই এমন কোনো মতপার্থক্য নয় যাকে কেন্দ্র করে কাউকে হেদায়াত প্রাপ্ত অথবা পথভ্রষ্ট বলা যেতে পারে। হেদায়াত ও গোমরাহীর বুনিয়াদ তো কেবল সেসব ইখতিলাফেই হতে পারে, যেগুলো আকীদার সাথে সম্পর্কীত কোনো মৌলিক বিষয়ে সৃষ্ট। ছোট-খাটো ও শাখা-প্রশাখাগত বিষয় নিয়ে আপোষে মতপার্থক্য করলে হেদায়াত ও গোমরাহীর সাথে আদৌ সম্পর্কীত হতে পারে না। সুতরাং এ ধরনের সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে কাউকে গোমরাহ বলা দ্বীনের কোনো উপকারী খেদমত হতে পারে না এবং এ ধরনের তৎপরতা দ্বীনের জন্য কোনো কল্যাণও বয়ে আনে না।

শেষ নিবেদন

এ ব্যাপারে ওলামায়ে দ্বীনের কাছে আমাদের শেষ নিবেদন, বর্তমান সময় ইসলামের ক্রান্তি লগ্ন। শত্রুরা চতুর্দিক থেকে আঘাত হানার জন্যে মারমুখী

১. স্মর্তব্য, মাওলানা মওদূদী (র) তাফহীমুল কুরআনের ২য় খন্ডের ১১৬ পৃষ্ঠায় সিজ্দায়ে তিলাওয়াতের আলোচনায় একথা সংযোজন করে দিয়েছেন "জমহুরের অভিমতই অধিকতর নির্ভরশীল"।

www.pathagar.com

হয়ে আছে। এই নাযুক অবস্থায় সব ধরনের দলাদলি ও কাঁদা ছোঁড়াছুড়ি পায়ে-দলে শত্রু কর্তৃক আঘাত প্রাপ্ত ইসলামের মৌলিক উৎসগুলোকে মজবুত ও অপ্রতিহতরূপে গড়ে তোলার জন্যে সংগ্রাম শুরু করা অপরিহার্য কর্তব্য যা সাধারণভাবে সমগ্র মুসলমানের আর বিশেষ করে ওলামায়ে দ্বীনের উপর ন্যস্ত। ইসলাম বিরোধী চক্রের মুকাবিলায় শিষাঢালা প্রাচীরের ন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে রুখে দাঁড়ানো আজকের দিনের ফরয কাজ। অন্যথায় সেদিন খুব বেশী দূরে নয় যেদিন ধর্মহীন শক্তি দ্বীন ও মযহাবের মৌলিক উৎসের উপর আঘাত হেনে উল্লেখযোগ্য সফলতা লাভ করবে। তখন এসব ইখতেলাফ কিংবা ইখতেলাফ কারী আলেম সমাজ কারো অস্তিত্ব টিকে থাকবে না। সর্বোপরি অনাগত ভবিষ্যৎ বংশধরগণের ভাগ্যে এর চাইতে মর্মান্তিক ও বিষাদময় ঘটনা দ্বিতীয়টি দেখা যাবে না।

والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

মুতআ প্রসংগ

যেসব বিতর্কিত মাসাআলা কেন্দ্র করে কোনো কোনো ইলমী মহল মাওলানা মওদূদীর (র) ব্যক্তিত্বে কালিমা লেপনের অপচেষ্টা করেছেন এবং যেসব বিষয়ে মাওলানা সাহেবের (র) ইজতিহাদী রায় এবং ইলমী গবেষণার ওপর অভিযোগের ঝড় বইয়ে দিয়েছেন তন্মধ্যে মুতআ প্রসংগ অন্যতম।

এ বিষয়ে আলেমদের পক্ষ থেকে অভিযোগের যে সুর ধ্বনিত হয়েছে তা হলোঃ

"মাওলানা মওদূদী (র) 'ইখ্‌তিরার'[১] অবস্থায় 'মুতআ'[২] 'মুবাহ' [৩] হওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন এবং সে অবস্থায় জায়েয হওয়াকে স্বীকার করেছেন। অথচ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সকলের মতে 'মুতআ' কোনো অবস্থাতেই জায়েয ও মুবাহ নয়। বরং ইযতিরার ও ইখ্‌তিয়ার (স্বাভাবিক) উভয় অবস্থাতেই সম্পূর্ণ হারাম। হারাম হওয়ার ব্যাপারে গোটা আলেম সমাজ একমত। অবশ্য শিয়া আলেমগণ 'মুতআ'কে জায়েয মনে করেন। কিন্তু তারা আহলে সুন্নাত দলভুক্ত নয়। 'মুতআ' সর্বাবস্থায় হারাম হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত আহলে সুন্নাত জামাত সম্পূর্ণভাবে ঐক্যবদ্ধ। এতে ইখতিয়ার ও ইযতিরারের কোনো পার্থক্য নেই।" এ মাসআলা নিয়ে যে হযরতগণ মাওলানা মওদূদীর (র) সমালোচনায় মুখর হয়েছেন তারা লিখনে ও কথনে এমন নীতি গ্রহণ করেছেন যা অত্যন্ত পরিতাপ জনক। অন্তত একজন আল্লাহভীরু আলেমের শান কিছুতেই এরূপ হতে পারে না। এ পর্যায়ে উচ্চস্তরের বহু দ্বীনদার ও সূফীদের পা সত্য পথ থেকে হোঁচট খেয়েছে এবং তাঁরা ন্যায় নীতি বিসর্জন দিয়েছেন।

এ বিষয়ে যারা মাওলানা মওদূদীর (র) প্রাথমিক ও শেষের উভয় ধরনের লেখা পড়েছেন, দেখেছেন, 'মুতআ' সম্পর্কে মাওলানার (র) দৃষ্টিভংগী

---

১. যে অবস্থায় নাজায়েয কাজ করতে বাধ্য হয়।

২. অস্তবর্তীকালীন বিবাহ।

৩. অনুমোদিত– অনুবাদক।

www.pathagar.com

পরিজ্ঞাত হয়েছেন এবং ঘটনার মূল তত্ত্ব সম্পর্কেও ভালোরূপে অবগত হয়েছেন তারা একথা যথার্থভাবেই বলতে বাধ্য যে, এ ব্যাপারে সমালোচনাকারী সুধীগণ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। এবং গোঁড়ামির বদনাম থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারেননি। বরং সত্য গোপন করার অপচেষ্টা করেছেন যা তাদের ইলমী মর্যাদা ও ধর্মীয় অনুভূতির সাথে কোনোক্রমেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আমাদের ইচ্ছা, পরবর্তী আলোচনায় প্রকৃত ঘটনার সঠিক তত্ত্ব মাওলানা মওদূদীরই (র) লেখার আলোকে সহৃদয় পাঠকবর্গের সামনে তুলে ধরবো, যাতে করে সমালোচনাকারী হযরতগণের সত্য ভাষণ ও সততার পরিমাপ কতটুকু তা তারা আঁচ করতে পারে। উপরন্তু মুতআ সম্পর্কে মাওলানা মওদূদীর (র) আকীদাই বা কি? সে ব্যাপারেও তাঁরা সম্যক অবগতি লাভ করতে পারেন।

মূল ঘটনা

১৯৫৫ সনের আগষ্ট সংখ্যা 'তর্জুমানুল কুরআন' এ মাওলানা মওদূদী সুরায়ে মু'মিনূনের একটি আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে প্রসংগক্রমে 'মুতআ'র প্রসংগটি উল্লেখ করেন। এ বিষয়টিকে নিয়ে বহুদিন থেকে শিয়া- সুন্নীদের মধ্যে চরম বিরোধ চলে আসছে। তিনি এ সম্পর্কে বলেছেন, "অনেক সময় মানুষের বিয়ে করা সম্ভব- পর হয়ে উঠে না। তখন সে 'মুতআ' কিংবা 'যিনা' দু'য়ের কোনো একটি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় যিনায় লিপ্ত হওয়ার তুলনায় 'মুতআ' করাই শ্রেয়"।[১] আলোচনাক্রমে তিনি সাহাবীদের মধ্য থেকে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাবেঈদের মধ্যে আতা, তাউস এবং সায়ীদ বিন যুবাইরের (র) অভিমত সমূহ বর্ণনা করে বলেছেনঃ "ইযতিরারী অবস্থায় এ কাজ জায়েয হওয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক চিরতরে হারাম প্রমানিত হুকুমের খেলাফ নয়।"

মাওলানা মওদূদী (র) নিজে ইযতিরার অবস্থায় 'মুতআ' জায়েয হওয়ার সমর্থক—উপরোক্ত বাক্য বাহ্যত একথার ধারণা দেয়। এ কারণে কিছু সংখ্যক আলেম একথার ব্যাখ্যা চেয়ে মাওলানাকে প্রশ্ন লিখে পাঠান, বর্তমানে 'মুতআ' সর্বাবস্থায় সাধারণভাবে হারাম হওয়ার ব্যাপারে গোটা আহলে সুন্নাত ওয়াল

১. তাফহীমুল কুরআনের ৩য় খন্ড কিতাব আকারে প্রকাশ করা কালে তাফসীরের আলোচ্য অংশ পুরোটাই বদলে দেয়া হয়েছে, যা পরবর্তীতে উল্লেখ করা হবে।

www.pathagar.com

জামায়াত একমত ও ইজমা হয়ে গেছে। আর ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁর আগের অভিমত পাল্টিয়েছেন। সুতরাং আপনার অভিমত পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন।"

এর জবাবে মাওলানা (র) সুস্পষ্টভাবে স্ববিস্তারে বলেছেন, আমার লেখায় কতিপয় বন্ধুর ভুল ধারণা জন্মে যে, আমি নিজে ইযতিরার অবস্থায় 'মুতআ' জায়েয হওয়ার সমর্থক। অথচ 'মুতআ' অকাট্য হারাম হওয়ার ব্যাপারে আমি ঘোর সমর্থক। নিম্নে আমরা প্রশ্নোত্তর হুবহু পাঠকবর্গের সামনে তুলে ধরছি যাতে করে তারা নিজেরাই এ ব্যাপারে মাওলানার (র) অভিমত হৃদয়ংগম করতে পারেন। কেননা জবাবের মধ্যে তিনি বিষয়টির ব্যাপারে তার নিজের অভিমত অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সরল ভাষায় তুলে ধরেছেন। অথচ প্রতিপক্ষগণ তাকে অপবাদ দিয়েই চলছেন।

প্রশ্নোত্তর দেখুনঃ

প্রশ্ন ঃ জনাব, আপনি তর্জুমানুল কুরআনে সূরায়ে মু'মিনূনের তাফসীর করতে গিয়ে হযরত ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য কতিপয় সাহাবী ও তাবেঈ'র কথার সূত্র ধরে লিখেছেন, তাঁরা সকলেই 'মুতআ' করাকে ইযতিরার অবস্থায় জায়েয মনে করতেন। অথচ প্রায় সব তাফসীরকার লিখেছেন, ইবনে আব্বাস (রাঃ) 'মুতআ' হালাল হওয়ার পূর্বমত পরিবর্তন করেছিলেন। অথচ তাঁর এই পরিবর্তিত মত আপনার দৃষ্টিতে কেন গোপন রইলো তাতে আমি আশ্চর্য। তাফসীরকারদের সকলেই লিখেছেন, 'মুতআ' হারাম হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত সাহাবী ও তাবেঈ একমত। আপনিও হারাম সমর্থক তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ইযতিরার অবস্থার একটি কাল্পনিক উদাহরণ ও ধারণা প্রসূত রূপ দিয়ে আপনি জায়েয মনে করছেন। আশা করি, আপনার পেশকৃত রায় সম্পর্কে পুনরায় চিন্তা করে দেখবেন। কেননা এটা আহলে সুন্নাতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত।"

জবাব ঃ এ বিষয়ে আমি যা কিছু লিখেছি তার আসল উদ্দেশ্য একথা বলা যে, সাহাবী ও তাবেঈদের মধ্যে যে কয়েকজন বুযর্গ 'মুতআ'কে জায়েয মনে করতেন তাদের উদ্দেশ্য সাধারণভাবে জায়েয হওয়া নয়। বরং হারাম মনে করে তাঁরা ইযতিরার অবস্থায় জায়েয মনে করতেন। তাদের মধ্যে কেউ সাধারণ অবস্থায় 'মুতআ'কে বিবাহের মতো যত্রতত্র প্রয়োগ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। আমি ইযতিরারের যে একটি কাল্পনিক উদাহরণ দিয়েছি তাতে ইযতিরারী অবস্থার শুধুমাত্র একটি ধারণা পেশ করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল।

www.pathagar.com

যাতে করে একজন লোক সহজে বুঝতে পারে যে, শিয়া ভদ্রলোকদের 'মুতআ' জায়েয হওয়ার নীতি গ্রহণ করা অপরিহার্য হলে তা কি ধরনের বাধ্যবাধকতার মধ্যে সেটা সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। এই উদাহরণের মাধ্যমে আমি প্রকৃতপক্ষে সেসব লোকের ধারণা পরিশুদ্ধ করতে পেরেছি যারা ইযতিরারের শর্ত উড়িয়ে দিয়ে 'মুতআ'কে সাধারণভাবে হালাল করে নিয়েছে। কিন্তু দুঃখ, আপনার মতো আরো অনেক বন্ধু-বান্ধব আমার বর্ণনা প্রক্রিয়ায় ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে বলেন, আমি নিজে ইযতিরার অবস্থায় 'মুতআ' জায়েয মনে করি। অথচ আমি এ কাজ অকাট্যভাবে হারাম হওয়ার একজন ঘোর সমর্থক। এবং এখন থেকে কয়েক বছর আগে 'রাসায়েল ও মাসায়েল' বইয়ের ২য় খন্ডের ২০-২৩ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে বিশদ বিবরণ পেশ করেছি।

যা হোক, আপনি নিশ্চিত থাকুন, পূনর্দেখার সময় বাক্য সংশোধন করা হবে যাতে করে এ ধরনের কোনো ভুল ধারণা সৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকে। [১]

---

১. সংশোধিত ও পরিমার্জিত বাক্য নিম্নরূপঃ-'মুতআ'র কথা যখন এসে গেলো তখন দু'টি কথার আরো ব্যাখ্যা দেয়া যথার্থ মনে হয়। প্রথম, নবী আলাইহিস্ সালাম নিজে মুতআ হারাম করেছেন বলে প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং একথা বলা ঠিক নয় যে, হযরত ওমর (রাঃ) এটাকে হারাম করেছেন। তিনি এই নির্দেশের প্রবর্তক ছিলেন না। তিনি ছিলেন এর প্রচারক ও প্রয়োগকারী মাত্র। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই নির্দেশ দেন তাঁর শেষ সময়ে যার কারণে জনগণের কাছে নির্দেশটি যথাসময়ে পৌছেনি। সুতরাং হযরত ওমর (র) এই নির্দেশনামা সাধারণভাবে প্রচার করেন এবং আইনের মাধ্যমে তা প্রয়োগ করেন। দ্বিতীয়, শিয়া ভদ্রলোকেরা 'মুতআ' সাধারণভাবে মুবাহ হওয়ার যে নীতি গ্রহণ করেছেন তার স্বপক্ষে কুরআন-হাদীসের কোনো দলীল আদৌ নেই। ইসলামের প্রথম যুগে সাহাবী, তাবেঈ ও ফকীহদের মধ্য থেকে যে কয়জন বুযর্গ এ কাজ জায়েয হওয়া সমর্থন করেন সেটা ছিল নেহায়েত জরুরী ও ইযতিরারী অবস্থায় মাত্র। তাদের মধ্যে কেউ এ কাজকে বিবাহের মতো অবাধ মুবাহ এবং সর্বাবস্থায় সাধারণ অভ্যাসে পরিণত করার পক্ষপাতী ছিলেন না। কাজটি জায়েয হওয়ার সমর্থকরা ইবনে আব্বাসের (রাঃ) নাম জোরে সোরে পেশ করে থাকে অথচ তিনি নিজেই তাঁর মতের পরিবর্তন করেন এভাবে وما هى الا كالميتة لا تحل الا للمضطر এটা মৃত জন্তুর গোশতের মতো যা ইযতিরার অবস্থা ব্যতীত কারো জন্যে হালাল নয়। বস্তুত তিনি ইযতিরার অবস্থায় মুবাহ হওয়ার ফতওয়া দান করা থেকেও বিরত থাকেন যখন দেখা গেল লোকেরা মুবাহের সুযোগে অবৈধ উপায়ে স্বাধীনভাবে 'মুতআ' করতে লেগে গেছে এবং জরুরী অবস্থার মধ্যে একে সীমাবদ্ধ রাখতে অনিচ্ছুক। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং তাঁর গুটি কতেক সমমনা সাথী এ নীতি প্রত্যাহার করেছেন কি করেননি এ প্রশ্ন এড়িয়ে বলা যায়, যারা এ নীতি গ্রহণ করেছেন তারা বড় জোর ঠেকায় পড়ে এ কাজকে জায়েয বলতে পারেন-এর চেয়ে বেশী নয়। অবাধ মুবাহ হওয়া এবং শর্তহীন মুতআ করা

www.pathagar.com

উল্লেখ্য যে, হিজরী ২য় শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত মুতআ প্রসংগটি বিতর্কিত ছিল। বিতর্ক শুধু এ নিয়ে ছিল যে, এটা অকাট্যভাবে হারাম নাকি এই প্রথা মৃত জন্তু ও শূকরের গোশতের মতো হারাম যা কেবল ইযতিরার অবস্থায় খাওয়া জায়েয। অধিকাংশের মত প্রথম কথার স্বপক্ষে। যাও সামান্য লোক দ্বিতীয় কথার সায় দিয়েছেন। পরবর্তীতে আহলে সুন্নাতের সকলেই এ কাজ অকাট্যভাবে হারাম হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তাতে ইযতিরার অবস্থায় মুতআ জায়েয হওয়ার অবকাশ রদ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে শিয়া হযরতেরা এই সম্মিলিত নীতির বিপরীত আকীদা পোষণ করতঃ ইযতিরারের শর্ত উড়িয়ে দিয়ে অবাধে এই সুযোগ গ্রহণে তৎপর হয়ে উঠে।

এ আলোচনায় যে কথা আমি বলতে চাই তাহলো—'মুতআ' হারাম হওয়ার কথা তো অবশ্যই প্রমাণিত এবং সাধারণভাবে হালাল হওয়ার ধারণা কিছুতেই গ্রহণীয় নয়। তবে সলফে সালেহীনদের একটি দল ইযতিরার অবস্থায় এ কাজ হালাল হওয়ার অবকাশ দিয়ে মত প্রকাশ করেছেন। সুতরাং মুতআর সমর্থকগণ যদি তাদের রায় অনুসরণ করতে চায় তাহলে অন্তত এ সীমা লংঘন করা উচিত নয়।

আপনি 'মুতআ' সম্পর্কে ইবনে আব্বাসের রায় পরিবর্তন করার যে কথা উল্লেখ করেছেন সে বিষয়ে নিবেদন হলো—জ্ঞানী লোকদের যেসব কথায় ইবনে আব্বাসের (রাঃ) রায় পরিবর্তনের দাবী করা হয়েছে সেগুলো আমার সামনে এই মুহূর্তে বর্তমান। তাতে দেখা যায়, এই দাবী একটি বিতর্কিত ঘটনা। এ পর্যায়ে যেসব রেওয়ায়েত বিবৃত হয়েছে তাতে ইবনে আব্বাস তাঁর

এমনকি বিবাহিত স্ত্রী ঘরে রেখে মুতআ বিবাহের অবৈধ ফায়দা লুটা এমন এক স্বেচ্ছাচারিতা যা একজন রুচিবান লোকও বরদাশ্‌ত করতে পারে না একে শরঈরূপ দেয়া তো দূরের কথা। আহলে বাইতকে এ ধরনের কাজের অপবাদ দেয়া তো আরো অন্যায়। আমার ধারণা স্বয়ং শিয়া ভদ্র লোকদের কোনো রুচিবান লোকও একথা সহ্য করবে না যে, তার কোনো মেয়ে বা ভগ্নিকে বিবাহের পরিবর্তে মুতআ করার পয়গাম পাঠাবে। এর অর্থ দাঁড়াবে, মুতআ জায়েয হওয়ার জন্য সমাজে বারবনিতার মতো নিম্ন শ্রেণীর এমন একদল নারী সদা প্রস্তুত থাকা যাদের সাথে মুতআ করার দ্বার উন্মুক্ত থাকবে। অথবা এই 'মুতআ' প্রথা কেবলমাত্র গরীব শ্রেণীর কন্যা-ভগ্নীদের জন্যে প্রবর্তন থাকবে আর তাদের থেকে সুবিধা ভোগ করার অধিকার থাকবে ধনীর আদুরে দুলালদের। আল্লাহ ও রসূলের দেয়া জীবন বিধানে এ ধরনের অন্যায় আচরণের আশা করা যায় কি? যে কাজ প্রত্যেক ভদ্র ও রুচিবান নারী নিজের জন্যে নির্লজ্জ ও অপমানকর মনে করেন এমন কাজ আল্লাহ ও তাঁর রসূল মুবাহ করে দেয়ার আশা করা যথার্থ হবে কি?

www.pathagar.com

ভুল স্বীকার করেছেন এমন কথা প্রমাণিত হয় না। বরং তিনি শুধুমাত্র কল্যাণের খাতিরে এর স্বপক্ষে ফতওয়া দিতে বিরত থাকতেন বলে প্রতীয়মান হয়। ফতহুল বারীতে ইবনে হজর (র) ইবনে বাত্তালের কথা উল্লেখ করে বলেনঃ

روی اهل مكة واليمن عن ابن عباس اباحة المتعة و

روی عنه الرجوع باسانيد ضعيفة واجازة المتعة عنه

اصح ـ اه

"মক্কা ও ইয়ামনবাসী লোকগণ ইবনে আব্বাসের 'মুতআ' হালাল হওয়ার কথা উল্লেখ করেন। এসব রেওয়ায়েতে পরিবর্তনের কথা থাকলেও এগুলোর সূত্র যঈফ। 'মুতআ' জায়েয মনে করার রেওয়ায়েতই অধিকতর সহীহ।"

পরবর্তী পর্যায়ে ইবনে হাজর নিজে একথা স্বীকার করেছেন যে, ইবনে আব্বাসের মত পরিবর্তন প্রসংগটি বিতর্কিত।, (৯ম খন্ড, ১৩৮ পৃষ্ঠা) আল্লামা ইবনে কাইয়্যেম এ ব্যাপারে নিজের গবেষণা যেভাবে উপস্থাপন করেছেন তাতে স্পষ্টত মনে হয়, কল্যাণের খাতিরে এ ধরনের ফতওয়া দান থেকে হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) বিরত থাকাকেই পরির্বতন মনে করা হয়। তিনি বলেছেনঃ

فلما توسع فيها من توسع ولم يقف عند الضرورة امسك ابن

عباس عن الافتاء بحلها ورجع عنه ـ اه

"লোকেরা যখন এই বিষয়টি ব্যাপক করে তুললো এবং জরুরী সীমা পর্যন্ত এটাকে সীমিত রাখলো না তখন ইবনে আব্বাস এটা হালাল হওয়ার ফতওয়া দান থেকে বিরত থাকেন এবং এ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। (যাদুল মায়াদ, ২ খন্ড, ২৫৮ পৃষ্ঠা)

[তর্জুমানুল কুরআন, ৪৫ খন্ড, সংখ্যা–৫ নভেম্বর, ১৯৫৫]

'মুতআ' সম্পর্কে এই হলো মাওলানা মওদূদীর (র) ব্যাখ্যাসমূহ। এসব ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে আমরা বুঝতে পারছি না যে, কোনো মুত্তাকী আলেম মুতআ সম্পর্কে মাওলানা মওদূদীর (র) আকীদাকে আহলে সুন্নাতের সঠিক আকীদার খেলাফ বলার ধৃষ্ঠতা কিভাবে দেখান। অথবা 'ইযতিরার' অবস্থায় 'মুতআ'

www.pathagar.com

হালাল হওয়ার সমর্থক হিসেবে মাওলানাকে চিহ্নিত করেন। কারণ, তিনি জবাবে স্বীয় মত সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন যে, ইযতিরার অবস্থায় 'মুতআ' হালাল হওয়ার স্বপক্ষে আমি নই; বরং 'মুতআ' অকাট্যভাবে হারাম হওয়ার আমি একনিষ্ঠ সমর্থক।" এরূপ প্রকাশ্যে ঘোষণা এবং সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার পরও যারা তাকে আহলে সুন্নাত আকীদার খেলাফ কিংবা ইযতিরার অবস্থায় মুতআ হালাল হওয়ার সমর্থক বলে অপপ্রচার করে বেড়ায় তাদের সম্পর্কে আমাদের এছাড়া বলার আর কিছু নেই যে, তারা মাওলানা মওদূদী সাহেবের (র) উপরোক্ত ব্যাখ্যাগুলো হয় নিজে দেখেননি। অথবা তাদের মতে অপবাদ প্রচার মগ্ন থাকা ইসলামে কোনো গর্হিত কিংবা হারাম তৎপরতা নয়। অথবা তৃতীয় পর্যায়ে তাদের হৃদয় মন আখেরাতের অনুভূতি এবং তার জবাবদিহি থেকে সম্পূর্ণরূপে শূন্য হয়ে গেছে। এ ধরনের হযরতগণের ভুল কার্যপদ্ধতি দর্শনে আমাদের বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। তারা একদিকে নবীর প্রতিনিধিত্বকে নিজেদের বিশেষ স্থায়ী সম্পদ মনে করে থাকেন। অন্যদিকে নবী কর্তৃক আনীত ইসলামের নৈতিক সীমাকে অত্যন্ত নির্ভয়ে নির্দয়ভাবে পদদলিত করে চলেন। এগুলো প্রত্যক্ষ করলে মানবীয় জ্ঞান হতবুদ্ধি হয়ে যায়।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো আপন সাহাবীদের মাধ্যমে গোটা উম্মত থেকে এই ওয়াদা নিয়েছেন।

لاتاتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم (بخارى) ১

কিন্তু আমরাই সে জাতি যারা ওয়াদা পদদলিত করে চলেছি। এভাবে নবী আলাইহিস্ সালাম বিদায় হজ্বের ভাষণে সমগ্র উম্মতকে উপদেশ দিয়ে ইরশাদ করেনঃ

ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام- ২

কিন্তু আমরা ধর্মের পতাকাবাহীদের কাছে মু'মিন ব্যক্তির ইজ্জতের কানাকড়ি মূল্যও নেই। আমরা যখন নিজেদের বিরোধী মত পোষণকারী লোকদের পিছনে লাগি তখন তাদেরকে ইসলামের গন্ডী থেকে জোর করে বের না করা পর্যন্ত আমাদের স্বস্তি থাকে না।

১. অর্থাৎ, তোমরা একে অপরের প্রতি মিথ্যা অপবাদ, মনগড়া ও বানোয়াট রটনার আশ্রয় নিবে না। (সহীহ বুখারী)

২. তোমাদের একে অপরের জান-মাল এবং ইজ্জত-আবরু নষ্ট করা তোমাদের জন্যে হারাম করা হলো! -অনুবাদক

www.pathagar.com

আমাদের মতে এরূপ তৎপরতা দ্বীনের জন্যে কোনোক্রমেই উপকারী হতে পারে না এবং দ্বীনের কোনো গঠনমূলক কাজ বলারও উপযোগী নয়। খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে আমরা পরস্পরে কুফর ও গোমরাহীর ফতওয়া- বাজীতে এমন আকণ্ঠ নিমজ্জিত যে, যেনো আমাদের করণীয় আর কোনো কাজ আদৌ নেই। আজকের দিনে মাওলানা মওদূদীর (র) বিরুদ্ধে কতিপয় অদূরদর্শী আলেমের গৃহীত নীতি অত্যন্ত বেদনাদায়ক, ঘৃণার্হ। বিশেষত যে মুহূর্তে মানুষ দ্বীনইসলামের জন্যে সামাজিক জীবনের কোনো ক্ষেত্রে সামান্যতম স্থান দিতে তৈরী নয়, জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই ইসলামী অনুশাসন স্বীকৃতি দেয়ার চরম অনীহা সে সময় এরূপ নীতি আরো ভয়াবহ ও জঘন্য হয়ে যায়। এহেন নাযুক অবস্থায় গোটা আহলে ইলম এবং ইসলাম প্রিয় মুসলমানদের কর্তব্য হলো— সকলে মিলে মিশে একত্রিত হয়ে ইসলামের হৃত গৌরব পুণরুদ্ধার করা এবং সামাজিক জীবনে ইসলামী অনুশাসন কায়েম করা। একে অপরকে কুফরী ও গোমরাহীর ফতওয়াবাজীতে সময়ের অপচয় করা কিছুতেই সমীচীন নয়।

মোট কথা, মাওলানা মওদূদীর (র) ব্যাখ্যায় 'মুতআ' সম্পর্কে তাঁর যে মতামত উপরোক্ত জবাবে প্রকাশ পায় তাতে বর্তমান সময় পর্যন্ত গোটা আহলে সুন্নাতের আকীদা ও নীতির সাথে তার আকীদার হুবহু মিল রয়েছে। পরিতাপের বিষয় যে, আজও আমাদের প্রতিপক্ষ কোনো কোনো আলেম মাওলানা মওদূদী (র) ইযতিরার অবস্থায় মুতআ হালাল হওয়ার সমর্থক বলে দৃঢ় মত পোষণ করে থাকেন। নিম্নে আমরা প্রতিপক্ষীয় সমমনা কোনো কোনো আলেমের এ সম্পর্কীত অভিমত তুলে ধরছি যাদের বেলায় ফতওয়াবাজ আলেমদের মুখে ও কলমে ফতওয়া রায়টি বের হয় না।

সিরাতে মুস্তাকীম

সম্প্রতি 'সিরাতে মুস্তাকীম' শীর্ষক একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। লেখক সরকারী স্কুলের একজন চাকুরীজীবী। শিক্ষক হিসেবে তিনি বাচ্চাদেরকে তালীম দেন। হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভীর (র) মুরীদ বলে নিজেকে প্রচার করেন। বইটির আদ্য অন্ত পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন মওদূদী সাহেবকে (র) পরোক্ষভাবে কাফের এবং খোলাখুলিভাবে গোমরাহ বলা এবং সাহাবীদের ইজমাকে অস্বীকার করার ফতওয়া ছাড়া আর তেমন কিছু নেই। দু'চারটা ব্যতিক্রম ছাড়া এতে শিক্ষণীয় কোনো কথা নেই। দুঃখের

www.pathagar.com

বিষয় যে, বেচারা লেখক বই লেখার সময় নিজের পীর সাহেবের ইলমী শীর্ষমান এবং তাসাউফের উঁচু মর্যাদার মূল্যায়ন করতে পারেননি আর সমালোচনার রীতিনীতি রক্ষিত হওয়ার আশা অবান্তর। বরং প্রতিহিংসা পরায়ণতা এবং প্রতিশোধের প্রবল স্পৃহা তাকে সত্য দর্শণ থেকে অন্ধ করে দিয়েছে। তদুপরি তাকে এমন এক রাস্তায় নামিয়ে দেয় যা সত্য থেকে অনেক দূরে এবং ইসলামের সিরাতে মুস্তাকীম থেকে অবশ্যই বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট। বইটির পাঠকের মনে একথা অনুভূত হবে যে, বই লেখা ও প্রকাশনার উদ্দেশ্য মাওলানা মওদূদীর (র) বিরুদ্ধে মনের আক্রোশ মিটানো। দ্বীনের খেদমত মুখোশ মাত্র। কোনো কোনো জায়গায় তাঁর উপর মিথ্যার বিরাট অপবাদ চাপিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র কুন্ঠাবোধ করা হয়নি। অনেক জায়গায় লেখক এমন সব ক্রটি করেছেন যা একজন অভিজ্ঞ ও শিক্ষিত লোকের কাছে সহজেই ধরা পড়ার মত। আমরা নিম্নে বইটির কতিপয় নমুনা পাঠকবর্গের সামনে তুলে ধরতে চাই। বর্তমান সময়ের কোনো কোনো গোঁড়া আলেম হিংসা, জিঘাংসা ও প্রতিশোধের বশবর্তী হয়ে শরীয়তের সীমা ও গন্ডি কতটুকু লংঘন করতে পারে এবং তাদের কলম ও যবান কতটা লাগাম ছাড়া হতে পারে, এসব উদাহরণের মাধ্যমে সচেতন পাঠকবর্গের সামনে এর বাস্তব নমুনা স্পষ্ট হয়ে ধরাপড়বে।

মুতআ

'মুতআ' সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে মাওলানা সাহেবের (র) ব্যাখ্যা উপরে আলোচিত হয়েছে। 'মুতআ' সর্বাবস্থায় অকাট্য হারাম, ইযতিরার অবস্থায়ও মুতআ মুবাহ নয়—একথা মাওলানার ব্যাখ্যায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি বলেছেনঃ

পরিতাপের বিষয় যে, আমার বর্ণনা ভঙ্গি থেকে অনেক বন্ধু-বান্ধবদের এ ভুল ধারণা হয়েছে যে, আমি নিজে ইযতিরার অবস্থায় মুতআ মুবাহ হওয়ার কথা সমর্থন করি। অথচ এটা অকাট্য হারাম হওয়ার আমি একনিষ্ঠ সমর্থক। আজ থেকে কয়েক বছর আগে রাসায়েল ও মাসায়েল ২য় খন্ডের মাধ্যমে আমি এর ব্যাখ্যাও দিয়েছি।

ইযতিরার অবস্থায় মুতআ সম্পর্কে মাওলানার অভিমত তাঁর ভাষায় "হিজরী দ্বিতীয় শতকের গোড়ার দিকে মুতআ প্রসংগটি বিতর্কিত ছিল।

www.pathagar.com

পরবর্তী সময়ে আহলে সুন্নাতের গোটা আলেম 'মুতআ' সম্পূর্ণভাবে হারাম হওয়ার ব্যাপারে একমত হোন এবং ইযতিরার অবস্থায় হালাল হওয়ার কথা রদ করে দেন।"

এই ব্যাখ্যায় এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মাওলানা সাহেব আদৌ মুতআ ইযতিরার অবস্থায় জায়েয হওয়ার স্বপক্ষে নন; বরং সর্বাবস্থায় মুতআ হারাম হওয়ার আকীদা পোষণকারী। কিন্তু "সিরাতে মুস্তাকীমের লেখক এখনো মাওলানাকে (র) ইযতিরার অবস্থায় মুতআ জায়েয মনে করার স্বপক্ষ ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করতে উদগ্রীব। লেখক প্রথম তো মাওলানার আগের ব্যাখ্যামূলক বাক্য বর্ণনা করেন। যাতে মাওলানা বলেছেনঃ মুতআ হারাম হওয়ার কথা কুরআনের কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশের উপর ভিত্তিশীল নয়। বরং এর ভিত্তি হলো সুন্নাত।" এরপর মাওলানাকে সম্বোধন করে তিনি লিখেন (১) মোটকথা, তার ধারণায় মুতআ হারাম হওয়ার কথা কুরআন কর্তৃক প্রমাণিত নয়। বরং সুন্নত কর্তৃক হারাম হয়েছে। হারাম হওয়া সত্ত্বেও ইযতিরার অবস্থায় মুতআ করার অনুমতি যথারীতি বহাল রয়েছে। তিনি আরো লিখেছেনঃ

(২) সুন্নাত কর্তৃক হারাম বিষয় কুরআন দ্বারা হারাম হওয়া বিষয় অপেক্ষা কম পর্যায়ের। সুতরাং মাওলানার মতে মুতআর হুরমত অপেক্ষাকৃত শিথিল পর্যায়ের হারাম হবে,—তার (মাওলানা মওদূদী) এই ধারণা 'অল্প বিদ্যা ভয়ংকর' হওয়া ছাড়া আর কিইবা হতে পারে? برین عقل ودانش بباید گریست (এহেন জ্ঞান বুদ্ধির জন্য অশ্রুঝরা কান্না আর হায় মাতম রোল তোলা উচিত) [সিরাতে মুস্তাকীম পৃঃ ৪১]

এই সমালোচনা এবং এর বাচনভংগি উভয়ই এমন ব্যক্তির যিনি বর্তমান যুগের একজন শীর্ষ পর্যায়ের বুযর্গ, মুত্তাকী আলেম এবং আল্লাহ ভীরু ওলী আল্লাহর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন এবং তাসাউফের স্তরসমূহ অতিক্রম করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। সিরাতে মুস্তাকিমের লেখক তার বাতেনী সম্পর্ক যার সাথে স্থাপন করার দাবী করছেন তিনি হলেন হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র)। এমন মহান ব্যক্তিত্ব ও বুযর্গ লোকের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করার নূন্যতম দাবী তো এই হওয়া উচিত ছিল যে, অপবাদ দেয়ার সময় অন্তত নিজেদের খানকাহমুখী তাকওয়ার প্রদর্শনী না করা। যে মাওলানা মওদূদীর (র) প্রকাশ্য ঘোষণা হলো "আমি ইযতিরার অবস্থায় মুতআ জায়েয হওয়ার পক্ষপাতী নই বরং সর্বাবস্থায় মুতআ অকাট্য

www.pathagar.com

হারাম হওয়াই আমার আকিদা" তার বিরুদ্ধে একথা বলা যে, "মওদূদী সাহেব ইযতিরার অবস্থায় মুতআ জায়েয মনে করেন" কত বড় মিথ্যা দোষারোপ তা সহজেই অনুমেয়। আমরা হতভম্ব! এসব হযরতদের সততার উপর আমরা শোকগীত গাইব নাকি তাদের জ্ঞান-বুদ্ধির উপর মাতমের সুর উঠাব; একদিকে মাওলানা মওদূদীর (র) সুস্পষ্ট ঘোষণা—হিজরী ২য় শতকের প্রথম পর্যন্ত মুতআ প্রসংগটি ছিল বিতর্কিত। কিন্তু পরবর্তী সময়ে মুতআ সর্বাবস্থায় সম্পূর্ণ হারাম সাব্যস্ত হয়। এমনকি ইযতিরার অবস্থায় জায়েয না হওয়ার ব্যাপারে সমগ্র আহলে সুন্নাত ঐক্যমত পোষণ করেন।" তিনি আরো বলেছেন, "আমার বর্ণনাভংগী দ্বারা আপনার মতো অনেক বন্ধু-বান্ধব এরূপ ভুল ধারণার শিকার হয়েছেন যে, আমি নিজেই ইযতিরার অবস্থায় মুতআ জায়েয হওয়ার সমর্থক; অথচ এটা অকাট্যভাবে সম্পূর্ণরূপে হারাম হওয়ার আমি একান্ত সমর্থক। অপরদিকে জনাব লেখক সাহেবের মন্তব্য বরং মিথ্যা দোষারোপ আর বানোয়াট রটনা যে, "মুতআ হারাম হওয়া সত্ত্বেও ইযতিরার অবস্থায় তাঁর (মওদূদী সাহেব) মতে মুতআ করার অনুমতি যথারীতি অবশিষ্ট রয়েছে।"

এরূপ বিদ্বেষমূলক উক্তি সম্পর্কে এছাড়া আর কিইবা বলা যেতে পারে যে, জিঘাংসা ও প্রতিহিংসার ধূম্রজাল এসব হযরতদেরকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করে ফেলেছে। কিংবা তাদের মতে মিথ্যার বেসাতি করা ইসলামের নিষিদ্ধ হুকুম নয়। অথবা এসব হযরতগণ আখেরাতের জবাবদিহি থেকে একেবারে অবচেতন হয়ে আছেন।

আরো হাস্যকর কথা হলো—"মুতআ হারাম হওয়া কুরআনের কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ দ্বারা প্রমাণিত নয় বরং মুতআ হারাম হয়েছে সুন্নাতের উপর ভিত্তি করে"—মাওলানা মওদূদীর (র) এ কথার উপর ধৃষ্ঠতা দেখিয়ে 'সিরাতে মুস্তাকীম' রচয়িতা তার নিজের পক্ষ থেকে এর কারণ বর্ণনা করে বলেন—মুতআ কুরআন কর্তৃক হারাম না মেনে সুন্নাত কর্তৃক হারাম হওয়ার কথা স্বীকার করার অন্তরালে আপনার উদ্দেশ্য হলো—মুতআ হুরমতের গুরুত্ব কমিয়ে ইযতিরার অবস্থায় জায়েয ঘোষণা দেয়া। কারণ কুরআন কর্তৃক হারাম অত্যন্ত মজবুত হওয়ার কারণে সেটাকে ইযতিরার অবস্থায় জায়েয হওয়া দ্বারা বদলানো যায় না।"

অথচ মাওলানা মওদূদীর (র) এই দাবীর কারণ ও দলীল 'সিরাতে মুস্তাকীম' লেখকের বর্ণিত কারণ আদৌ এক নয়। তাঁর দাবীর স্বপক্ষে দলীল ও

www.pathagar.com

কারণ পরবর্তী আলোচনায় তার লেখাতেই পাওয়া যাবে। লেখক সাহেবের বর্ণিত কারণ তার নিজের ভুল আবিষ্কার যা স্থূল বুদ্ধি, বক্রতা ও শঠতার ভিত্তিতে মাওলানা মওদূদীর (র) নামে রটিয়েছেন। আর দোষ চাপিয়েছেন মাওলানার ওপর।

সম্ভবত এটাও খানকা ভিত্তিক তাকওয়া এবং সার্টিফিকেটধারী বিদ্যার ফজীলত যে, অন্য কারোর বাক্যের সারমর্ম উদঘাটন করতে না পারলে অথবা নিজে কোনো ভুলের শিকার হয়ে থাকলে পরের ভাষ্যে মনগড়া অর্থ ঢুকিয়ে এর দায় দায়িত্ব বেচারা ভাষ্যকারের উপর চাপিযে দেয়া। অতপর তাদেরকেই অপবাদের লক্ষস্থলে পরিণত করা। শুধু কি তাই 'অল্প বিদ্যা ভয়ংকর' নিন্দাবাণের গোছানো আটিও বেচারার ঘাড়েই চাপা দিয়ে নিজে দুধের ধোয়া চন্দন সাজার কেরামতি কারবারও সম্ভবত এহেন সর্বনাশা সনদেরই মারাত্মক অবদান। আর এ ব্যাপারে হযরত অক্ষত, যেহেতু তার সম্পর্ক কোনো স্বনামধন্য বুযর্গ এবং তরীকতের পীরের সাথে, অথবা তিনি কোনো নির্ভরযোগ্য এবং প্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সনদ প্রাপ্ত ব্যক্তি।

মাওলানার (র) যে বাক্যে 'সিরাতে মুস্তকীমের' লেখক এই ভুল ইজতিহাদ করেছেন সেই মূল বাক্যটি নিম্নে উল্লেখ করা আমাদের ইচ্ছা। তারপর দেখা যাবে লেখক যে ইজতিহাদ করেছেন তার অবকাশ আছে কি নেই? এবং এই বাক্য দ্বারা মাওলানার নিজের উদ্দেশ্য কি তাও জানা যাবে।

মাওলানা মওদূদী সাহেবের (র) মূল বাক্য

"এই আয়াতে فمن ابتغى وراء ذلك 'মুতআ' হারাম হওয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট নয়। এই আয়াত মুতআ হারাম হওয়ার দলীল হলে আয়াতটি সেসব হাদীসের খেলাফ হবে যেগুলো দ্বারা মুতআ হারাম হওয়া প্রমাণিত হয়েছে। এসব হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নবী আলাইহিস্ সালাম মক্কা বিজয় পর্যন্ত এ কাজকে বৈধ রেখেছিলেন। সুতরাং মুতআর হুরমত কুরআনের কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশের ভিত্তিতে নহে বরং সুন্নাতের উপর ভিত্তি করে।

এ বাক্যে দু'টি কথার উল্লেখ সুস্পষ্ট রয়েছে। এক, মুতআ হারাম হওয়ার কথা কুরআনের কোনো স্পষ্ট নির্দেশের ভিত্তিতে প্রমাণিত নয়, বরং সুন্নাতের ভিত্তিতে প্রমাণিত।" দুই, এর কারণ, (যা অতএবের মধ্যে ইশারা করা হয়েছে)

www.pathagar.com

"কুরআন হাদীসের মধ্যে অহেতুক বিরোধিতা অনিবার্য না হওয়া।" জমহুরে সাহাবা এবং জমহুরে তাবেঈন এ মতই পোষণ করেছেন। আর অধিকাংশ ফকীহ এবং মুহাদ্দিসগণও কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশে মুতআ হারাম না হওয়া বরং রসূলের সুন্নাতের ভিত্তিতে হারাম হওয়ার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।

অবশ্য একমাত্র হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং মুহাম্মদ বিন কাসিম ছাড়া অপর কোনো সাহাবী বা তাবেঈ জমহুরে সাহাবী ও তাবেঈর খেলাফ মত প্রকাশ করেননি। এই দুই জনের মতে মুতআ হারাম হয়েছে فمن ابتغى وراء ذالك আয়াতের নির্দেশে এ দু'জন ব্যতীত কোনো সাহাবী কিংবা কোনো তাবেঈ মুতআ কুরআনের ভিত্তিতে হারাম হওয়ার কথা বলেননি। বিস্তারিত জানার জন্যে আমার লেখা 'মুতআ প্রসংগ' প্রবন্ধ দেখুন। প্রবন্ধটি তর্জুমানুল কুরআনে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছে।

বাক্যের উদ্দেশ্য

'মুতআ' কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশে হারাম ঘোষিত হয়নি বরং হাদীসের নির্দেশে। মাওলানার (র) এ কথার উদ্দেশ্য হলো একে তো কথাটি জমহুরে সাহাবী, তাবেঈ এবং অধিকাংশ ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের স্বীকৃত অভিমত। পরন্তু কুরআন-হাদীসের মধ্যে অহেতুক বিরোধিতা সৃষ্টির অবসান করাও এর অপর লক্ষ্য। সর্বোপরি হাদীস অস্বীকারকারীদের অভিযোগ উত্থাপন করার সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করা। তাদের সাম্ভাব্য অভিযোগ হলো-"মুতআ হারাম হওয়ার আয়াত হিজরতের আগে অবতীর্ণ। যথা فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَالِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ তাহলে, খায়বর অথবা ফতেহ মক্কার সময় মুতআ হারাম হওয়ার যেসব হাদীসের উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলো সম্পূর্ণ ভুল এবং নিশ্চিতভাবে ভিত্তিহীন।"

"মুতআকে কুরআনের পরিবর্তে হাদীসের ভিত্তিতে হারাম স্বীকার করার উদ্দেশ্য,এই হারামকে হালকা মনে করে ইযতিরার অবস্থায় জায়েযে রূপান্তরিত করা।" 'সিরাতে মুস্তাকীম' লেখকের এই উক্তি মূলত মাওলানার (র) উপর নির্জলা মিথ্যার অপবাদ চাপিয়ে দেয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। এসব উদ্ভট কথা লেখকের উষ্ণ মস্তিষ্কের প্রলাপ বৈ আর কি হতে পারে? অন্যথায় মাওলানার লেখায় এ ধরনের প্রলাপের আকার ইংগীত পর্যন্ত নেই।

www.pathagar.com

কারণ, প্রথমতঃ তিনি ইযতিরার অবস্থায় মুতআ জায়েয হওয়ার পক্ষপাতী নন; বরং সর্বাবস্থায় সম্পূর্ণরূপে হারাম হওয়ার একান্ত বিশ্বাসী। যা আগে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ লেখক সাহেবের এই উদ্ভাবনী উদ্ভট ও অলীক যে, কুরআনের উপর ভিত্তি করে হারাম বস্তু সাংঘাতিকভাবে হারাম হওয়ার কারণে তা ইযতিরার অবস্থায় জায়েয হওয়ার বিধানে পরিবর্তিত হতে পারে না। সুন্নাত কর্তৃক হারাম হওয়ার দরুন তা হালকা ও দুর্বল বিধায় রূপান্তর সম্ভব। অদ্ভুত ইজতিহাদের প্রবক্তা লেখক সাহেবের কাছে জিজ্ঞাস্য, মৃত ও শূকরের গোশ্‌ত কুরআন কর্তৃক হারাম হওয়া সত্ত্বেও ইযতিরার অবস্থায় সেটা জায়েয নয় কি? এই মজবুত ও জোরালো হারাম কি জায়েয বিধানে পরিবর্তন হয়নি? তাহলে তার ইজতিহাদ ও উদ্ভাবন নীতি যে বিভ্রান্তিকর সে কথা বলাই বাহুল্য। এরূপ ভুল ও উদ্ভট নীতি নির্ভর উদ্ভাবনীকে মাওলানা মওদূদীর (র) মতো দূরদর্শী আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদের সাথে সম্পৃক্ত করা কোনো স্থীর মস্তিষ্ক ও জ্ঞান সম্পন্ন লোকের কাজ হতে পারে না। কবির ভাষায়ঃ

وكم من عائب قولا صحيحا
وآفته من الفهم السقيم

অপর একটি বিস্ময়তা

জনাব লেখক সাহেব পরবর্তীতে অপর একটি বিস্ময়তার অবতারণা করেছেন এভাবে–

"যদি সত্য ভাষণ সহনীয় হয়, তাহলে আল্লামা আলূসী (র) রূহুল মায়ানীতে যা বলেছেন সেটা প্রণিধানযোগ্য তিনি তিরমীযী, বাইহাকী ও তিবরানীর উধৃতি দিয়ে লিখেছেন–

كانت المتعة في اول الاسلام كان الرجل يقدم البلدة
ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى انه
مقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شانه حتى نزلت الآية
الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فكل فرج سواها
حرام -

"ইসলামের প্রথম যুগে মুতআ বিয়ের প্রচলন ছিল। কোনো লোক কোনো শহর বা গঞ্জে গেলে সেখানে তার জানা শুনা কেউ না থাকলে সে এক

www.pathagar.com

নারীকে অবস্থানকালীন সময়ের জন্যে বিবাহ করে নিতো। এ সময়ে ঐ নারী তার মালামাল রক্ষা করতো এবং অন্যান্য প্রাসংগিক প্রয়োজন পূরণ করতো। এমতাবস্থায় الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم আয়াত নাযিল হয়, তাতে বিবাহিত নারী ও ক্রীতদাসী ছাড়া অপর নারী ভোগ করা হারাম হয়ে যায়। ”

এই অন্তর্বর্তী কালীন বা সাময়িক বিয়েকে 'মুতআ' নামে আখ্যায়িত করা হতো। এই অর্থে বিয়ে করা সূরায়ে মু'মীনুনের উপরোক্ত আয়াত দ্বারা স্থায়ীভাবে হারাম হয়ে যায়। [সিরাতে মুস্তাকীম]

জনাব লেখক সাহেব উপরোক্ত উধৃতির সাহায্যে দু'টি কথার প্রতি মাওলানা মওদূদী (র) সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান। এক, ইবনে আব্বাসের (র) এই রেওয়ায়েতে একথার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে যে, মুতআ কুরআনের আয়াতের আলোকেই হারাম হয়েছে। সুতরাং মাওলানা মওদূদীর (র) একথা ঠিক নয় যে, "মুতআ হারাম হয়েছে সুন্নাতের ভিত্তিতে কুরআনিক দলীল নয়।" দুই, মুতআ কুরআন কর্তৃক হারাম হয়েছে—একথা আল্লামা আলূসীর মতো বিদগ্ধ আলেমও স্বীকার করেছেন। অতএব, মুতআ হারাম হওয়ার ভিত্ কুরআনই, সুন্নাত নয়। এর প্রমাণ ইবনে আব্বাস বর্ণিত উপরোক্ত হাদীস।

উভয় কথাই ভুল

কিন্তু আমাদের মতে দু'টো কথাই ভ্রান্ত। ইবনে আব্বাসের (রাঃ) রেওয়ায়েতে বর্ণিত আয়াত দ্বারা মুতআ হারাম হওয়া প্রমাণিত হয় না এবং মুতআ হারাম হওয়ার ভিত্তি কুরআনই, হাদীস নয়—আল্লামা আলুসী (র) একথার সমর্থক এমনটাও বুঝায় না। কারণ, আল্লামা আলূসী (র) ইবনে আব্বাসের (রাঃ) রেওয়ায়েতটি 'মুতআ' হারাম হওয়ার দলীল হিসেবে এখানে উল্লেখ করেননি। বরং এখানে এই রেওয়ায়েত উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো রেওয়ায়েতটি শুদ্ধ কি অশুদ্ধ যাচাই বাছাই করা। কেননা, রেওয়ায়েতটি দু'টি কারণে ক্রটিযুক্ত।

প্রথম কারণ

আল্লামা আলূসী যেসব কারণে হাদীসটির সমালোচনা করেছেন তন্মধ্যে প্রথম কারণ হলো–

www.pathagar.com

ما ادري ما عني بأول الاسلام فان عني ما كان في مكة
قبل الهجرة الى ان نزلت الآية - فان كان نزولها قبل
الهجرة فلا اشكال في الاستدلال بها على الحرمة لولم يكن
بعد نزولها اباحة لكنه قد كان -
وان عني ما كان بعد الهجرة او اوائلها وانها كانت مباحة
اذ ذاك الى ان نزلت الآية كان ذلك قولا بنزول الآية
بعد الهجرة وهو خلاف ماروى عنه ان السورة مكية -

(روح المعاني - ج ١٨ - ص ١٠)

"আমি জানিনা, ইবনে আব্বাসের (রাঃ) বর্ণিত 'ইসলামের প্রথম যুগ' বলার উদ্দেশ্য কি। যদি উদ্দেশ্য হয় মক্কী জীবন তাহলে মক্কী যুগে আয়াত নাযিল হওয়া অবধি মুতআ মুবাহ ছিল বুঝাবে। যা আয়াত নাযিল হওয়ার পর হারাম হয়ে যায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এই আয়াত দ্বারা মুতআ হারাম হওয়ার দলীল দাঁড় করানো তখনই সহীহ হবে যখন উক্ত আয়াতও হিজরতের আগে নাযিল হওয়া প্রমাণিত হয় এবং মুতআও আয়াত নাযিল হওয়ার পর মুবাহ না থাকে। অথচ দেখা যায় উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পরেও মুতআ মুবাহ (বৈধ) হিসেবে প্রচলিত ছিল। আর যদি ইসলামের প্রথম যুগ বলতে তাঁর উদ্দেশ্য হয় হিজরত পরবর্তী যুগ বা হিযরতের প্রথমাবস্থা, তাহলে এর তাৎপর্য হবে হিজরতের পর বা হিজরতের প্রথমাবস্থায় আয়াত নাযিল হওয়া পর্যন্ত মুতআ মুবাহ ছিল এবং আয়াত নাযিল হওয়ার পর হারাম হয়ে যায়। এর অর্থ হলো একথা স্বীকার করা যে, আয়াত হিজরতের পর নাযিল হয়েছে। অথচ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, সূরাটি মক্কী, মাদানী নয়।

(রূহুল মাআনী, ১৮শ খন্ড, ১০ পৃষ্ঠা)

পর্যালোচনার সারমর্ম

মোটকথা, ইবনে আব্বাসের (রাঃ) রেওয়ায়েতে 'প্রথম ইসলাম' দ্বারা যদি উদ্দেশ্য হয় মক্কী যুগ, তাহলে হাদীস দ্বারা বুঝতে হবে হিজরতের পূর্বে উক্ত আয়াত নাযিল হওয়া পর্যন্ত মুতআ মুবাহ ছিল, আয়াত নাযিল হওয়ার পর তা

www.pathagar.com

হারাম হয়ে যায়। এমতাবস্থায় উক্ত আয়াত মুতআ হারাম হওয়ার দলীল হওয়া দু'টি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। এক, আয়াত হিজরতের আগে নাযিল। দুই, আয়াত নাযিল হওয়ার পর 'মুতআ' মুবাহ না থাকা। অথচ এই আয়াত নাযিলের পরও মুতআ মুবাহ ছিল। আর 'প্রথম ইসলাম' দ্বারা যদি ইবনে আব্বাসের উদ্দেশ্য হয় হিজরতের পর মাদানী যুগের প্রথমাংশ, তাহলে হাদীসের তাৎপর্য হবে মুতআ হিজরতের পর মাদানী জীবনের প্রথমাংশে মুবাহ ছিল। আয়াত নাযিল হওয়ার পর তা হারাম হয়ে যায়। এর অর্থ হলো, ইবনে আব্বাসের (রাঃ) মতে সূরা ও আয়াত উভয়ই মাদানী। অথচ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেই বর্ণিত আছে যে, এই আয়াত ও সূরা উভয়ই মক্কী। সুতরাং এই রেওয়ায়েতের আলোকে একথা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয় যে, মুতআ কুরআনের উপর ভিত্তি করেই হারাম হয়েছে সুন্নাতের উপর নয়।

দ্বিতীয় কারণ

ইবনে আব্বাসের উল্লেখিত রেওয়ায়েতটি আল্লামা আলূসী কর্তৃক সমালোচিত হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হলো-

او يقال ان هذا الخبر لم يصح ويؤيد هذا قول العلامة
ابن حجران حكاية الرجوع عن ابن عباس لم تصح -اه
(روح المعاني-ج ١٨-ص ١٠)

"অথবা বলা যায় এই হাদীসটি সহীহ নয়। আল্লামা ইবনে হজরের (র) উক্তি উপরোক্ত দাবীর সমর্থনে দলীল হতে পারে। তার উক্তিটি হলো- "ইবনে আব্বাস কর্তৃক তাঁর মতের পরিবর্তন ও প্রত্যাবর্তন সম্পর্কীত যে কথা বর্ণিত আছে তা সহীহ নয়।" (রূহুল মায়ানী ১৮ খন্ড, ১০পৃষ্ঠা)

শায়খুল ইসলাম হাফেজ ইবনে হাজর আসকালানী (র) এই রেওয়ায়েত সম্পর্কে আপন বক্তব্য পেশ করে বলেনঃ

واما ما اخرجه الترمذيُّ من طريق محمد بن كعب
عن ابن عباس قال انما كانت المتعة في اوّل الاسلام كان
الرجل يقدم البلد الحديث - فاسناده ضعيف وهو شاذ
مخالف لما روينا من علة اباحتها -اه

www.pathagar.com

ইমাম তিরমীযী মুহাম্মদ বিন কা'ব সূত্রে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েতটি উল্লেখ করেছেন। তাতে দেখা যায় ইসলামের প্রথম যুগে কেউ কোনো শহর বন্দরে গেলে কোনো জানা লোক না থাকলে সেখানে (অন্তরবর্তীকালীন তথা সাময়িক বিয়ে) মুতআ করতো....। উপরোক্ত হাদীসটির সনদ যঈফ ও দুর্বল। হাদীসটি বিরল এবং মুতআ মুবাহ (বৈধ) হওয়ার যেসব সহীহ হাদীস আমরা বর্ণনা করেছি সেগুলোর খেলাফ।

চোখ খুলে দেখুন!

এবার লেখক সাহেব চোখ খুলে দেখুন! আল্লামা আলূসী (র) এবং ইবনে হাজর আসকালানী (র) এই দুই মনীষী ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েত সম্পর্কে কি মন্তব্য প্রকাশ করেছেন? বিষয়টির কি তত্ত্ব প্রমাণ হলো? আর আপনি মাওলানা মওদূদীর (রঃ) কর্ণ কুহরে যা প্রবেশ করাতে চান সেটা প্রমাণ হলো, নাকি আমরা যা আপনার গোচরীভূত করাতে চাই সেটা প্রমাণ হলো? আপনার গর্বের ধন উধৃত হাদীসটি আপনার নিজের জন্য الغريق يتشبث بالحشيش (অর্থাৎ, ডুবন্ত ব্যক্তি খড়ের সাহায্য নিতেও হাত বাড়ায়) প্রবাদ তুল্য হয়নি তো? আর মাওলানা মওদূদীর (র) উপর ক্রোধের অগ্নিবর্ষণ দ্বারা আপনারা[1] لا يجرمنكم شنان قوم على ان لا تعدلوا আল্লাহর বাণীর প্রকাশ্য বিরোধিতায় কোমর যে বাধেননি সেটা একটু তলিয়ে দেখতে দোষ কি? হায়.... রে আক্ষেপ.... আল্লার ভাষায়ঃ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ؟ [2] আয়াতটি যদি একটু তলিয়ে দেখতে আপনাদের ভাগ্য হত! তাহলে কতইনা উত্তম ছিল।

---

১. অর্থাৎ, কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতা ইনসাফ থেকে তোমাদেরকে যেন বিরত না রাখে। (সূরা মাইদাহ্, ৮ আয়াত)

২. অর্থাৎ, এ সম্প্রদায়ের লোকদের কি হয়ে গেলো যে, কোনো কথা এরা বুঝতেই চায় না। (সূরা নিসা, ৭৮ আয়াত)

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

মু'আল্লাফাতি কুলূব (মনের আসক্তি) প্রসংগ

"সিরাতে মুস্তাকীম" পুস্তিকার লেখক সাহেব মাওলানা মওদূদী (র) সাহেবের অপরাধের (?) লিষ্টের মধ্যে মুআল্লাফাতি কুলূব প্রসংগটি সংযোজন করেছেন। এ প্রসংগে লেখক সাহেব এবং অন্যান্য বুযর্গদের দাবী হলো–এ ক্ষেত্রেও মাওলানা মওদূদীর ভূমিকা একেবারে ভুল। বরং সিরাতে মুস্তকীমের লেখক তো পরোক্ষভাবে মাওলানা মওদূদী (র) সাহেবের বিরুদ্ধে কুফরী ফত্ওয়া পর্যন্ত দিয়ে ফেলেন। আমরা নিম্নে এ বিষয়ের মূল সত্য ঘটনা পাঠকবর্গের কাছে পেশ করতে চাই। যাতে করে বুযর্গদের অভিযোগ ও অপবাদের তত্ত্ব স্বচ্ছ হয়ে ফুটে উঠে।

তাফহীমুল কুরআনের ২য় খন্ডের ২০৭ পৃষ্ঠায় যাকাত ব্যয়ের খাতগুলোর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মাওলানা (র) লিখেছেনঃ "মুআল্লাফাতি কুলূবের প্রাপ্য অংশ কিয়ামত পর্যন্ত রহিত হয়ে যাওয়ার কোনো দলীল নেই–আমাদের মতে এটাই সত্য কথা।"

সিরাতে মুস্তাকীমের লেখক এবং তার সমমনা অন্যান্য বুযর্গ এ ব্যাপারে এতোটা আবেগ তাড়িত হয়েছেন যে, তারা যবান ও কলম উভয়টি সামাল দিতে নিজেরা বেশামাল হয়ে পড়েন। এমনকি সিরাতে মুস্তাকীমের লেখক মাওলানা মওদূদীর (র) উপর ফত্ওয়াই সেঁটে দিলেন যে, "মুআল্লাফাতি কুলূবের" অংশ সাহাবাদের সর্বসম্মতিক্রমে রহিত হয়ে গেছে। আর সাহাবীদের ইজমাকে অস্বীকার করা কুফরী। মওদূদী সাহেব এই ইজমার অস্বীকার করায় তার মত ও পথ উম্মতে মুহাম্মদী হতে স্বতন্ত্র।" এই হলো কুফরী ফত্ওয়ার সার সংক্ষেপ। এখন ফত্ওয়ার মূল ভাষণ লেখকের যবানীতে লক্ষ্য করুনঃ সুতরাং তিনি লিখেনঃ "এখানেও ঘটনা এই হলো যে, হযরত আবূ বকরের (রাঃ) মুবারক শাসনামলে ইকামতে দীন ও নবীর সুন্নাত অনুসরণের জন্যে সম্মানিত সাহাবীগণ অধীর আগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ হতে মুআল্লাফাতি কুলুবের অংশটুকু শীর্ষস্তরের সাহাবীদের সম্মতিক্রমে রহিত হিসাবে স্বীকৃতি পায়। সাহাবায়ে কিরামদের ইজমা সকল ইমামের সর্ববাদী

www.pathagar.com

সম্মত রায় মুতাবেক অকাট্য দলীলরূপে গৃহীত। অস্বীকার করা কুফরী হওয়ার ব্যাপারেও সবাই একমত। কিন্তু জনাব মওদূদী সাহেবের স্বাভাবিক অভ্যাস অনুযায়ী এখানেও সাহাবায়ে কিরামদের ইজমা অস্বীকার করতঃ তিনি উম্মতে মুহাম্মদী থেকে স্বতন্ত্র ও একক রাস্তা পসন্দ করে নিলেন। অথচ হযরত আবূ বরক সিদ্দীকের (রাঃ) যুগ থেকে অদ্যাবধি অপর কেউ এ জাতীয় 'একলাচল' নীতি গ্রহণ করেন নাই" [সিরাতে মুস্তাকীম, ৩৯-৪০ পৃষ্ঠা]

পর্যালোচনা ও ব্যাখ্যা

উপরোল্লেখিত সমালোচনামূলক বাক্যের আমরা পর্যালোচনা করলে নিম্নোক্ত চারটি বিষয় আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়ঃ

(১) মুআল্লাফাতি কুলূবের অংশ সাহাবীদের সম্মিলিত রায়ে রহিত হয়ে যায়।

(২) সাহাবীদের এই ইজমা ইমামদের ঐক্যমতে অকাট্য দলীলরূপে স্বীকৃত। এই দলীলের অস্বীকৃতি কুফরীকে অনিবার্য করে তোলে।

(৩) মাওলানা মওদূদী (র) এই ইজমা অস্বীকার করেছেন। সুতরাং তিনিও কাফের এবং মুসলিম জাতি থেকে খারিজ বলে গণ্য হবেন।

(৪) হযরত আবূ বকরের (র) শাসনামল থেকে আজ অবধি কেউ এ কথার স্বপক্ষে নেই যে, মুআল্লাফাতি কুলূবের অংশ কিয়ামত পর্যন্ত রহিত হয়ে যায়নি। বরং সৃষ্টির লয় পর্যন্ত সব সময়ের জন্যে তা সর্ব সম্মতিক্রমে রহিত হয়ে গেছে।

আমরা যখন এহেন স্বল্পজ্ঞান সম্পন্ন এবং নাদান মুফতীদের ফত্ওয়া দেখি অথবা পাঠ করি তখন বিস্ময়ে হতবাক না হয়ে পারি না। আমরা বুঝতে পারি না এসব তথা কথিত ভদ্র লোকগণের মন-মানস কুফরী ও ফাসেকী ফত্ওয়াবাজীর বেসাতি করতে এতো আগ্রহী কেন? কোনো বিতর্কিত বিষয়ে কলম ধরতে কিংবা মুখ খুলতেই অপরকে কাফের ও ফাসেক আখ্যা দিয়ে যাত্রা শুরু করেন। তারা ঘূর্ণাক্ষরেও একথা চিন্তা করে না যে, সর্ব বিষয় প্রথম বস্তুর তাত্ত্বিক গবেষণা করা জরুরী। যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিপক্ষের রায়ের উপর তাত্ত্বিকভাবে সমালোচনা করতে হবে। তারপর দেখতে হবে যুগের আলোকে বিরোধী রায় কোন্ পর্যায়ে পড়ে, ফাসেক কিংবা কাফের হওয়ার অথবা অন্য

www.pathagar.com

কিছু? যদি কাফের বা ফাসেক হওয়ার পর্যায়ে পড়ে তাহলে কাফের বা ফাসেক হওয়ার ফত্ওয়া দেয়া যেতে পারে। অন্যথায় শুধু রদ করেই ক্ষান্ত হতে হবে। এসব ন্যায়-নীতির ধারে কাছে না ঘেঁষে হযরতজীরা অন্ধের মতো প্রথমেই কুফর ও ফাসেকীর বান নিক্ষেপ করতে শুরু করেন। অথচ অপরকে কাফের বা ফাসেক বলার মনের খাহেশ চরিতার্থ করতে কুফরী ও ফাসেকী ফত্ওয়াবাজী করা দ্বীনের কোনো উপকারী খেদমত হতে পারে না। এতে তথাকথিত মুফতী সাহেবগণ নিজেরাও উপকৃত হচ্ছেন না। বরং ফতওয়া বুমেরাং হয়ে নিজেদের জন্যে অত্যন্ত ক্ষতি ও অনিষ্টের কারণ প্রমাণিত হওয়া বিচিত্র নয়।

কোনো বিরোধপূর্ণ বিষয়ে প্রতিপক্ষের দৃষ্টিভংগীর উপর সমালোচনা করার এ পদ্ধতি কোনোক্রমেই যথার্থ নয় যে, কলম ধরা মাত্র পুঞ্জীভূত গোঁড়ামির ঘৃণ্য মত্ততা উতলে উঠবে, অন্তরে প্রতিহিংসার অনল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে এবং বিসমিল্লাতেই প্রতিপক্ষকে কাফের কিংবা ফাসেক আখ্যা দিয়ে শুরু হবে। এ প্রক্রিয়ায় বিতর্কিত বিষয় সমাধান হওয়ার পরিবর্তে আরো বেশী জটিলতর রূপ ধারণ করে এবং দলীয় কোন্দলের ভিত্তিতে পারস্পরিক কাদা ছোঁড়াছুড়ি, অনৈক্য ও অবজ্ঞেয় তৎপরতায় লিপ্ত হতে সহায়তা করে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করে আসছি, এই নাযুক অবস্থায় জাতির পথপ্রদর্শক নামে আখ্যায়িত হযরতগণ বিতর্কিত বিষয়ে কলম ধরতে কিংবা যবান খুলতেই যাত্রা শুরু করেন প্রতিপক্ষকে কাফের কিংবা ফাসেক নামের অপবাদ দিয়ে। সত্য বলতে কি, অপরের সমালোচনা করার সময় কোনো কোনো বুযর্গের হুঁশ-জ্ঞান ঠিক ছিল কিনা তাও বিশ্বাস করা কষ্টকর। এ পর্যায়ে 'সিরাতে মুস্তাকীমের' লেখকের নাম উল্লেখ করা যায়। তিনি স্বজ্ঞানে জাগ্রত অবস্থায় এসব লিখেছেন—ঘুমের ঘোরে আবেশে কিংবা মূর্ছা যাওয়া অবস্থায় লিখেননি—এমনটা বিশ্বাস করা বড় কঠিন। কেননা, স্বজ্ঞানে, সুস্থ্যশরীরে, জাগ্রত অবস্থায় অন্তত একজন আলেমের ভাষায় ও কলমে এহেন দুর্বল ও ভিত্তিহীন কথার ফানুস কখনো উড়তে পারে না।

উপরোক্ত সমালোচনার ব্যাখ্যা

"সিরাতে মুস্তাকীম" রচয়িতা মাওলানা মওদূদী (র) সাহেবের এতদসম্পর্কিত বাক্যের যে ধরনের সমালোচনা করেছেন তাতে বুঝা যায় তিনি

www.pathagar.com

মাওলানার বাক্যের মর্ম আদৌ বুঝতে পারেননি কিংবা বুঝতে চেষ্টাও করেননি। অন্যথায় তার পক্ষে একথা বলা আদৌ সম্ভব ছিল না যে, মুআল্লাফাতি কুলূবের অংশ সাহাবীদের সম্মতিক্রমে কিয়ামত পর্যন্ত রহিত হয়ে গেছে। আর এই সর্বসম্মত (ইজমা) রায় মাওলানা মওদূদী সাহেব অস্বীকার করছেন। কেননা, যে বিষয়ের উপর সাহাবীগণের ইজমা হয়েছে এবং যাকে অস্বীকার করার কোনোই অবকাশ নেই তা শুধু এই, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল থেকে হযরত আবূ বকরের (রাঃ) শাসনামল পর্যন্ত মুআল্লাফাতি কুলূবের খাতে যাকাত ফান্ডের যে অংশ খরচ করা হতো তা বন্ধ করে দেয়া হয়। বলাবাহুল্য, ইসলাম ও মুসলমানের দুর্বলতার কারণে এই খাত প্রবর্তন করা হয়েছিল। এই মূল কারণ সে সময় রহিত হয়ে যাওয়ার ফলে হযরত ওমরের (রাঃ) পরামর্শক্রমে হযরত আবূ বকরও (রাঃ) এই খাত বন্ধ করে দেন। এ অন্তবর্তীকালীন রহিত করণের উপর অবশিষ্ট সাহাবীগণের মৌন সমর্থনকে পরবর্তী সময়ে ইজমা মনে করা হয়। মাওলানা মওদূদীর (র) বাক্য কোনোক্রমেই এরূপ ইজমার বিরোধী নয়। বরং মাওলানার (র) বাক্যে যে বিষয়ের অস্বীকৃতি পাওয়া যায় তাহলো–কিয়ামত পর্যন্ত সব সময়ের জন্যে এখাত রহিত হয়ে যাওয়া। এই চিরন্তন রহিত হওয়ার উপর সাহাবীগণের আদৌ ইজমা হয়নি। চিরতরে রহিত হওয়ার উপর কোনো দলীলও পেশ করা সম্ভব নয়। কোনো নির্ভরযোগ্য কিতাবের উধৃতি দিয়ে আপনি একথা পেশ করতে পারবেন কি যে, হযরত আবূ বকরের (র) শাসনামলের সকল সাহাবা মুআল্লাফাতে কুলূবের নির্ধারিত অংশ কিয়ামত পর্যন্ত চিরতরে বন্ধ করে দেয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন এবং তাদের আর কখনো যাকাত খাত থেকে কিছু দেয়া যাবে না? আমি দাবী করে বলতে পারি, কস্মিনকালেও এ জাতীয় দলীল পেশ করা আপনার সাধ্যে কুলাবে না। কারণ সাহাবীগণ চিরতরে রহিত হওয়ার উপর ঐক্যবদ্ধই হননি। এটাতো পরবর্তী সময়ে হানাফী আলেমগণের নিজস্ব চিন্তাধারা যে, বিষয়টা চিরতরে রহিত হওয়ার ব্যাপারে সাহাবীগণের ইজমা, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অথচ সাহাবীগণ কর্তৃক এ জাতীয় ঐক্যই হয়নি। 'সিরাতে মুস্তাকীমের' লেখক সমালোচনা করার আগে মাওলানা মওদূদী (র) সাহেবের বক্তব্যের সঠিক তাৎপর্য অনুধাবনে যদি চেষ্টা করতেন, তাহলে তিনি মরহুম মাওলানা মওদূদীকে সাহাবীদের ইজমার অস্বীকারকারীরূপে চিহ্নিত করতে আদৌ সক্ষম হতেন না।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত, "সাহাবীদের এই 'ইজমা' ইসলামের ইমামদের সর্বসম্মতিক্রমে অকাট্য দলীলরূপে গৃহীত এবং একে অস্বীকার করা অনিবার্যরূপে কুফরী হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত" জনাব লেখকের একথাটিও জ্ঞান-পারদর্শী এবং 'ইজমা' সম্পর্কে উসূলে ফিকাহের আলেমগণের ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণের সম্পূর্ণ বিপরীত হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ। উসূলে ফিকাহের প্রামাণ্য এবং নির্ভরযোগ্য কিতাব সমূহে একথা সুস্পষ্ট ভাষায় লিখিত আছে যে, কোনো হুকুমের ব্যাপারে যদি কোনো সাহাবী সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেন আর বাদবাকীগণ সে বিষয়ে মৌন থাকেন তাহলে এরূপ ইজমা "ইজমানস্‌সী সুকূতী" اجماع نصی سکوتی 'মৌন নস' নামে অভিহিত হয়। এরূপ 'মৌন নস্' ইজমা হওয়ার ব্যাপারে স্বতই মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম শাফেঈ এবং হানাফী মতাবলম্বী আলেমদের মধ্যে ঈসা বিন্ আবান প্রমুখের মতে 'মৌন নস্' অকাট্য দলীলের মর্যাদা পাওয়া তো দূরের কথা এটা মূলত ইজমাই নয়। তাওযীহি, তালবীহ এবং মুসাল্লামুস্ সুবূত ইত্যাদি উসূলের কিতাবে এর বিশদ বিবরণ রয়েছে। মুয়াল্লাফাতিল কুলূবের অংশ রহিত হওয়া সম্পর্কে যে ইজমার কথা বলা হয়েছে তার প্রকৃতি "মৌন নস্" এর পর্যায়ের। কারণ, হযরত আবূ বকর (রাঃ) এবং হযরত ওমর (রাঃ) এই খাত রহিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন আর অপরাপর সাহাবীগণ মৌনতার ভূমিকা অবলম্বন করেছেন। সুতরাং এটা যখন মৌন নস্ (نصی سکوتی) হিসেবে প্রমাণিত হলো, তখন ইজমা হয়ে অকাট্য দলিল রূপে এর স্বীকৃতি লাভ করার প্রশ্নই উঠে না। কেননা, ইমামদের মতে এ ধরনের 'মৌন নসের' ইজমা হওয়া বিতর্কিত। অতএব, জনাব লেখক সাহেবের "সাহাবীদের এই ইজমা সর্বসম্মতিক্রমে অকাট্য দলীলরূপে স্বীকৃত যার অস্বীকৃতির অনিবার্য পরিণতি হলো কুফরী" জোরালো দাবী (!) অযৌক্তিক, অর্থহীন এবং অযথা কাউকে কুফরীর আওতাভূক্ত করার অপপ্রয়াস মাত্র।

লেখক সাহেবের মন্তব্যের ফলাফল

জনাব লেখক সাহেবের উপরোক্ত মন্তব্য যদি সঠিক ধরে নেয়া হয় তাহলে ইমাম শাফেঈ এবং ইসা বিন আবান (র) সম্পর্কে কি বলা যাবে। কেননা, তাঁরা এ ধরনের ইজমার শুধু অকাট্য দলীল হওয়াকেই অস্বীকার করেন না, বরং মূল ইজমা হওয়াকেই অস্বীকার করেন। ইমাম শাফেঈ (র) তো সুস্পষ্টভাষায় বলেই দিয়েছেন তালীফে কালবের নির্ধারিত খাত কখনো রহিত

www.pathagar.com

হয়নি। বরং প্রথম থেকে আজ অবধি যাকাত ব্যয়ের খাত হিসেবে যথারীতি প্রচলিত ছিল এবং এখনো আছে। পরবর্তীতে মযহাবের আলোচনায় এ বিষয়ও আলোকপাত করা হবে। তাহলে সাহাবীদের ইজমা বিরোধী মনোভাবের প্রতিশোধে এ সকল বরেণ্য ইমামগণকেও কুফরী ফতওয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হবে কি? না কি এ মামলা শুধু মাওলানা মওদূদী (র) সাহেবের জন্যেই বরাদ্দ করা হয়েছে? আর অন্যান্য আলেমগণ এর আওতায় জড়িয়ে গেলেও তাঁরা বেকসুর খালাস পেয়ে যাবেন মনগড়া আইনের এক চোখা প্রবাহে?

তৃতীয়ত, "আবূ বকর সিদ্দীকের (র) শাসনামল থেকে আজ পর্যন্ত তালীফে কালবের নির্ধারিত অংশ রহিত না হওয়ার কোনো একজন সমর্থকও পাওয়া যায় না এবং কেউ এমন কথা বলেনি" লেখক সাহেবের এই উক্তি তার জ্ঞানের অপরিপক্কতা ও অবচেতনার পরিচয় বৈ কি! অথচ শীর্ষ পর্যায়ের ইমামগণ আজও তালীফে কালবকে যাকাত ব্যয়ের অন্যতম খাত সাব্যস্ত করেন। তাদের মতে এই খাত কখনো রহিত হয়নি এবং এখনো এ খাতে যথারীতি যাকাত দেয়া যেতে পারে।

কোনো কোনো আলেম যদিও রহিত হওয়ার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন কিন্তু সাথে সাথে তাঁরা একথাও বলেছেন, তালীফে কালবের খাতে যাকাত ব্যয় করার অবস্থা পুনরায় দেখা দিলে ইসলামের প্রথম যুগের ন্যায় এখাতে যাকাত ফান্ডের অর্থ ব্যয় করা শুরু করা যেতে পারে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এ খাতটি চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়নি। হানাফী আলেমগণ অবশ্য এ ধারণা পোষণ করে থাকেন। এ ব্যাপারে আলেমগণ যেসব মতামত ব্যক্ত করে আসছেন সেগুলোর বিবরণ ফিকহী কিতাব থেকে আমরা নিম্নে পাঠকবর্গের সামনে পেশ করছি, যাতে করে বিষয়টির সঠিকচিত্র তাদের সামনে ফুটে উঠে।

ইমাম আযমের (র) অভিমত

ইমাম আযম (র) সাহেবের মতানুযায়ী মুআল্লাফাতি কুলূবের অংশ চিরতরে রহিত হয়ে গেছে। কোনো সময়েই যাকাতের মাল এই খাতে ব্যয় করার অনুমতি কোনো ইসলামী সরকারেরও নেই। কারণ এই হুকুমটি রহিত হয়ে গেছে। রহিত হুকুম কোনো অবস্থাতেই অনুসরণীয় হতে পারে না। সুতরাং সে হিসাবে এই খাত চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

www.pathagar.com

ইমাম মালেকের (র) অভিমত

ইমাম মালেকের (র) প্রসিদ্ধ মত ইমাম আযমের (র) মতের অনুরূপই। অর্থাৎ চিরতরে বন্ধ এই জন্য যে, ইসলাম এবং মুসলমান এখন আর তাদের সাহায্য সহায়তার মুখোপেক্ষী নয়। বরং স্বয়ংসম্পূর্ণ। আর ইসলাম ও মুসলমান তাঁদের মুখাপেক্ষী নয় সুবাদে যাকাত প্রদানে তাদেরকে আকৃষ্ট করার কোনোই প্রয়োজন নেই। কেননা আলেম সমাজের স্বীকৃত নীতি হলোঃ

ان الحكم ينتهي بانتهاء العلة - (অর্থাৎ, কারণ বা অজুহাত শেষ হয়ে গেলে তার হুকুমও বাতিল হয়ে যাবে।)

একটি রেওয়ায়েত

ইমাম মালেকের অপর বর্ণনা মতে তা'লীফে কালবের খাতে ব্যয় করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে ইসলামী সরকার যাকাত ফান্ড থেকে তাদেরকে কিছু দিতে পারবেন। কেননা, তাদেরকে দেয়ার পূর্বে কারণ ও রহস্য পুনরায় দেখা দিয়েছে। বস্তুত হুকুম সক্রিয় কিংবা নিষ্ক্রিয় উভয় অবস্থাতেই নিজস্ব কারণের অনুসরণ করে থাকে।

ইমাম আহমদের অভিমত

ইমাম আহমদ বিন্ হাম্বলের এ বিষয়ে দু'টি মত বর্ণিত আছে। একটি মত ইমাম মালেক ও ইমাম আযমের (র) মতের অনুরূপ। অর্থাৎ এই খাত চিরতরে মানসুখ হয়ে গেছে।

অপর মতানুযায়ী খাতটি মানসুখ হয়নি। বরং যখন তাদের অংশ নির্ধারিত হয়েছে তখন সে অংশ কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। ইমাম শাফেঈর মতানুযায়ী এটা এমন নয় যে, প্রথমাবস্থায় চালু ছিল পরবর্তীতে উহা রহিত হয়ে গেছে।

ইমাম শাফেঈর (র) অভিমত

এ বিষয়ে ইমাম শাফেঈর (র) দু'টি অভিমত রয়েছে। তবে অধিকতর সঠিক মত হলো–মুআল্লাফাতি কুলূবের অংশ আগে যেমন রহিত হয়নি পরেও কখনো রহিত হবে না। বরং সব সময়ের জন্য বহাল থাকবে। যাকাত আদায়ের অন্যান্য খাতের মতো এই খাতটিও কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে।

www.pathagar.com

উপরোক্ত চার মাযহাবের বিশদ বিবরণ ফকীহদের নিম্ন লিখিত বাক্যে লক্ষ্য করুণঃ

واختلفوا في المؤلفة قلوبهم فمذهب ابي حنيفة ان
حكمهم منسوخ وهي رواية عن احمد والمشهور من مذهب
مالك . انه لم يبق للمؤلفة قلوبهم سهم لغنى المسلمين
عنهم ،

وعنه رواية اخرى انهم ان احتيج اليهم في بلد او ثغر
استانف الامام لوجود العلة .

وللشافعي قولان الاصح انهم يعطون من الزكوة وان
حكمهم غير منسوخ وهي رواية عن احمد . اه (رحمة الامة في اختلاف الائمة)

(ميزان الشعراني - ج ٢ ص ١٣)

মুআল্লাফাতি কুলূবের ব্যয় খাত সম্পর্কে আলেমগণ মতপার্থক্য করেছেন। ইমাম আবূ হানীফার (র) মতে এই খাত মনসূখ হয়ে গেছে। ইমাম আহমদও (রাঃ) অনুরূপ একটি মত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম মালেকের (রাঃ) প্রসিদ্ধ মতে এই খাত অবশিষ্ট নেই। কেননা, মুসলমানগণ এখন আর তাদের সাহায্য সহানুভূতির মুখাপেক্ষী নয়।

ইমাম মালেকের (রাঃ) অপর মতে কোনো শহর বা সীমান্তের মুসলমানগণ আর্থিক সহানুভূতির মুখাপেক্ষী হলে মুসলমান সরকার এই খাতটি পুনরায় চালু করতে পারেন। কেননা যে কারণে এই খাতের সূত্রপাত হয়েছিল সে কারণ পুনরায় দেখা দিয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (র) সাহেবের এ বিষয়ে দু'টি মত রয়েছে। অধিকতর সঠিক মত এই খাত বহাল রয়েছে, মনসূখ হয়নি। ইমাম আহমদেরও (র) এরূপ একটি অভিমত রয়েছে।

ইমাম শাফেঈকে (র) ইজমা অস্বীকারকারী ঘোষণা করা হবে?

সিরাতে 'মুস্তাকীমের' লেখক সাহেব চোখ খুলে উপরোক্ত ব্যাখ্যা-ভাষণ লক্ষ্য করুন আর মূল্যায়ন করতে থাকুন যে, ইমাম শাফেয়ী (র) কিয়ামত

www.pathagar.com

পর্যন্ত এই খাত অবশিষ্ট থাকার কথা বলায় এবং ইমাম মালেক (র) ও ইমাম আহমদও (র) অপর রেওয়ায়েতের অনুরূপ মত প্রকাশ করায় তাঁদেরকে সাহাবীদের ইজমা বিরোধী সাব্যস্থ করতঃ কুফরী ফতওয়া দানের ধৃষ্ঠতা দেখাতে আগ্রহী কি না? নাকি কুফরী ফতওয়ার মোহর কেবলমাত্র মাওলানা মওদূদীর (র) জন্য সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে?

এটা কি আসমান থেকে আবির্ভূত কোনো নতুন শরীয়ত যে, যে কেউ আপনাদের পরিচিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যথারীতি সম্পৃক্ত না হবে অথবা সেসব প্রতিষ্ঠান থেকে সনদ লাভ না করবে অথবা কোনো দ্বীনি ব্যাপারে আপনার মুরুব্বীদের সাথে মত পার্থক্য করবে কিংবা তাদেরকে নতজানু হয়ে সমীহ না করবে, শুধু এমন প্রকৃতির অপরাধে সে লোকটি কুফরী ফতওয়ার বাণে বিদ্ধ হবে?

আল্লাহ তায়ালা তাঁর শীতল ছায়াতলে আশ্রয় দান করুন দ্বীনের এমন সব খাদেম ও রক্ষকদের কবল থেকে যাদের একমাত্র ও সর্বোত্তম কর্ম হলো মুসলমানকে কাফের আখ্যায়িত করা, ছোটখাট ব্যাপারে মত পার্থক্য দেখা দিলে যাদের গাত্রদাহ শুরু হয়ে যায় এবং প্রতিপক্ষকে কুফরী ফতওয়া দিয়ে সে জ্বালা প্রশমিত করা হয়।

হাসান বসরী (র) এবং ইবনে শিহাব যহরী (র)

শীর্ষ পর্যায়ের আরো দু'জন আলেমের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে যারা এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করার কারণে সিরাতে মুস্তাকীমের লেখক সাহেবের স্বকপোলকল্পিত ধারণা অনুযায়ী সাহাবীদের ইজমা অস্বীকারকারী এবং কাফের ফতওয়া পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারেন। ইমাম আবু ওবাইদ (র) কর্তৃক রচিত কিতাবুল আমওয়াল গ্রন্থে মুআল্লাফাতিল কুলূবের অংশ সম্পর্কে হাসান বসরী (র) এবং ইবনে শিহাব যুহরীর (র) অভিমত আহনাফ ছাড়া অন্যান্য ইমামদের অনুরূপ। মাওলানা মওদূদীর (র) তাফহীমুল কুরআনে তাঁদের সে মতই গ্রহণ ও উল্লেখ করেছেন। আবু ওবাইদ তাঁর গ্রন্থে হানাফীদের দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা করে লিখেছেনঃ

واما ما قال الحسن وابن شهاب فعلى ان الامر ماض ابداً

وهذا هو القول عندى - لان الآية محكمة لا نعلم لها

ناسخا من كتاب ولا سنة - فاذا كان قوم هذا حالهم لا

www.pathagar.com

رغبة لهم في الاسلام الا القليل وكان في ردتهم ومحاربتهم
ضرر على الاسلام لما عندهم من العز والمنعة فرأى الامام
ان يرضخ لهم من الصدقة ففعل ذالك لخلال ثلث احدهن
الاخذ بالكتاب والسنة والثانية البقيا على المسلمين
والثالثة انه ليس بيائس منهم ان تمادى بهم الاسلام
ان يفقهوه وتحسن فيه رغبتهم - اه (كتاب الاموال ص ٦٠٧)

"হাসান বসরী এবং ইবনে শিহাব যুহরী যা কিছু বলেছেন তা হুকুমটি সব সময়ের জন্যে বলবৎ থাকার দৃষ্টিতেই বলেছেন। আমাদেরও এই মত। কেননা, আয়াতটি মুহকাম। কুরআন-হাদীসের ভিত্তিতে আয়াতটি রহিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। কোনো জাতির অবস্থা যখন এরূপ হয় যে, সে জাতি ইসলামের প্রতি আকর্ষিত হয় শুধু সম্পদের মোহে এবং তাদের শক্তি ও প্রতিপত্তি এতো বেশী যে বিভ্রান্ত হয়ে তারা আক্রমণ করলে তাতে ইসলামের ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে। এমন পরিস্থিতিতে ইমাম (তথা সরকার প্রধান) তিনটি কারণের ভিত্তিতে সদকার মাধ্যমে তাদের মন জয় করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। (১) এরূপ করা প্রকারান্তে কুরআন-হাদীসের একটি হুকুমেরই অনুসরণ করা (২) তাতে মুসলমানদের উপরই দয়া করা (৩) এরূপ আশা পোষণ করা যে, দীর্ঘ দিন পর্যন্ত এ অবস্থায় ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকলে ইসলামের রূপ সৌন্দর্য সন্দর্শনে পরবর্তীতে মনের গভীর থেকে ইসলামকে সানন্দে গ্রহণ করবে।" (কিতাবুর আমওয়াল ৬০৭ পৃষ্ঠা)

ইমাম আবু ওবাইদের উপরোক্ত ভাষ্যে একথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, হাসান বসরী (র) এবং ইবনে শিহাব যুহরীর (র) মতে মুআল্লাফাতুল কুলূবের অংশ চিরতরে রহিত হয়ে যায়নি। বরং ইসলামী সরকার আজও এমন অবস্থার মুখোমুখী হলে অর্থাৎ লোভী লোকদের মন জয় করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে এবং তাদেরকে আকর্ষিত না করার পরিণতিতে ইসলাম ও মুসলমানদের সমূহ ক্ষতির যদি আশংকা থাকে তাহলে সরকার ইচ্ছা করলে তাদেরকে যাকাত ফান্ড থেকে সাহায্য করতে পারেন। ইমাম ওবাইদও এ মত পোষণ করেন।

www.pathagar.com

এবার জনাব লেখক সাহেব এবং অনুরূপ মনোভাবাপন্ন হযরতদের কাছে আমাদের জিজ্ঞাস্য, মাওলানা মওদূদীর (র) মতো ইমাম যুহরী, হাসান বসরী এবং ইমাম ওবাইদও কি সাহাবায়ে কিরামদের অর্থাৎ ইজমার অস্বীকারকারী, যার পরিণতি আপনাদের মতে সর্বসম্মতিক্রমে কুফরীর অভিশাপ বহন করা? আর প্রকারান্তরে তাঁরাতো অস্বীকারই করেছেন। তাহলে আপনারা কুফরীর দুধারী কৃপান দ্বারা এ সকল ইমামদের উপর আক্রমণে উদ্যত হবেন কি হবেন না? যদি না হন তাহলে এর কারণ কি? অথচ এসব ইমামদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং মাওলানা মওদূদীর দৃষ্টিভংগী এক ও অভিন্ন। যখন অপরাধের প্রকৃতি অভিন্ন তখন অন্যান্যদের বেকসুর খালাস পাওয়া এবং মাওলানা মওদূদীকে (র) ন্যায্য বিচার থেকে বঞ্চিত করা কখনও ইনসাফ ভিত্তিক ফয়সালা বলা যেতে পারে কি?

পাঠকবর্গের কাছে অনুরোধ

পরিশেষে সচেতন পাঠকবর্গের কাছে আমাদের আরয, আপনারা নিজেরাই এ বিষয়ে ফয়সালা করুন, আজকের দিনের কতিপয় সংকীর্ণমনা আলেমদের মাওলানা মওদূদীর (র) বিরোধিতা করা কতটুকু ন্যায়সংগত ও বিধিসম্মত? এরূপ অশুভ তৎপতা মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল ধরানো ছাড়া উপকারিতার উপাদান কতটুকু বিদ্যমান? চিন্তা করার বিষয় যে, ছোট-খাটো এবং তুচ্ছ ব্যাপারে যখন পরমত সহিষ্ণুতা ছিন্ন করে প্রতিপক্ষের উপর কুফরীর ফত্ওয়ার আঘাত হানা শুরু হয়ে যায়, তখন মুসলমানকে কাফের ফতওয়া দানকারী মুষ্টিমেয় হযরত ব্যতীত ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেয়া অন্যান্যদের অবকাশ কতটুকু আশা করা যায়?

আফসুস! আজকের দিনে ইসলাম ও আলেমদের প্রতি এক শ্রেণী লোকের যে অনীহা ও বিতশ্রদ্ধ ভাব তার পশ্চাতে বিরাট ভূমিকা রয়েছে অনভিজ্ঞ, অপরিনামদর্শী তথাকথিত আলেমদের এরূপ বাল্যসুলভ বাচালতা, ছোট-খাটো ও তুচ্ছ ব্যাপারে কাঁদা ছোড়াছুড়ি, পরস্পর কলহ-দন্দ্ব আর ঝগড়া-ফাসাদের উচ্ছল প্রবণতা। এ জাতীয় ব্যাপারে তাদের নীতি হলো-নিজেদের বদ্দমূল মতের বিপরীত বা ব্যতিক্রম কোনো আলেমের ভিন্ন মত দেখতেই তারা অগ্নিশর্মা হয়ে যান, ভিন্ন মতটি যতই যুক্তি ভিত্তিক হোক না কেন। ভিন্ন মত পোষণকারী সে আলেমকে ইসলামের আদিগন্ত পরিমন্ডল থেকে বের করে না

www.pathagar.com

দেয়া পর্যন্ত তাদের যেন নিস্তার নেই, আহার নিদ্রা যেন হারাম। বিশেষত মাওলানা মওদূদী সাহেবের (র) সাথে এই মহলের আচরণ অত্যন্ত গর্হিত, শত্রুতা মূলকও ন্যায় নীতি বর্জিত যা মর্মবিদারক ও বেদনাদায়ক। মনে হয় মাওলানা মওদূদীকে (র) কোনো না কোনো ফন্দীতে অভিযুক্ত করাই এসব হযরতদের একমাত্র চিন্তা। "মাওলানা মওদূদী ইসলাম ও মুসলমানদের জন্যে একটি বিপদজনক ব্যক্তিত্ব" –এরূপ অপপ্রচারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকাই যেন এসব লোকদের আল্লাহর যমীনে একমাত্র করণীয় কাজ। আরো বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, এরূপ তৎপরতায় লিপ্ত থাকাকে তারা দ্বীনের উত্তম খেদমত এবং নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় মনে করে আত্মতৃপ্তি লাভ করে থাকেন। অন্যথায় তাদের মতে আল্লাহর দরবারে কারো হাজিরা দেয়ার সময় নিম্নোক্ত আয়াতের শুভ সংবাদ পাওয়া যেন দুষ্কর ঠেকে। যথাঃ–

يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك راضية مرضية

فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى ـ

উপরন্তু কবির ভাষায়ঃ

فان كنت لا تدرى فتلك مصيبة

وان كنت تدرى فالمصيبة اعظم

সপ্তম অধ্যায়

'ঈলা' প্রসংগ

যেসব বিষয় কেন্দ্র করে মাওলানা মওদূদীর (র) বিরুদ্ধে ইলমী শক্তির কলা কসরত দেখানো হয়েছে তন্মধ্যে 'ঈলা'[১] প্রসংগটি অন্যতম। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য হকূকুয্যা ওজাইন حقوق الزوجين (স্বামী স্ত্রীর অধিকার) গ্রন্থে মাওলানা (র) এ বিষয়ের উপর বিশদ আলোচনা করেছেন। শাখা-প্রশাখা বিষয়ে তিনি যেমনটি আলোচনা করতে অভ্যস্থ এ বিষয়েও তেমনি আলোচনার এক পর্যায়ে বিভিন্ন মযহাবের ইমামগণের প্রদত্ত দলীলের উপর চিন্তা গবেষণা করে স্বীয় গবেষণা অনুযায়ী ইমাম মালেকের অভিমতকে অন্যান্য ইমামের মতের উপর প্রাধান্য দেন। আহনাফ এবং অন্যান্য মযহাবী আলেমদের অভিমতের উপর পর্যালোচনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেনঃ

এই মাসআলায় কোনো কোনো ফকীহ্ হলফের (শপথ করা) শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ স্বামী তার স্ত্রীর কাছে না যাওয়ার শপথ করলে 'ঈলা' হবে এবং এই নির্দেশ প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু 'কসম' না করলে দশ বছর কাল বিচ্ছিন্ন থাকা সত্ত্বেও ঈলার হুকুম প্রযোজ্য হবে না। তাঁদের এ মতের সাথে আমি একমত নই। আমার মতে আইনের উৎস মূলত আল-কুরআনের ভাষায়- لا يكلف الله نفسا الا وسعها আল্লাহ্ কাউকে তার সহ্য শক্তির বাইরে কষ্ট দেন না।"

সার্বজনীন বিধি অনুযায়ী কুরআনে মেয়েদের স্বাভাবিক সহ্য শক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এর অর্থ যৌন ক্ষুধা নিবৃত্ত করা থেকে বিরত রেখে স্ত্রীকে শুধুমাত্র শাস্তি দেয়াই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে সেটা এতোটুকু সময়ের জন্য হওয়া উচিত যা সে সহ্য করতে সক্ষম। এরচেয়ে বেশী শাস্তি দেয়া ধৈর্যের বাইরে যাতনা দেয়ারই নামান্তর। তাতে এ আশংকাও উড়িয়ে দেয়া যায় না যে স্ত্রীলোকটি চারিত্রিক ফিৎনায় জড়িয়ে পড়বে অথচ নর নারী উভয়কে চারিত্রিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করা ইসলামী আইনের প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। উপরোল্লেখিত আয়াতের মূল লক্ষ্য হলো—স্ত্রীকে সহবাস থেকে বিরত রাখার শাস্তির সময় চার মাসের বেশী হওয়া উচিত নয়। কসম বা হলফ করার

www.pathagar.com

কথাটি এ ক্ষেত্রে ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেননা, কসম শব্দের উল্লেখ থাকাতে স্ত্রীর কষ্ট বেশী হবে আর না থাকায় কম হবে ব্যাপারটি এমন নয়।

অতপর মরহুম মাওলানা প্রথম যুগের যেসব আলেম ওলামার প্রতি নিজের রায় সম্পৃক্ত করেছেন তাদের কথা উল্লেখ করে বলেনঃ

"সাইয়্যেদুনা আলী (রাঃ), ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং ইবনে ওমর (রাঃ) যাঁরা দ্বীন সম্পর্কে ছিলেন অভিজ্ঞ, অনন্য ও পারদর্শী—এ ব্যাপারে তাঁরাও বলেছেন কষ্ট ও যাতনা দেয়ার উদ্দেশ্যে স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন রাখার নাম 'ঈলা' কসম করুক কিংবা না করুক"।

এই বাক্যের টীকায় মরহুম মাওলানা লিখেছেনঃ

"ইমাম মালেক (র) এবং এক বর্ণনায় ইমাম আহমদও (র) এই মতই গ্রহণ করেছেন।" (হুকুকুয়যাওজাইন)

মাওলানা মওদূদী (র) যেহেতু তাঁর ভাষ্যে গৃহীত রায়ের সম্পৃক্তি একদিকে হযরত আলী (র), ইবনে আব্বাস (র) এবং ইবনে ওমরের (রাঃ) প্রতি করেছেন; অপরদিকে এই রায়কে ইমাম মালেকের গৃহীত মত বলেছেন। এ কারণে কোনো কোনো বুযর্গ এই দু' বিষয়ের উপর তাঁর সমালোচনা করেছেন।

'ইযাহে ফাতাওয়া' রচয়িতা কর্তৃক সমালোচনা

ঈলার মধ্যে 'কসম' খাওয়া অন্যান্য ইমামদের ন্যায় ইমাম মালেকের মতেও জরুরী। ইমাম মালেক ঈলার মধ্যে কসম খাওয়া জরুরী মনে না করার যে কথা মাওলানা মওদূদী (র) সাহেব বলেছেন সেটা তার নিজস্ব ইজতিহাদ মাত্র। একইভাবে মাওলানার একথাও ভুল যে, ফিকাহ্ বিশারদ কোনো কোনো সাহাবীর রায় অনুযায়ী স্ত্রীকে যাতনা দেয়ার উদ্দেশ্য কসম ব্যতিরেকে সহবাস করা থেকে বিরত রাখলে সেটাও ঈলা নামে অভিহিত হবে। [ইযাহে ফাতওয়া, ১০৪–১১৬ পৃষ্ঠা]

অতপর কোনো এক সভায় জনৈক ব্যক্তি "ইযাহে ফতওয়ার" প্রণেতা কর্তৃক সমালোচিত বাক্যের প্রতি স্বয়ং মাওলানা মওদূদীর (র) দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সভা শেষ করে মাওলানা লাহোরে ফিরে এসে আলোচ্য অংশ পুনরায় দেখে সংশোধন করে দেন। তারপর তর্জুমানুল কুরআনের মাধ্যমে জনসমক্ষে প্রচার করে দেন—যাদের কাছে 'স্বামী স্ত্রীর অধিকার' (হুকুকুযযাওজাইন)

www.pathagar.com

বইখানা বর্তমান আছে উপরোক্ত বাক্য টীকাসহ কেটে দিয়ে তদস্থলে নিম্ন লিখিত বাক্য লিখে নিতে তাদের প্রতি অনুরোধ করা যাচ্ছেঃ

"এ ব্যাপারে ইমাম মালেক সাহেবের রায় অধিকতর সঠিক মনে হয়। তিনি বলেন—যদি স্বামী স্ত্রীকে শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে তার সাথে সহবাস করা ছেড়ে দেয় তাহলে 'কসম' না খাওয়া সত্ত্বেও এই পরিত্যাগ 'ঈলা' নামে অভিহিত হবে। কেননা শরীয়তে ঈলার উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করার উদ্দেশ্য হলো কষ্ট থেকে রক্ষা করা। আর সহবাস থেকে বিরত থাকার মাধ্যমেই এ উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে যায়, হলফের প্রয়োজন নেই। কেননা শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে বিরত থাকলেই সে কষ্ট স্ত্রী পেয়ে যাবে, কসম করুক চাই না করুক। মাওলানা (র) একথাও নির্দেশ দেন-

টিকায় নিম্নোক্ত সূত্র লিখে নিতে হবে ঃ

"আহকামুল কুরআন, ইবনে আরাবী, ১ম খন্ড, ৭৫ পৃঃ বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ইবনে রুশদ, ২য় খন্ড, ১১০ পৃষ্ঠা।"

মাওলানা মওদূদী (র) সাহেব যদি আগের বাক্য সংশোধন না করতেন তাহলে বাক্যটি নিঃসন্দেহে দু'টি প্রশ্নের সম্মুখীন হতো। এক, ফিকাহ বিষয়ে অভিজ্ঞ কোনো কোনো সাহাবীর কসম ব্যতিরেকে শুধুমাত্র শাস্তির উদ্দেশ্যে স্ত্রী সহবাস বর্জন করাকে ঈলা বলা। অথচ সাহাবীদের কেউ এ অভিমত পোষণ করেন নাই। দুই, ইমাম মালেকের মতে শাস্তির উদ্দেশ্যে কসম ব্যতিরেকে স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকলে তা ঈলা নামে অভিহিত হবে। অথচ ইমাম মালেকের মতে হাকীকী ঈলার জন্য কসম করা জরুরী। মরহুম মাওলানা তাঁর লিখিত বাক্য যখন অকপটে সংশোধন করে তা সাধারণ ঘোষণার মাধ্যমে জনগণকে জানিয়ে দিলেন তখন এই বাক্যকে কেন্দ্র করে হৈ চৈ করার আর কোনো অবকাশ থাকে না। তবে একথা ঠিক যে, হুকমী (অনুমোদিত) ঈলার মধ্যে ইমাম মালেকের মতেও কসম থাকা জরুরী নয়। শুধুমাত্র শাস্তি দেয়া উদ্দেশ্য হওয়াই যথেষ্ঠ। এ সত্য অস্বীকার করে যারা দাবী করে যে, ইমাম মালেকের মতেও হাকীকী ও হুকমী উভয় ধরনের 'ঈলার মধ্যে কসম থাকা জরুরী আর কসম ব্যতীত কষ্ট দেয়ার নিয়তে সহবাস বর্জন করা হাকীকী কিংবা হুকমী প্রকৃতপক্ষে কোনো প্রকার ঈলাই নহে বরং কাছে না যাওয়ার কসমকেই ঈলা বলা হয়। এবং এতে আলেমদের কোনো মতভেদ নেই। ইযাহে ফাতাওয়া, ১১৮ পৃষ্ঠা)' তাদের জবাবে আমরা বলবো, এ দাবী

www.pathagar.com

ঠিক নয় আর ঈমাম মালেকের অভিমতের সঠিক প্রতিনিধিত্বও এ দ্বারা প্রকাশ পায় না। এ ব্যাপারে তার অনুসারী আলেমদের ব্যাখ্যা প্রনিধানযোগ্য। তাঁরা বলেছেনঃ

قال علمائنا اذا امتنع من الوطی قصد الاضرار من غیر
عذر مرض او رضاع وان لم یحلف کان حکمه حکم المولی-
لوجود معنی الایلاء فی ذالك فان الایلاء لم یرد لعینه و
انما ورد لمعناه وهو المضارة وترك الوطی-اه
(احکام القرآن لابن العربی ج ١ ص)

"আমাদের আলেমগণ বলেন, কোনো ব্যক্তি যখন ওজর, রোগ, দুগ্ধ পান ইত্যাদি ব্যতীত শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকে, তখন এ কাজ ঈলা নামে অভিহিত হবে যদিও হলফ না করা হয়। কেননা এতে ঈলার অর্থ পাওয়া যায়। কুরআনে মূল লক্ষ্য হিসাবে ঈলার কথা উল্লেখ করা হয়নি, বরং এর উদ্দেশ্য হলো–এর মূল অর্থ অর্থাৎ কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে স্ত্রীর সাথে দৈহিক মিলন বর্জন করে চলা।"

(আহকামুল কোরআন, ইবনে আরাবী , ১ম খন্ড, ৭৫ পৃষ্ঠা)

ইনসাফের দৃষ্টিতে এই বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করা হলে একথা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকলে তা হুক্‌মী ঈলা নামে মালেকী আলেমদের সম্মিলিত রায়ে অভিহিত হবে; কসম করার শর্ত এখানে গৌণ। কারণ ফকীহদের পরিভাষায় কোনো মাসআলা সম্পর্কে قل علمائنا (আমাদের আলেমগণ বলেন) বাক্য ব্যবহার করার সাথে মতপার্থক্য বর্ণনা করা না হলে সেটি একটি সর্বসম্মতিক্রম সিদ্ধান্ত হিসাবে সাব্যস্ত হয়। এখানেও বিষয়টি قل علمائنا বাক্য দ্বারা আরম্ভ হয়ে পরবর্তীতে মতপার্থক্য বিবৃত হয়নি। সুতরাং বলা যায়, এটাই ইমাম মালেকের (র) মযহাব এবং মালেকী আলেমদের এটা সম্মিলিত রায় ধরে নেয়া যায় যে, কসম হওয়া হুকমী ঈলার জন্য অপরিহার্য শর্ত নয়। এ দৃষ্টি– কোনো থেকে মাওলানা মওদূদী (র) ইমাম মালেকের (র) যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাঁর মতে কষ্ট দেয়ার নিয়তে স্ত্রী সহবাস বর্জন করা "হুকমী ঈলার" অন্তর্ভুক্ত" একথা শতকরা একশ ভাগ সত্য।

www.pathagar.com

কিন্তু বর্তমান যামানার প্রতিপক্ষ আলেমগণ মাওলানা মওদূদী সাহেবের (র) সাথে আল্লাহর ওয়াস্তে শত্রুতা পোষণের কারণে সত্য কথা বললেও ক্ষমা করতে তৈরী নন। তাই দেখা যায়—মাওলানা (র) তাঁর আপত্তিকর বাক্য সংশোধন করে দেয়ার পরও 'ইযাহে ফাতাওয়ার' লেখক তাঁর সংশোধিত বাক্যের উপর আবারও আপত্তি করে বসলেন। (তবে এবারকার আপত্তি সংশোধনমূলক নয় বরং ঈর্ষা কাতর বলেই মনে হয়।) এ পর্যায়ে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন; ইমাম মালেকের মু'ত্তা, শরহে যারকানী, আহকামুল কুরআন বিদায়াতুল মুজতাহিদ ইত্যাদি মালেকী কিতাব সমূহে ইমাম মালেক (র) ঈলার মধ্যে 'হলফ' হওয়াকে জরুরী মনে করেছেন বলে জানা যায়। বরং স্ত্রী সহবাস না করার কসমকেই ঈলা বলা হয়। এতে কোনো মতবিরোধ নেই।" অথচ তার এই দাবী সঠিক নয়। ইমাম মালেকের (র) মতে 'কসম' হওয়া জরুরী 'হাকিকী ঈলায়' হুকমী ঈলায় হলফ হওয়া জরুরী নয়। একথা মালেকী মতাবলম্বী বিখ্যাত কিতাব 'আহকামুল কুরআন' ও বিদায়াতুল মুজতাহিদ এর পৃষ্ঠাসহ একটু আগে উদ্ধৃত করা হয়েছে। সেখানে স্পষ্টত লেখা আছে وان لم يحلف "যদিও কসম না হয়"। এরূপ স্পষ্ট বাক্যকে এড়িয়ে অভিযোগকারী লেখক সাহেবের উপরোক্ত দাবী ('কসম' জরুরী হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতবিরোধ নেই) কখনো সঠিক হতে পারে না।

মালেকী মতাবলম্বী উক্তি সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখার একটি আজব ব্যাখ্যা

"আহকামুল কুরআন" ১ম খন্ডের ৭৫ পৃষ্ঠা এবং "বিদায়াতুল মুজতাহিদ' ২য় খন্ডের ৮৮০ পৃষ্ঠায় ইমাম মালেক (র) 'কসম' ব্যতিরেকে হুকমী ঈলা হওয়ার যে কথা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন তার একটি আজব ব্যাখ্যা লেখক সাহেবের ভাষায় লক্ষ্য করা যায়। তিনি বলেন—আহকামুল কুরআনের উপরোক্ত অভিমত ইমাম মালেকের নয়, বরং এমত তাঁর অনুসারী আলেমগণের।" আর বিদায়াতুল মুজতাহিদে ইমাম মালেকের প্রতি প্রত্যক্ষ সম্বোধনকে তিনি রূপক (مجازا) বলে আখ্যায়িত করেছেন।

(এই আজব ব্যাখ্যা সঠিক না হওয়ার ব্যাপারে পরে আলোচনা করবো।)

www.pathagar.com

মতপার্থক্যেরসারকথা

"ইযাহে ফাতাওয়ার" সম্মানিত লেখক এবং মাওলানা মওদূদী (র) সাহেবের মধ্যে ঈলার ব্যাপারে যে মত পার্থক্য দেখা দেয় তার সার কথা হলো—কেউ যদি তার স্ত্রীকে শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে কসম না খেয়ে স্ত্রী সহবাস করা থেকে বিরত থাকে, তাহলে ইমাম মালেকের মতে এটা কোনো না কোনো ঈলার অন্তর্ভূক্ত সাব্যস্ত হবে এবং ঈলার হুকুম এর উপর প্রযোজ্য হতে পারে। নাকি এ অবস্থা ঈলার কোনো প্রকারেই দাখিল নয়? এই অবস্থা যেভাবে ইমাম মালেক সাহেবের (র) মতে হাকীকী ঈলার অন্তর্ভূক্ত নয় তদ্রূপ এটা হুকমী ঈলায়ও দাখিল হবে না।

মাওলানা মওদূদীর (র) অভিমত

এই অবস্থা সম্পর্কে মাওলানা মওদূদীর (র) রায় হলো, ইমাম মালেক সাহেবের (র) মতে যদিও এই অবস্থা হাকীকী (সত্যিকার) ঈলা নয়; কেননা হাকীকী ঈলার জন্যে হলফ থাকা জরুরী তথাপি এটা হুকমী ঈলা অর্থাৎ এই অবস্থায় ঈলার হুকুম প্রযোজ্য হবে। কারণ হুকমী ঈলার জন্যে 'হলফ' থাকা জরুরী নয়। শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকাই যথেষ্ট, যা এমতাবস্থায় পাওয়া যায়।

ইযাহে ফাতাওয়ার লেখকের অভিমত

অপরদিকে জনাব লেখকের দাবী হলো—ইমাম মালেকের (র) মতে এ ধরনের তৎপরতায় হাকীকী হুকমী কোনো ধরনের ঈলাই হবে না। কেননা, ইমাম মালেকের (র) মতে ঈলা হতে হলে সেখানে হলফ বা কসম থাকতে হবে। কসম বা শপথ ব্যতিরেকে স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকলে সেটা ঈলা নামে আখ্যায়িত হবে না।

কোনটি হক এবং সত্যনির্ভর?

উপরোক্ত দু'টি পরস্পর বিরোধী অভিমতের কোন টি সত্য ও সঠিক তা নির্ণয় করতে হলে আমাদেরকে মালেকী মতাবলম্বী আলেমদের রচিত কিতাবসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। কারণ, কোনো ইমামের অভিমত জানার উত্তম পন্থা হলো সে মতের অনুসারী আলেমদের উক্তি সমূহে দৃষ্টিপাত করা। কেননা কথায় বলে صاحب البيت ادرى بما فيه "ঘরের মালিক ঘর

www.pathagar.com

সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। তারপর ঐ মতের বহির্ভূত অন্যান্য বিজ্ঞ আলেমদের স্মরণাপন্ন হওয়া জরুরী। সুতরাং আমরাও সে প্রক্রিয়া অনুসরণ করে প্রথমত মালেকী মযহাবের আলেমদের উক্তি পেশ করবো। অতপর শাফেঈ মতামতের বিশ্লেষণ তুলে ধরা হবে।

মালেকী আলেমদের ফয়সালা

মালেকী আলেমদের কিতাব পত্রে সে জাতীয় মন্তব্য পাওয়া যায় যদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বিতর্কিত অবস্থা সম্পর্কে ইমাম মালেকের (র) অভিমত মাওলানা মওদূদীর (র) পেশকৃত অভিমতের অনুরূপ। ইযাহে ফাতাওয়ার লেখকের পেশকৃত অভিমতের অনুরূপ নয়। মালেকী মযহাবের প্রখ্যাত আলেম ইবনুল আরবীর সুপ্রসিদ্ধ তাফসীর আহ্‌কামুল কুরআন ১ম খন্ড, ৭৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন–

المسئلة الحادية عشر اذا ترك الوطى مضاراً بغير يمين
فلا تظهر بينة عندنا الا بالفعل لان الاعتقاد الكراهة
قد ظهر بالامتناع فلا يظهر اعتقاده الارادة الا بالاقدام
وهذا تحقيق بالغ . اه

"একাদশ মাসআলাঃ কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে হলফ করা ব্যতিরেকে স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকলে আমাদের মতে তার সাথে পুনঃ সহবাস করলেই তাকে ফিরিয়ে আনা বুঝা যাবে। কেননা, স্ত্রীর সাথে মনোমালিন্যের বহিঃপ্রকাশ স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে তো ঘটেছে, আবার স্ত্রীর সাথে পুনরায় সহবাস করা তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করারই আলামত, মুখে বলার প্রয়োজন করে না। সুতরাং এভাবে মাসআলাটি পরিপূর্ণ ও স্পষ্ট হয়ে গৃহীত হলো।"

ইমাম ইবনে আরাবী فان فاؤا আয়াতের অধীনে ঈলার আহকাম সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এই মাসআলার কথা উল্লেখ করেছেন। এতে কয়েকটি কারণে প্রমাণ হয় যে, ইমাম মালেকের (র) মতে শাস্তি দেয়া পরিমিত সময়ের জন্য স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা হুকমী ঈলা হিসেবে গণ্য; এ ক্ষেত্রে কসম করা প্রযোজন নেই।

www.pathagar.com

প্রথম কারণ, ইমাম ইবনুল আরাবী এ অবস্থার জন্যে فى শব্দটি বিষয় ভিত্তিক ও পরিভাষারূপে ব্যবহার করেছেন। আর এই শব্দটি ঈলার একটি বিশেষ পরিভাষা। অধিকন্তু এখানে ঈলার আহকামই বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং বিতর্কিত অবস্থা ইমাম মালেকের মতেও ঈলারই পর্যায়ভুক্ত বলে জানা গেল। অন্যথায় ইবনুল আরাবী ভিন্নমত প্রকাশ করতেন।

দ্বিতীয় কারণ, ইবনুল আরাবী (র) উপরোক্ত অবস্থাটি ঈলার আয়াতের অন্তর্ভুক্ত করে আহকামে ঈলার ব্যাখ্যা প্রসংগে উল্লেখ করেছেন। কাজটি যদি মূলত ঈলার সাথে জড়িত না হতো তাহলে ঈলার অধ্যায়ে এর উল্লেখ হতো না।

তৃতীয় কারণ, عندنا (আমাদের মতে) শব্দটির ব্যবহার ফকীহদের পরিভাষায় মযহাব ব্যক্ত করার জন্যে গঠিত বুঝায়। এতে একদিকে প্রসংগটি ঈলা হওয়া বুঝায়। অপরদিকে এই মতটি ইমাম মালেকের (র) সমর্থনপুষ্টও বুঝা যায়। এভাবে এ প্রসংগটি ইমাম মালেক (র) এবং মালেকী আলেমদের সম্মিলিত রায় হিসেবে প্রমাণ হয়। ইযাহে ফাতাওয়ার লেখক "ইমাম মালেকের (র) এই অভিমত নয়" বলে যে মন্তব্য করেছেন তা ঠিক নয়। যদি এ বিষয়ে মালেকী আলেম এবং স্বয়ং ইমাম মালেকের (র) মধ্যে মত পার্থক্যদেখা দিতো, তাহলে ইবনুল আরাবী অবশ্যই তার লেখায় একথার উল্লেখ করতেন যে, মালেকী আলেমগণের মতে ইহা যদিও ঈলার অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু খোদ ইমাম মালেক (র) এটাকে ঈলা মনে করেন না। তাঁর প্রণীত 'আহকামুল কুরআনের' আরো একটি মন্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করুন।

المسئلة الخامسة فيما يقع عليه الايلاء وذالك هو
ترك الوطى سواء كان فى حال الرضاء او الغضب عند
الجمهور - وقال الليث والشعبى لا يكون الا فى حال الغضب
وهذا الاختلاف انبنى على اصل وهو ان مفهوم الآية قصد
المضارة بالزوجة واسقاط حقها من الوطى - فلذالك
قال علمائنا اذا امتنع من الوطى قصداً للاضطرار من
غير عذر مرض او رضاع وان لم يحلف كان حكمه حكم

www.pathagar.com

المولى - لوجود معنى الايلاء فى ذالك فان الايلاء لم يرد لعينه وانما ورد لمعناه وهو المضارة وترك الوطى - اه

(ج ۱، ص ۲۴)

"পঞ্চম মাসআলা হলো, ঈলা কোন্ বস্তুর উপর পতিত হবে। জমহুরের মতে সন্তুষ্ট কিংবা অসন্তুষ্ট যে কোনো অবস্থায় স্ত্রী সহবাস ত্যাগ করার নাম ঈলা। আবুল লাইস এবং ইমাম শাবীর (র) মতে ঈলা কেবল অসন্তুষ্ট অবস্থায়ই পতিত হয়ে থাকে। এই মতপার্থক্য মূলত আয়াতের তাৎপর্য বুঝার উপরই নির্ভরশীল। আয়াতের তাৎপর্য 'কসম' করা নয় বরং স্ত্রীকে যাতনা দেয়া। আর সহবাস থেকে বিরত রেখে তাকে সে কষ্ট দেয়া অতিসহজ। সুতরাং আমাদের আলেমদের ভাষ্য হলো—রোগ কিংবা দুগ্ধপান জনিত ওযর ব্যতীত শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে আপন স্ত্রীর সাথে সহবাস করা থেকে বিরত থাকলে তা 'ঈলা নামে আখ্যায়িত হবে। এখানে কসম করা না করার মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। কেননা 'ঈলার যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তথা "স্ত্রীকে শাস্তি দেয়া" সেটা এখানে পূর্ণমাত্রায় বর্তমান, কসম করা উদ্দেশ্য নয়। (কাজেই বলা যায়, এমতাবস্থায় ঈলার অর্থ পূর্ণমাত্রায় বর্তমান রয়েছে।)

উপরোক্ত বাক্যে ইমাম ইবনে আরাবী (র) বিতর্কিত অবস্থাটিকে قال علمائنا (আমাদের আলেমগণ বলেন) বাক্য দ্বারা বর্ণনা করেছেন। এই বাক্যটিও নির্দিষ্ট মযহাবের সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করার জন্যে গঠিত। তাতে প্রতীয়মান হয় যে, বিষয়টি সম্পর্কে মালেকী আলেমগণ একমত এবং ইমাম মালেকও (র) এই মত পোষণ করতেন।

ইবনে রুশদ মালেকীর ব্যাখ্যা

কোনো ওযর ব্যতীত স্বামী স্ত্রীর যৌণক্ষুধা নিবৃত করতে 'কসম ছাড়া' বিরত থাকলে তা 'ঈলা অভিধায় অভিহিত হওয়া সম্পর্কে চার মযহাবের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কিন্তু ইমাম মালেক এ অবস্থাকেও ঈলা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে ইবনে রুশদ মালেকী তাঁর রচিত 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ' কিতাবের ২য় খন্ডের ১০১ পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ

(المسئلة الثالثة) واما لحوق حكم الايلاء للزوج اذا

www.pathagar.com

ترك الوطئ بغير يمين. فان الجمهور على انه لا يلزمه
حكم الايلاء من غير يمين۔
ومالك يلزمه ذالك اذا قصد الاضرار بترك الوطئ
وان لم يحلف على ذالك، فالجمهور اعتمد والظاهر
ومالك اعتمد المعنى۔ لان الحكم انما لزمه باعتقاده
ترك الوطئ، وسواء شد ذالك الاعتقاد بيمين او بغير يمين
لان الضرر يوجد فى الحالين جميعا۔ اه (بداية المجتهد ج ٢ ص ١٠١)

তৃতীয় মাসআলাঃ স্বামী স্ত্রীকে শাস্তি দেয়ার ইচ্ছায় কসম ছাড়া স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকলে তা ঈলা নামে অভিহিত হবে কি হবে না এ ব্যাপারে ইমামদের মতপার্থক্য রয়েছে। জমহুরের মতে এরূপ বিরত থাকায় ঈলার হুকুম জারি হবে না। কেননা এখানে 'হলফ' পাওয়া যায়নি। ইমাম মালেকের (র) মতে ঈলার হুকুম এ ক্ষেত্রে জারি হবে। তবে শর্ত হলো স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা স্ত্রীকে যাতনা দেয়ার উদ্দেশ্যে হতে হবে। জমহুর আয়াতের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করেছেন আর ইমাম মালেক নির্ভর করেছেন আয়াতের তাৎপর্য ও কারণের উপর। ফলে এ ক্ষেত্রে ঈলার হুকুম কার্যকর হওয়া অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। কারণ স্বামী স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার ইচ্ছা করে ফেলেছে। ইচ্ছাটি হলফ বা কসমের মাধ্যমে সুদৃঢ় হোক কিংবা না হোক, ঈলার উদ্দেশ্য যে স্ত্রীকে শাস্তি দেয়া উভয় অবস্থাতেই সেটা পাওয়া গেছে। কাজেই এ ক্ষেত্রে ঈলার হুকুম অনিবার্যরূপে প্রযোজ্য হবে।

ইবনে রুশদের উপরোক্ত বাক্যও ইমাম ইবনে আরাবীর (র) মতো পরিষ্কার যে, বিতর্কিত অবস্থাটি ঈলার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে প্রমাণিত। আর জমহুরের মতে এখানে কসম না থাকার দরুন আসল ও রূপক কোনো অর্থেই ঈলা হতে পারে না।

ইযাহে ফাতাওয়ার লেখকের ব্যাখ্যার সমালোচনা

এর উত্তরে উপরোক্ত বাক্যের এ বিশ্লেষণ পেশ করা যে, উক্ত অভিমত ইমাম মালেকের নয় বরং মালেকী আলেমদের –"লেখকের এই উক্তি

www.pathagar.com

যুক্তিসংগত নয়। কেননা, তার একথা একদিকে ফকীহদের স্বীকৃত নীতির খেলাফ। অন্যদিকে যদি এই অভিমত ইমাম মালেকের (র) না হতো তাহলে মালেকী মযহাবের বিখ্যাত কিতাবগুলোর কোথাও এর ব্যাখ্যা অবশ্যই থাকতো । অথচ এ ধরনের কোনো ব্যাখ্যা সেসব কিতাবের কোথাও উল্লেখ নেই। বরং উল্টো কথাই অর্থাৎ এরূপ কাজ ঈলা হওয়ার সুস্পষ্ট ইংগীত ইমাম মালেকের (র) দিকেই সম্পৃক্ত হওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন বিদায়াতুল মুজতাহিদের ২য় খন্ডের ১০১ পৃষ্ঠায় এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, যদ্বারা স্পষ্টত প্রমাণ হয় যে, এটা ইমাম মালেকের অভিমত।

"ইমাম মালেকের (র) প্রতি এই মাসআলার যে সম্বোধন করা হয়েছে তা রূপকার্থে" 'ফাতাওয়ার' লেখক সাহেবের একথাও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, প্রকৃত অর্থে সম্পৃক্ত করাতে যখন কোনো বাধা নেই, তখন রূপক অর্থে সম্বোধন করার টানাহেঁচড়া করার প্রয়োজনই বা কি? দ্বিতীয়ত রূপক অর্থে প্রয়োগ করার কোনো সংগত কারণও উপস্থিত নেই। এর সমাধানে বড়জোর এতোটুকু বলা যায় যে, মালেকী মযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহে ইমাম মালেকের (র) মতে ঈলার জন্য 'কসম' করা জরুরী বলে ব্যাখ্যা দেয়া আছে কিন্তু যে অবস্থায় কসম পাওয়া যাবে না, শুধুমাত্র স্ত্রীকে শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্য হবে সেটাকে ইমাম মালেক (র) ঈলা বলেননি বরং ইমাম মালেকের (র) অনুসারী আলেমগণ ঈলা বলেছেন। সুতরাং মালেকী আলেমদের এই সম্পৃক্তিকে রূপক অর্থে প্রয়োগ করা যেতে পারে। যেমনটি ইযাহে ফাতাওয়ার লেখক ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

এই ব্যাখ্যা দুর্বল

আমাদের মতে 'ইযাহে ফাতাওয়ার' লেখক সাহেবের পেশকৃত ব্যাখ্যা খুবই দুর্বল এবং অকার্যকর একটি সংলাপমাত্র। মালেকী মযহাবের কিতাবসমূহে এ বিষয়ে ইমাম মালেকের (র) যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, তার মতে ঈলার মধ্যে কসম থাকা জরুরী। এটা একথার জোরালো আলামত নয় যে, ইবনে রূশদের (র) বাক্যে ইমাম মালেকের (র) প্রতি যে সম্পৃক্তি করা হয়েছে তা রূপক অর্থে প্রযোজ্য হবে। কারণ এ সম্পর্কে যুক্তিসংগত পন্থায় বলা যায়, মালেকী কিতাব সমূহে যে ঈলার জন্যে 'কসম' থাকা জরুরী বলা হয়েছে তাহলো হাকীকী ঈলা। আর সেসব কিতাবেই 'কসম' ব্যতিরেকে

www.pathagar.com

শুধুমাত্র স্ত্রীকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে যে ঈলার কথা বলা হয়েছে তাহলো হুকমী ঈলা। এই উভয় কথাই ইমাম মালেক (র) এবং মালেকী আলেমগণের স্বীকৃত অভিমত। অর্থাৎ তাদের মতে ঈলা দু' প্রকার। 'কসম' থাকলে হাকীকী ঈলা। 'কসম' না থাকলে হুকমী ঈলা। এরূপ ব্যাখ্যায় মালেকী আলেমগণের বর্ণিত বিভিন্ন উক্তিসমূহের মধ্যে কোনো মতবিরোধ থাকে না। এবং ইমাম মালেকের প্রতি ঈলার যে সম্বোধন করা হয়েছে তাকে অযথা রূপক অর্থে প্রয়োগ করারও প্রয়োজন পড়ে না। পরন্তু এরূপ মালেকী মযহাবের সেসব কিতাবেই এরূপ ব্যাখ্যা করার সুস্পষ্ট অবকাশও রয়েছে। যেমন, মালেকী আলেম ইমাম ইবনে আরাবী তাঁর রচিত 'আহকামুল' কুরআন গ্রন্থে এ অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন– كان حكمه حكم المولى "এ অবস্থায় এটা ঈলা হুকুমের অন্তর্ভূক্ত হবে।" আর একথা তো দিবালোকের মতো সত্য যে, 'কসম' না থাকার দরুন এ অবস্থাটি প্রকৃতই ঈলা নয়। প্রকৃত ঈলা না হলে তা রূপক বা হুকমী ঈলা হতে বাধ্য। কেননা, মালেকী আলেমগণ এ অবস্থাটিকে ঈলা অভিধায় আখ্যায়িত করেছেন। অতএব, ঈলাকে দু' ভাগে ভাগ করে যে ঈলায় 'কসম' আছে তাকে হাকীকী এবং যে ঈলায় 'কসম' নেই শুধুমাত্র স্ত্রীকে কষ্ট দেয়া উদ্দেশ্য তাকে হুকমী ঈলা বলাই অধিকতর যুক্তিসংগত ও সুসামঞ্জস্যশীল।

শাফেঈ (র) মতাবলম্বীদের ব্যাখ্যাসমূহ

ইমাম শাফেঈ (র) অনুসারী আলেমদের রচিত কিতাব সমূহে একথা পাওয়া যায় যে, কসম ছাড়া শুধুমাত্র স্ত্রীকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে স্ত্রীসহবাস থেকে বিরত থাকলে তা ইমাম মালেকের (র) মতে ঈলার অন্তর্ভূক্ত হবে। এ প্রসঙ্গে ভাষ্য লক্ষণীয়ঃ

واختلفوا فيمن ترك وطى زوجته للاضرار بها من
غير يمين اكثر من اربعة اشهر هل يكون موليا؟ قال
ابو حنيفة والشافعيُّ لا - وقال مالك واحمد فى احدى
روايتيه نعم - اه (رحمة الامة ج ١، ص ...)

"যে ব্যক্তি কসম ব্যতিরেকে স্ত্রীসহবাস থেকে চারমাসের বেশী সময় বিরত থাকে তার এ কাজ ঈলা হবে কি হবে না এ নিয়ে আলেমগণ মত পার্থক্য

www.pathagar.com

করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম শাফেঈর (র) মতে এটা ঈলা নয়। ইমাম মালেক (র) এবং ইমাম আহমদের (র) এক বর্ণনানুযায়ী এটা ঈলার অন্তর্ভুক্ত।" (রহমাতুল উম্মাহ)

ইমাম শারানী (র) তাঁর রচিতগ্রন্থ 'মিযান' এ বলেছেন

قال ابوحنيفه والشافعي انه لوترك وطى زوجته
للاضرار بها من غير يمين اكثر من اربعة اشهر لايكون
موليا وقال مالك واحمد فى احدى روايتيه انه يكون
موليا - اه (ميزان ج۲-ص۱۲۵)

"ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম শাফেঈ (র) বলেন, কেউ কসম ছাড়া স্ত্রীসহবাস থেকে চার মাসের অধিক সময় বিরত থাকলে সেটা ঈলা হবে না। ইমাম মালেক (র) এবং ইমাম আহমদের এক বর্ণনানুযায়ী সেটা ঈলা হবে।" (মীযান, ২য় খন্ড, ১২৫ পৃষ্ঠা)

ইমাম শা'রানীর (র) কথা অধিক নির্ভরযোগ্য

আমার মতে ইমাম শা'রানী (র) এবং রহমতে উম্মতের গ্রন্থকার ইমাম মালেকের (র) অভিমত সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী (র) এবং ইযাহে ফাতাওয়ার লেখকের তুলনায় বেশী অবগত। জ্ঞানের দিক থেকেও এ দুজন উচ্চ পর্যায়ের ও শীর্ষস্থানীয়। তাদের কথা শেষোক্ত দু'জনের কথা অপেক্ষা অধিকতর নির্ভরযোগ্য। এই দু'জন মনীষী সুস্পষ্ট ভাষায় ইমাম মালেকের (র) অভিমত বর্ণনা করেছেন—যাতনা দেয়ার অভিপ্রায়ে স্ত্রীসহবাস থেকে 'কসম' না করেও বিরত থাকলে ইমাম মালেকের (র) মতে সেটা ঈলা গণ্য হবে। তারা একথাও বলেছেন, প্রসংগটি নিয়ে চার ইমামের মধ্যে মতের পার্থক্য রয়েছে, মতের ঐক্য নেই। কসম ব্যতিরেকে স্ত্রীসহবাস থেকে বিরত থাকা ইমাম মালেকের (র) মতেও ঈলা নয় এবং এ অবস্থায় ঈলা না হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত ইমাম একমত—ইযাহে ফাতাওয়ার মুহতারাম লেখক সাহেবের এ দাবী উপরোক্ত মনীষীদ্বয়ের উক্তির আলোকে আমরা কিভাবে গ্রহণ করতে পারি? বরং বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, স্ত্রীসহবাস থেকে বিরত থাকার কসমকেই ইমাম মালেকের (র) মতে ঈলা হওয়ার দাবী শুধুমাত্র

www.pathagar.com

ইযাহে ফাতাওয়ার লেখক সাহেবের একক ও একগুয়েমী দাবী। অন্যকারো মতামত এ দাবীর স্বপক্ষে নেই। উপরন্তু আলোচ্য লেখক অগ্রসর হয়ে আরো দাবী করেন—"ইমাম মালেকের (র) মতে কসম ব্যতীত ঈলা হতেই পারে না। তাঁর মতে বরং স্ত্রীসহবাস বর্জনের কসমকে মূলত ইলা বলা হয়। এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নাই।" (ইযাহ্, ১১৮ পৃষ্ঠা) আমাদের বিশ্লেষণ মতে তার এ দাবী ভিত্তিহীন।

ন্যায় পরায়ণ হযরতগণের উপর এর সঠিক ফায়সালার দায়িত্ব

বিতর্কিত অবস্থা উপরোক্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের আলোকে ইমাম মালেকের (র) মতে ঈলার অন্তর্ভূক্ত হবে কি হবে না এবং এ বিষয়ে মাওলানা মওদূদীর (র) রায় সত্য নাকি ইযায়ে ফতওয়ার লেখক সাহেবের রায় সত্য ও সঠিক সে ফয়সালা করতে হবে। আর ফয়সালা করার ভার আমরা সত্যপ্রিয় ও ন্যায়বান হযরতগণের উপর ছেড়ে দিলাম। তারাই আলেমগণের উপরোক্ত মন্তব্যের আলোকে নির্ণয় করবেন মাওলানা মওদূদীর (র) রায় সঠিক হওয়ার কাছাকাছি নাকি ফতওয়ার লেখক সাহেবের রায়।

মাওলানা মওদূদীর (র) রায়

বিষয়টি নিয়ে আমরা যতোটুকু চিন্তা করেছি তাতে মাওলানা মওদূদীর (র) পেশকৃত ধারণা সঠিক ও সম্পূর্ণ নির্ভুল মনে হয়। অর্থাৎ কসম ছাড়া স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা ইমাম মালেকের (র) মতে এবং মালেকী মযহাবের অন্যান্য আলেমদের মতে ঈলা হবে। মালেকী ও শাফেঈ মযহাবের আলেমগণের যেসব মন্তব্য উপরে বর্ণিত হয়েছে সেগুলি মাওলানা মওদূদীর। (র) পেশকৃত অভিমতের স্বপক্ষেই প্রতীয়মান হয়। কসম ছাড়া স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা ইমাম মালেকের (র) মতে হাকীকী ও হুকমী কোনো প্রকার ঈলারই অন্তর্ভূক্ত না হওয়ার যে দাবী 'ইযায়ে ফতওয়ার' লেখক করেছেন তা আমাদের ধারণায় সঠিক নয়। কেননা স্বয়ং মালেকী মযহাবের আলেমগণের মন্তব্য তার মতের সমর্থন করে না আবার শাফেঈ মযহাবের আলেমগণের রায়ও এর খেলাফ।

কিন্তু যদি তার ধারণা এই হত যে, বিতর্কিত অবস্থাটি ইমাম মালেকের (র) মতে হাকীকী ঈলার অন্তর্ভূক্ত তো নয় কিন্তু হুকমী ঈলার অন্তর্ভূক্ত,

www.pathagar.com

তাহলে তার এ ধারণা ষোলআনা সত্য ছিল। উপরন্তু এমত যেহেতু মাওলানা মওদূদীরও। কাজেই উভয়ের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিত না। আর এমতাবস্থায় মাওলানা মওদূদীর সমালোচনার প্রশ্নও দেখা দিতো না।

শেষ নিবেদন

পর্যালোচনা হিসাবে এখানে কয়েকটি কথা লেখা হলো। আল্লাহ সাক্ষ্য। এগুলো লেখার মূল লক্ষ্য কারো মনে অযথা দুঃখ দেয়া নয় বরং একমাত্র উদ্দেশ্য এটা দেখানো ও বর্ণনা করা যে, দুনিয়াতে এমন কোনো লোক নেই যার পদস্খলন বা ভুল হয় নাই অথবা তার দ্বারা আদৌ ভুল হতে পারে না। এ মর্যাদায় একমাত্র তিনিই ভূষিত যিনি সকল গুণের সৃষ্টিকর্তা ও মালিক। তিনি যাবতীয় দুর্বলতার উর্ধে, পাক-পবিত্র। এই বরকতময় সত্ত্বা ছাড়া অন্য কেউ মানবীয় দুর্বলতা মুক্ত নয়। আবার মানবীয় চাহিদা থেকে বিচ্ছিন্নও থাকতে পারে না। সুতরাং মাওলানা মওদূদী (র) সাহেব যেরূপ ভুল করতে পারেন তদ্রুপ আপনি এবং অন্যান্য হযরতেরও ভুল হতে পারে। ভুল বা ত্রুটি হওয়াই মানবীয় বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য না থাকলে মানুষ আর মানুষ থাকে না বরং খোদা হয়ে যায়।

অতএব, এমন গুণ সম্পন্ন লোক তালাশ করা যায় কোনো ভুল-ত্রুটি হয়েছে কিংবা হয়নি অথবা ভুল-ত্রুটি হয়ে যাওয়ার দরুন এখন সে অনুসরণীয় হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলার ধারণা করা একটি নিষ্ফল চেষ্টা এবং কালক্ষেপণ বৈ আর কিছুই নয়। এ ধরনের ভুল ধ্যান-ধারণা কখানো পুর্ণ হওয়ার নয়। এ উদ্দেশ্যে অপরের গোপন দোষ-ত্রুটি খুঁড়ে খুঁড়ে বের করে জনসমক্ষে প্রচার করা শরীয়তের দৃষ্টিতে ভালো কাজ নয় এবং দ্বীনেরও কোনো উপকারী সেবা হতে পারে না। অবশ্য যারা ইসলাম বিদ্বেষী তাদের ইচ্ছা হল এখানে সব কিছুই হতে পারে, চলতে পারে কিন্তু ইসলাম চলতে দেয়া যায় না। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সমস্ত সম্ভাবনা একেবারে ধূলিস্মাত করে অনৈসলামী আইন-কানুন জারী করাই তাদের মনোকামনা। কেননা, দ্বীনদার লোকদের পারস্পরিক শৃংখলা, ঐক্য ও একতায় বেদ্বীন লোকদের ক্ষতি হওয়ার প্রবল আশংকা আর পারস্পরিক কলহে ফায়দা তাদের অনেক। সুতরাং দ্বীনদার ও দ্বীনপ্রিয় লোকদের মধ্যে ঝগড়া ফাসাদ ও বিরোধিতা যতো বাড়বে দ্বীন বিদ্বেষী লোকদের জন্যে পরিবেশ ও পরিস্থিতি

www.pathagar.com

ততোই অনুকূল, ময়দান থাকবে তত উর্বর। অপরদিকে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েমের পথ হবে দুর্গম, কন্টকাকীর্ণ।

আজকের দিনে ধর্মপ্রাণ শ্রেণী এবং ইলমী মহলের ঐকান্তিক বাসনা যদি হয় ইসলাম বিরোধী চক্রের উন্নতি ও প্রগতি এবং মানব জীবনের কর্তৃত্ব করবে আল্লাহর দেয়া বিধানের পরিবর্তে মানব রচিত বিধান; তাহলে তাদের এ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত; বরং আরো তীব্র আকারেই বজায় রাখা সমীচীন। আর যদি তাদের কামনা হয় অনৈসলামী আইন-কানুন চীরতরে খতম করে মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করা- তাহলে ইসলামের বর্তমান নাযুক অবস্থা উপলব্ধি করত পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কলহের পথ পরিহার করে একে অপরকে স্নেহ, ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যের আবেশে আলীংগণবদ্ধ করতে হবে। নিজেরদের সমস্ত ইলমী ও আমলী শক্তি এবং সাংগঠনিক যোগ্যতা ইসলামের হৃত গৌরব ফিরে পাওয়ার অভিপ্রায়ে ব্যয় করতে হবে। যারা ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ থাকার কারণে খতমে নবুয়্যত এবং হাদীস অস্বীকার ইত্যাদি ফিতনায় জড়িয়ে পড়েছে অথবা পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে নেশাগ্রস্থ কিংবা ফিরিংগীপনার চাকচিক্যে মোহাচ্ছন্ন, তাদের সংশোধনের উপায় নিয়ে চিন্তা করা দরকার। পরন্তু যারা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে সন্দিহান বরং এ দেশের মাটিতে পাশ্চাত্য আইন-কানুন চালু করতে আগ্রহী—নিজেদের সম্মিলিত শক্তি ও সামর্থ নিয়ে তাদের মুকাবিলায় নামতে হবে। বস্তুত দেশের চিন্তাবিদ ও সুধীজন যতক্ষণ পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধভাবে আইনানুগ পদ্ধতি ও নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় সৃষ্টিকারীদেরকে উৎখাত না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ সুদূর পরাহত হয়েই থাকবে। বাস্তবতার মুখ দেখা আদৌ সম্ভব হবে না। জাতি বরং দেশও পাশ্চাত্যের গোলামে পরিণত হয়ে থাকবে। এর চেয়ে বড় দুর্ঘটনা আমাদের জন্যে আর কিছুই হতে পারে না।

ওলামায়ে কিরাম এবং দ্বীনদার লোকদের কাছে এ সত্য গোপন নেই যে, দ্বীনের ছোট-খাটো ব্যাপার নিয়ে ঠোকাঠোকি করা এবং এগুলিকে কেন্দ্র করে একে অপরের বিরুদ্ধে কুফরী ও ফাসেকী ফতওয়াবাজীতে মত্ত হওয়া বর্তমান সময়ের জন্যে ধর্মীয় ফিৎনার কলেবর বৃদ্ধি বৈ আর কিছুই নয়। এ ধরনের তৎপরতা দ্বীনের কোনো উপকারই করতে পারে না এবং আলেম ও সাধারণঈ মুসলমানদের জন্যেও কল্যাণকর নয়। বরং এরূপ কাঁদা ছোড়াছুড়িতে

www.pathagar.com

অজ্ঞ লোকদের মনে আগের যুগের বুযর্গ এবং স্বয়ং ইসলাম সম্পর্কে খারাপ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা সৃষ্টি হতে থাকে। এবং তাদেরকে গাল-মন্দ করারও প্রবণতা জাগে। কারণ আজ যে বিষয়কে কেন্দ্র করে এক ব্যক্তিকে কাফের, ফাসেক, গোমরাহ্ বলা হচ্ছে কয়েক বছর আগ পর্যন্ত প্রথম যুগের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোকরা সে বিষয়টির অনুসরণ করেছেন। এ ধরনের তৎপরতা আরো কিছুদিন অব্যাহত থাকলে মূল দ্বীন থেকে লোকদের ছিটকে পড়া বিচিত্র নয়। এর পরিণতি সামগ্রিকভাবে দ্বীন ও দ্বীনদার সব লোকদের জন্যে অত্যন্ত ভয়াবহ এবং বিপজ্জনক বলে আমরা মনে করি।

একটি সম্পূরক নিবেদন

শিক্ষিত ও ইসলাম প্রিয় মহলের খেদমতে নিবেদন, উপরোল্লেখিত কথাগুলো পেশ করার উদ্দেশ্য কখনো এটা নয় যে, কাউকে তার ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে আদৌ সতর্ক না করা অথবা সঠিক পদ্ধতিতে তার ভুল কাজের সমালোচনা না করা। বরঞ্চ এসব বিষয়ে সংশোধন করার মনোবৃত্তি থাকা এবং সমালোচনার উদ্দেশ্য সৎ ও কল্যাণকর হওয়া বাঞ্ছনীয়। একজন বন্ধু অপর বন্ধুর কিংবা একজন সুহৃদ অপর সুহৃদের দোষ-ত্রুটি সংশোধনের অভিপ্রায়ে যেভাবে সহানুভূতি ও সহযোগিতার সাথে সমালোচনা করে থাকে, তেমনি ওলামায়ে কিরাম ও দীনদার লোকগণ একে অপরের ভুলত্রুটির সমালোচনা পর্যালোচনা করবেন অবাধে, নির্বিঘ্নে। তবে উদ্দেশ্য হতে হবে সৎ ও সংশোধনমূলক, কল্যাণকর। উদ্দেশ্য সৎ ও মহত হলে ভুলের সমালোচনায় ভাষা থাকে সংযত, আচরণ হয় ভদ্রজনোচিত, ফুটে উঠে সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্ব। আর যদি উদ্দেশ্য হয় অপরকে হেয় করা তাহলে ভুলের সমালোচনায় ভাষা অসংযত, রায় বল্গাহীন, কথা বের হয় লাগাম ছাড়া আর প্রোপাগান্ডা চলে ভিত্তিহীনভাবে। এরূপ সমালোচনা কখনো শরীয়ত স্বীকৃত নীতি হতে পারে না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه الحديث

"মুসলমান একে অপরের ভাই। একজন অপর জনের উপর যুলম করবে না এবং তাকে বে-ইজ্জতীও করতে পারে না।" (আল-হাদীস)

www.pathagar.com

দোয়া

আয় আল্লাহ! তুমি শিক্ষিত ও দ্বীন পসন্দ লোকদেরকে সময়ের দাবী ভালোভাবে উপলব্ধি করার শক্তি দাও; পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং ঝগড়া ফাসাদ থেকে বাঁচার তৌফীক দাও। সংশোধনের নামে এক ধরনের ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বিরত রেখে গঠনমূলক বিষয়ে তাদের সমগ্র দৃষ্টি একীভূত করে দাও আয় আল্লাহ! তাদেরকে দেশ ও জাতির সঠিক খেদমত করার শক্তি দাও এবং এই বিগড়ে যাওয়া জাতিকে সংশোধনের পথ দেখাও।

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

খোলাপ্রসংগ

যেসব বিতর্কিত বিষয়কে কেন্দ্র করে মাওলানা মওদূদীকে (র) বিদ্রূপাত্মক নিন্দা ও অপবাদ দেয়া হয়েছে তন্মধ্যে খোলা [১] প্রসংগটি অন্যতম। এ বিষয়ে মাওলানা মওদূদীর (র) দু'টি কথা আপত্তি কর বলে কোনো কোনো বুযর্গ মনে করেন। প্রথম কথা, মাওলানার (র) মতে স্ত্রীর জন্য ইদ্দত একটিমাত্র হায়েয। অর্থাৎ স্বামীর কাছ থেকে খোলা করার পর দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করার জন্যে স্ত্রীকে তিন হায়েযের অপেক্ষা কর হবে না এক হায়েয অতিবাহিত হওয়ার পরই সে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারবে। কারণ, এই অপেক্ষাকরণ প্রকৃতপক্ষে 'রেহেমের বিশুদ্ধি যাচাই করা যাতে করে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করার আগে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, স্ত্রীলোকটি গর্ভবতী নয়। সুতরাং হায়েয অতিবাহিত হওয়াই যথেষ্ট। [তাফহীমুল কুরআন ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৭৬]

দ্বিতীয় আপত্তিকর কথা, মাওলানা মওদূদী (র) সাহেব তাঁর "স্বামী স্ত্রীর অধিকার" গ্রন্থে লিখেছেন— শরীয়ত স্বামীকে যেভাবে তালাক দেয়ার আইনানুগ অধিকার দিয়েছেন এবং সে তার এই অধিকার স্ত্রীর অসম্মতিতেও প্রয়োগ করতে পারে; তেমনি শরীয়ত স্ত্রীকে খোলা করা বিধান সম্মত অধিকার দিয়েছে এবং এই অধিকার স্বামীর অসম্মতিতেও কোর্টে প্রয়োগ করতে পারে।

আলেমগণ ঘোর আপত্তি করে বলেন, কথা দু'টি কেবলমাত্র ভুলই নয় বরং কুরআনের ফয়সালার সুস্পষ্ট লংঘনও কেননা খোলাকে তালাকের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। আর তালাকের বদ্দত কুরআনের আলোকে তিন হায়েয। কুরআনের ঘোষণা

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ " مطلقہ

"তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীকে দ্বিতীয় বিবাহের জন্যে তিন হায়েয পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।"

---

১. স্বামীর সাথে বনিবনা না হলে স্বামীর কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার স্ত্রীকে দেয়া অধিকারের নাম খোলা।

www.pathagar.com

সুতরাং এক হায়েযের ইদ্দত বলা উপরোক্ত আয়াতের সুস্পষ্ট বিরোধী যা কোনোক্রমেই জায়েয হতে পারে না। অনুরূপ তালাক দেয়া এবং বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো স্বামীর একটি বিশেষ অধিকার তার সম্মতি ব্যতিরেকে কোর্ট করার অধিকার পেতে পারে না। বরং স্বামীই এর একমাত্র বৈধ অধিকারী।

খোলার ব্যাপারে এই দু'টি কথার উপর কোনো কোনো দ্বীনি ও ইলমী মহল থেকে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে।. বিষয় দু'টি কুরআনের আলোকে সত্যিই ভুল নাকি কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে সঠিক তা আমাদের জানা দরকার। চার মযহাবের ইমাম চতুষ্টয়ের কোনো কোনো ইমাম এর উভয়টিরই সমর্থক ছিলেন। আমরা নিম্নে 'ইদ্দত' প্রসংগটি প্রথমে আলোচনা করতে চাই। অতপর অন্যান্য প্রসংগ। তবে প্রাথমিকভাবে নিম্নবর্ণিত তিনটি বিষয় স্মরণ রাখা জরুরী।

প্রাথমিক বিষয়

একঃ নীতিগতভাবে সে আকীদা ও কাজের নামই গোমরাহী যা কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। সম্মানিত সাহাবী এবং সলফে সালেহীনের কাজেও তা পরিলক্ষিত না হয়। অন্যথায় যে কোনো কাজকে ঢালাও ভাবে গোমরাহী বলাটাই মূলত গোমরাহী।

দুইঃ ফিক্হী শাখাগত বিষয়ে প্রথম যুগের আলেম এবং মুজতাহিদগণের মধ্যে পারস্পরিক মতপার্থক্য দেখা দিলে তাঁদের যে কোনো আলেম ও মুজতাহিদের রায় অনুযায়ী আমল করা জায়েয। শরঈ দলীলের ভিত্তিতে বিভিন্ন মতের মধ্যে কোনো একটিকে প্রাধান্য দিয়ে তদানুযায়ী আমল করাও যেতে পারে। এটা কোনো নাজায়েয কাজ নয়। 'তাকলীদ' অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

তিনঃ ফিকহী এবং শাখা-প্রশাখাগত বিষয়ে মাওলানা মওদূদী (র) উপরে বর্ণিত ২নং ধারার নীতি অনুসরণ করেছেন। আর এই নীতি চার মযহাবের চিন্তাবিদ ও অভিজ্ঞ আলেমদের কারো মতেই আপত্তিকর নয়। ইতিপূর্বে তাকলীদের মাসআলায় বিষয়টা আলোচিত হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের জরুরী বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের পর নিম্নে কুরআন ও হাদীসের আলোকে খোলার ইদ্দত সম্পর্কেও আলোচনা পেশ করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

খোলার ইদ্দতের বিশদ আলোচনা

খোলাপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত প্রসংগটি সাহাবীদের যুগ থেকে চার ইমামের যুগ পর্যন্ত বিতর্কিত বিষয় হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। অন্যান্য খুটিনাটি ও ইজতিহাদী মাসআলার মতো এই বিষয়টি নিয়েও ইমাম, আলেম ও ফকীহগণ একে অপরের সাথে মতপার্থক্য করেছেন। খোলা প্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর মতোই সাধারণভাবে তিন হায়য এর চেয়ে কম নয়— এর স্বপক্ষে যেমন রয়েছেন সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন তবে তাবেঈনের একটি বিরাট দল তদ্রূপ হায়েয ইদ্দত হওয়ার সমর্থনেও সাহাবী ও তাবেঈনদের নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিবর্গ এবং কিছু সংখ্যক আদেশ লক্ষ্য করা যায়। ইমাম তিরমীযী (র) তাঁর জামে তিরমীযীতে মতবিরোধের উল্লেখ করে বলেনঃ

واختلف اهل العلم في عدة المختلعة فقال اكثر
اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان عدة
المختلعة عدة المطلقة وهو قول الثوري واهل الكوفة
وبه يقول احمد واسحق وقال بعض اهل العلم من
اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم عدة المختلعة
حيضة واحدة قال اسحق وان ذهب الى هذا ذاهب
فهو مذهب قوي - اھ (ترمذي باب ما جاء في الخلع)

"খোলাপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত সম্পর্কে আলেমগণ মতপার্থক্য করেছেন, সাহাবায়ে কিরাম এবং অন্যান্য আলেমগণের অধিকাংশের মতে খোলা প্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর ন্যায় তিন হায়েয। সুফিয়ান সাওরী এবং কূফাবাসীরা এ মতের সমর্থক। ইমাম আহমদ এবং ইমাম ইসহাকও এই মত পোষণ করতেন। অপরাপর কোনো কোনো সাহাবী এবং আহলে ইলমের মতে তাদের ইদ্দত শুধুমাত্র এক হায়েয। ইমাম ইসহাক বলেছেন, যদি কেউ দলীলের ভিত্তিতে এই মত গ্রহণ কর, তবে এটাই হবে মজবুত অভিমত।" (জামে তিরমীযী, খোলা পরিচ্ছেদ)

ইমাম তিরমীযীর উপরোক্ত ভাষ্যে দু'টি বিষয় জানা যায়। এক, খোলাপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত প্রসংগটি সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকে পরবর্তী ইমামগণের যুগ

www.pathagar.com

পর্যন্ত বিতর্কিত বিষয়রূপে পরিগণিত হয়ে আসছে। কোনো একটি সিদ্ধান্তর উপর মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। প্রত্যেক যুগের অধিকাংশের মত হলো তাদের ইদ্দত তিন হায়েযের কম নয়। অপরদিকে, কিছু সংখ্যক আলেমের মত হলো তাদের ইদ্দত এক হায়েয, তার চেয়ে বেশী নয়। আর দলীলের ভিত্তিতে এটাই জোরালো মত। ইমাম তিরমীযী (রা), ইমাম আহমাদ ও ইমাম ইসহাকের মত বর্ণনা করেছেন যে, খোলাপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত তিন হায়েযই, কম নহে। কিন্তু কোনো কোনো মুহাক্কিক ইমামদ্বয়ের বিপরীত মত তিন হায়েয নয় এক হায়েযের পক্ষে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোনো কোনো মুহাক্কিক দু' ধরনের রেওয়ায়েত থাকার কারণে ইমামদ্বয়ের দু' ধরনের মতের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে এক হায়েযের মতটিকে দলীলের ভিত্তিতে প্রাধান্য দিয়েছেন। হাফেজ ইবনে কাইয়্যেমের মতামত এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেনঃ

ان الشارع جعل عدة المختلعة حيضة كما ثبتت به السنة
واقربه عثمان وابن عباسؓ وابن عمر ورضى الله عنهم وحكاه
ابن جعفر النحاس فى ناسخه ومنسوخه اجماع الصحابة و
هو مذهب اسحق واحمد بن حنبل فى اصح الروايتين عنه
دليلا - اھ (زاد المعاد ج ٤ ص ٣٠٤ فصل عدة الطلاق)

"সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত যে, খোলাপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত একটি মাত্র হায়েযই প্রবর্তন করেছেন। হযরত ওসমান (রা), ইবনে আব্বাস (রা) এবং ইবনে ওমর (রা) একথা স্বীকার করেছেন। ইবনে যাফর ও তাঁর রচিত 'নাসেয মানসুখ' এ একথা সাহাবীর ইজমা বলে উল্লেখ করেছেন। অধিকন্ত ইমাম ইসহাকেরও এটাই মত বরং তাঁর মতে দলীলের দিক থেকে এই মতটি অধিকতর জোরালো। ইমাম আহমদও এইমত পোষণ করতেন।"

(যাদুল মাআদ, ৩য় খন্ড, ৩০৪ পৃষ্ঠা তালাকের ইদ্দত পরিচ্ছেদ)

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার (র) গৃহীত মতকে ইবনে কাইয়্যেম আপন মযহাবের মর্যাদা দিয়ে থাকেন। তিনি ইবনে তাইমিয়ার (র) মত ব্যক্ত করেছেন–

وذهب الى هذا المذهب اسحق بن راهويه والامام احمد فى
روايته اختارها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وقال من نظر

www.pathagar.com

الى هذا القول وجده مقتضى قواعد الشريعة - اهـ زاد المعاد ج٤ ص٥٠

ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (র)-এর মত অনুরূপ ছিল। এই অভিমত। ইমাম আহমদও এই মত পোষণ করেছেন। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার (র) গৃহীত মতও এটা। তিনি বলেছেন, কেউ একথার প্রতি একটু চিন্তা করলে সহজেই বুঝতে পারবে যে, এটাই শরঈ আইনের যথাযথ দাবী এবং শরীয়তের সাথে সুসামঞ্জস্যশীল।

(যাদুল মাআদ, ৪র্থ খন্ড, ৫০ পৃষ্ঠা)

আলেমদের উপরোক্ত ব্যাখ্যার আলোকে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বিষয়টি বিতর্কিত। সাহাবীগণের যুগ থেকে পরবর্তী সময়ের ইমামগণ পর্যন্ত এ বিতর্ক চলে আসছে উভয় পক্ষেই কমবেশী লোক রয়েছেন যে, খোলাপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত মাত্র এক হায়েয, অধিক নয়। অবশ্য সংখ্যাধিক্য ও সংখ্যা লঘুর পার্থক্য এখানে রয়েছে।

এবার আমরা উভয় পক্ষের তাত্ত্বিক আলোচনায় অগ্রসর হতে পারি। এ নিরিখেকার মত অধিকতর যুক্তিসংগত ও জোরালো তা নিরূপণের চেষ্টা করা হবে। যে ব্যাপারে ইমাম ইসহাক وان ذهب الى هذا ذاهب فهو مذهب قوى- মন্তব্য করেছেন।

সংখ্যা গরিষ্ঠের দলীল

খোলাপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত তিন হায়েযের কম না হওয়ার যে অভিমত অধিকাংশ আলেমগণ ব্যক্ত করেছেন এর স্বপক্ষে তাঁরা দলীল পেশ করেন যে, খোলা শরঈ বিধানের আলোকে তালাকেরই নামান্তর এবং প্রকারান্তে তালাকই। আর তালাকের ইদ্দত তিন হায়েযের কম না হওয়া কুরআনের ঘোষণা। কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلثة قروء

"তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীরা (দ্বিতীয় বিবাহের জন্য) তিন হায়েয পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।"

সংখ্যা লঘুর দলীল

সাহাবায়ে কিরাম ও অন্যান্য আলেমগণের মধ্যে যারা খোলাপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত এক হায়েযের বেশী না হওয়ার অভিমত ব্যক্ত করেছেন তারা এ মতের

www.pathagar.com

স্বপক্ষে আকলী ও নকলী এই ধরনের দলীল পেশ করেছেন। নিম্নে সেগুলি বর্ণিত হলোঃ

নকলী দলীল

বিভিন্নসূত্রে ইবনে আব্বাস (রা) রুবায়া বিনতে মুআওয়ায় এবং অপরাপর সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ শরীফ উল্লেখিত সাবিত বিন কায়েসের স্ত্রী খোলা করার হাদীসটি প্রনিধানযোগ্য। সাবিত বিন কয়েসের স্ত্রী স্বামী থেকে খোলা প্রাপ্তা হলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে মাত্র এক হায়েয অতিক্রম করার নির্দেশ দেন। হাদীসের ভাষা নিম্নরূপঃ

عن الربيع بنت معوذ بن عفراء انها اختلعت على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان تعتد بحيضة

"রুবাইয়্যা বিনতে মুআওয়ার থেকে বর্ণিত, সাবিত বিন কয়েসের স্ত্রী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে স্বামী থেকে খোলা প্রাপ্তা হলে তাকে এক হায়েয পরিমাণ সময় ইদ্দত পালনের নির্দেশ দিলেন।"

(তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা)

عن ابن عباس ان امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها النبي صلى
الله عليه وسلم ان تعتد بحيضة - اھ (ترمذی، ج ۱ ص ۱۴۲)

"হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেছেন রসূলুল্লার (সাঃ) যুগে সাবিত বিন কয়সের স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে খোলা হাসিল করেছিল। অতপর নবী করীম (সাঃ) তাকে এক হায়েয ইদ্দত পালনের নির্দেশ দেন।"

(তিরমিযী, ১ম খন্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা)

আবূ দাউদ সূত্রে বর্ণিত হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা) খোলা প্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত এক হায়েয হওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। যথাঃ

عن نافع عن ابن عمر انه قال عدة المختلعة حيضة -

(ابوداود، ج ۱ ص ۳۰۳)

নাফে ইবনে ওমর (রা) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। ইবনে ওমর খোলাপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত এক হায়েযের কথা বলেছেন।

www.pathagar.com

ইমাম নাসাঈ ও রুবাইয়্যা বিনতে মুয়াওয়াযের বর্ণনা সূত্রে সাবিত বিন কয়েসের স্ত্রীর খোলার ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তার ভাষা নিম্নরূপঃ

فامرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تعتد بحيضة واحدة
وتلحق باهلها

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এক হায়েয অতিবাহিত হওয়ার পর নিজের আত্মীয় স্বজনদের কাছে যাওয়ার নির্দেশ দেন
(যাদুল মাআদ, ৪র্থ খন্ড, ৪৮পৃষ্ঠা)

উপরোল্লেখিত রেওয়ায়েতগুলি সাবিত বিন কয়েসের স্ত্রীর খোলা সম্পর্কে বর্ণিত। নিম্ন রুবাইয়া বিনতে মুআওয়াযে কর্তৃক নিজের খোলা সম্পর্কে বর্ণিত রেওয়ায়েত লক্ষ্যণীয়ঃ

روى الليث بن سعد عن نافع انه سمع الربيع بنت معوذ
بن عفراء وهي تخبر عبد الله بن عمر انها اختلعت من
زوجها في عهد عثمان بن عفان فجاء عمها الى عثمان فقال ان
ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم افتنتقل؟ فقال
عثمان لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها الا انها
لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية ان يكون بها حبل فقال
عبد الله فعثمان خيرنا واعلمنا - اه (زاد المعاد ج ٤ ص ٥٠)

"লাইস বিন সায়াদ নাফে থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি স্বয়ং রুবাইয়া বিনতে মুআওয়ায বিন আফরা থেকে শুনেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের (রা) কাছে তিনি নিজের খোলার ঘটনা বর্ণনা করে বলেনঃ হযরত ওসমানের শাসনামলে যখন আমি আমার স্বামী থেকে খোলা লাভ করি তখন আমার চাচা ওসমানের কাছে এসে আরয করলেনঃ রুবাইয়্যা আজ তার স্বামী থেকে খোলা করে নিয়েছে। সে তার ঘর থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে পারবে কি? ওসমান বললেন, স্থানান্তরিত হতে পারবে, তবে একে অপরের নিরাস পাবে না। এবং রুবাইয়্যার জন্যে কোনো উদ্দতও পালন করতে হবে না। তবে হায়েযের মধ্যে সে দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া থেকে বিরত থাকবে এ কারণে যে, তার গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা

www.pathagar.com

থাকতে পারে। ইবনে ওমর (রা) বললেন, ওসমান (রা) আমাদের চেয়ে উত্তম এবং অধিক জ্ঞানী ছিলেন।" (যাদুল মাআদ, ৪র্থ খন্ড, ৫০ পৃষ্ঠা।)

ইবনে আবূ শাইবাহ (রা) লিখেছেন, ইবনে ওমর (রা) এর আগে খোলা প্রাপ্তা স্ত্রীকে তিন হায়েয পর্যন্ত ইদ্দত পালন করার সমর্থক ছিলেন। হযরত ওসমানের (রা) এই ফয়সালার কথা শুনে তিনি তাঁর মত বদলিয়ে ফেলেন।

ইমাম নাসায়ী 'সুনানে কবীরে' ওবাদাহ্ ইবনে ওলীদের বরাতে রুবাইয়্যার খোলার ঘটনা ব্যক্ত করে বলেনঃ

عن عبادة بن الوليد قال قلت للربيع بنت معوذ حدثني
حديثك قالت اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت
ماذا علي من العدة؟ قال لا عدة عليك الا ان يكون حديث
عهد بك فتمكثين حتى تحيضين حيضة قالت وانما يتبع
في ذالك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم
المغالية كانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه ـ اهـ

(زاد المعاد، ج ٤ ص ٣٠٨)

"ওবাদাহ বিন ওলীদের বর্ণনা। তিনি বলেন— আমি রুবাইয়া বিনতে মুআওয়াযকে তাঁর খোলাপ্রাপ্তির ঘটনা বলতে বললাম। তিনি বললেন, আমি স্বামীর কাছ থেকে খোলা গ্রহণ করে হযরত ওসমানের কাছে গেলাম এবং আমার ইদ্দত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তোমার ইদ্দত পালন করতে হবে না। তবে কাছাকাছি সময়ে স্বামীর সাথে মিলন হয়ে থাকলে দ্বিতীয় বিবাহের জন্যে তোমাকে এক হায়েয অবধি অপেক্ষা করতে হবে। রুবাইয়্যার ভাষ্য— হযরত ওসমান (রা) এ ক্ষেত্রে সাবিত বিন কয়েসের খোলাপ্রাপ্তা স্ত্রী মরিয়মের ব্যাপারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন সে নীতিই গ্রহণ করেন।"

(যাদুল মাআদ, ৪র্থ খন্ড, ৩০৮ পৃষ্ঠা)

এসব রেওয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, খোলাপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত শুধুমাত্র এক হায়েয তার অধিক নয়। আর এই নির্দেশ সর্ব প্রথম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাবিত বিন কয়েসের খোলাপ্রাপ্তা স্ত্রীর ব্যাপারে প্রয়োগ

www.pathagar.com

করেন। এরপর হযরত ওসমান (রা) রুবাইয়্যা বিনতে মুয়াওয়যের ব্যাপারে হুজুরকে অনুসরণ করেন। অন্যান্য সাহাবীগণও এরূপ করেছেন। হযরত ওসমান (রা) রুবাইয়্যা বিনতে মুআওয়ায, ইবনে আব্বাস এবং ইবনে ওমর (রা) এমতই পোষণ করতেন। এ প্রসঙ্গে হাফেয ইবনে কাইয়েম (রা) বলেন-

وفى امره صلعم المختلعة ان تعتد بحيضة واحدة دليل
على انه لا يجب عليها ثلث حيض - بل تكفيها حيضة واحدة
وهذا كما انه صريح السنة فهو مذهب عثمان بن عفان و
عبد الله ابن عمر وابن عباس والربيع بنت معوذ وعمها
رضى الله عنهم اجمعين - اه (زاد المعاد ج ٤ ص ٥٠)

"খোলাপ্রাপ্তা স্ত্রীকে এক হায়েয ইদ্দত পালনের যে নির্দেশ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদান করেছেন তা একথারই দলীল যে, খোলাপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত তিন হায়েয নয় বরং এক হায়াযই যথেষ্ট। এটা যেমন সুস্পষ্ট তেমনি হযরত ওসমান, ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস, রুবাইয়া বিনতে মুআওয়ায ও তাঁর চাচারও (রা) এই মত।"

(যাদুল মাআদ, ৪র্থ খন্ড, ৫০ পৃষ্ঠা)

বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল

উপরোক্ত দাবী প্রমাণ করার জন্যে বর্ণনা মূলক দলীল ছাড়া বুদ্ধিবৃত্তিক দলীলও পেশ করা হয়েছে। সেটা হলো-খোলা একবার হয়ে গেলে তা রদ্ বা ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার স্বামীর না থাকার ব্যাপারে ইমাম চতুষ্টায় একমত এবং খোলা প্রতিষ্ঠা হতেই স্ত্রী বিবাহ বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। খোলাকে ফসখ্ (বাতিল করণ) বা বাইন তালাক যেভাবেই মূল্যায়ণ করা হোক না কেন তাতে বিবাহ বন্ধন থাকে না। এ ব্যাপারে হাফেজ ইবনে কাইয়েম বলেন-

فاذا تقارلا الخلع وردعليها ما اخذ منها وارتجعها فى العدة
فهل لهما ذالك؟ منعه الائمة الاربعة وغيرهم وقالوا
قد بانت منه بنفس الخلع - اه

"যদি স্বামী স্ত্রী উভয় খোলা ভংগ করে স্বামী স্ত্রী থেকে খোলার বিনিময়ে প্রাপ্ত মাল স্ত্রীকে ফিরিয়ে দিয়ে ইদ্দতের মধ্যেই স্ত্রীকে ফিরায়ে আনতে ইচ্ছা

www.pathagar.com

করে তাহলে সেটা জায়েয হবে কিনা? ইমাম চতুষ্টায় এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। অন্যান্য আলেমগণও এ কাজে বাধা দিয়ে বলেছেন খোলা করার সাথে সাথে স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়।"

চার ইমামের ঐক্যমতে খোলাপ্রাপ্তা স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার অধিকার যখন স্বামীর অবশিষ্ট থাকে না তখন তার ইদ্দত তিন হায়েযের পরিবর্তে এক হায়েয হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা তিন হায়েয পর্যন্ত ইদ্দত বাড়ানোর তাৎপর্য হলো এই সময়ের মধ্যে স্ত্রী ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে স্বামীকে ভালো করে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ দেয়া। স্ত্রী বিচ্ছেদের উপর স্বামী লজ্জিত কিংবা অনুতপ্ত হলে সে যেনো সহজে তাকে ইদ্দতের মধ্যেই ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়। কিন্তু খোলার ব্যাপারে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার যখন আদৌ নেই তখন সেক্ষেত্রে তিন হায়েয ইদ্দত হওয়ার প্রয়োজনই বা কি? স্ত্রী গর্ভবতী কিনা তা জানার জন্যে এক হায়েয দরকার। কেননা এক হায়েয অতিবাহিত হলেই বুঝা যায় স্ত্রী গর্ভবতী কিনা। সুতরাং দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে তাকে এক হায়েয অপেক্ষা করাই যথেষ্ঠ। তিন হায়েয নয়। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) এ দলিলই পেশ করেছেন। আর তাঁর সুযোগ্য শাগরিদ হাফেজ ইবনে কাইয়্যেম তা উল্লেখ করেছেনঃ

وذهب الى هذا المذهب الامام احمد فى رواية عنه
اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية وقال من نظر الى هذا
المذهب وجده مقتضى قواعد الشريعة ـ فان العدة
انما جعلت ثلث حيض ليطول زمن الرجعة و يتروى
الزوج ويتمكن من الرجعة فى مدة العدة فالمقصود مجرد
براءة رحمها من الحمل وذالك يكفى فيه حيضة واحدة
كالاستبراء ـ اه (زاد المعاد ج ٤ ص ١٣٥)

এক বর্ণনা অনুযায়ী এই মত ইমাম আহমদের যা ইবনে তাইমিয়াও গ্রহণ করেছেন। আর এ প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেনঃ বস্তুত এই মতটি ইনসাফের দৃষ্টিতেও শরীয়ত সম্মত। কারণ, তিন হায়েয ইদ্দত হওয়ার তাৎপর্য হলো, স্বামী এই দীর্ঘ [1] সময়ে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে

১. এতে কেউ এই আপত্তি করতে পারবে না যে, একই সাথে তিন তালাকের মধ্যে কারণ

www.pathagar.com

চিন্তা করার যেন সুযোগ পায় এবং এই সময়ের মধ্যে সম্ভব হলে ফিরিয়ে নিতে সক্ষম হওয়া। আর খোলায় ইদ্দত পালন করার উদ্দেশ্য হলো গর্ভধারণ সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এই উদ্দেশ্য একটি মাত্র হায়েযেই সাধিত হয়। যেমন ইসতেবরার অবস্থায় হয়ে থাকে।

(যাদুল মাআদ, ৪র্থ খন্ড, ৫১ পৃষ্ঠা)

এসব আকলী ও নকলী দলীলের ভিত্তিতেই সম্ভবত ইমাম ইসহাক বলেছেন وان ذهب الى هذا ذاهب فهو مذهب قوى-اه (এই মত পোষণকারীই অধিকতর জোড়ালো মাযহাবের অনুসারী ।) এ পর্যায়ে কোন্ দলীল দুর্বল আর কোন্‌টি সবল পর্যালোচনার মাধ্যমে সেটা পাঠকদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

দলীল সমূহের পর্যালোচনামূলক আলোচনা

এ মাসআলার ব্যাপারে কার্যত আমরা নিজেরা জমহুর সাহাবী এবং অধিকাংশ আলেমদের মতের অনুসারী। সে মত হলো খোলাপ্রাপ্তা স্ত্রী দ্বিতীয় বিবাহ করতে চাইলে তাকে তিন হায়েয পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তবে সত্য কথা হলো—এই মত প্রমাণ করার জন্য যে দলীল পেশ করা হয়েছে তা মনের স্বস্তির কারণ নয়। বরং জমহুর এবং তাদের ফয়সালার উপর আমাদের মনের সান্ত্বনা লাভের কারণ একদিকে তাদের অধিকাংশের উপর স্বাভাবিক নির্ভরতা, অপরদিকে তাদের মতামতের মধ্যে বিরাজমান প্রাপ্ত সতর্কতা। কিন্তু তাদের মতামত প্রমাণ করার জন্যে যেসব দলীল পেশ করা হয়েছে সেসব দলীল দ্বারা আমাদের মনে সান্ত্বনা না আসার একাধিক কারণ রয়েছে। কারণগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

প্রথম কারণ

যে দলীলের উপর ভিত্তি করে জমহুরের মত প্রতিষ্ঠিত তাহলো—খোলা মূলত তালাক, ফসখ খোলা আলগা নয়। সুতরাং খোলাপ্রাপ্তা স্ত্রী একজন

না পাওয়া সত্ত্বেও ইদ্দতের সময় তিন হায়েয হয়ে থাকে। কাররণ, প্রথমত এটা শরঈ তালাক নয়, বরং বেধই। তিন হায়েয বা তহুর (পবিত্রতা সময়) পর্যন্ত বাড়ানো শরঈ ও সুন্নতি তালাকের জন্যে শরীয়তে সম্মতি রয়েছে। দ্বিতীয়ত হুকুমের কারণ এবং তত্ত্ব ও দর্শনের উপস্থিত মূল সত্ত্বার বেলায় গ্রহণযোগ্য প্রত্যেক শাখা-প্রশাখার জন্য নয়। (মুহাম্মদ ইউসুফ)

www.pathagar.com

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সমতুল্য হয়ে গেলো। আর তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত কুরআনের আলোকে তিন হায়েয, এর কম নয়। والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلثة قروء الاية অতএব, খোলা প্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দতও তিন হায়েয হওয়া উচিত। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে দলীলটি স্বস্তির সাথে গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণ প্রথমত বিষয়টির বুনিয়াদ অর্থাৎ খোলা তালাকই ফসখ নয় এ কথাটি এখনো নিশ্চিতভাবে গৃহীত হয়নি। বরং প্রথম যুগ থেকে পরবর্তী যুগের ফকীহগণ পর্যন্ত বিতর্করূপে প্রচলিত আছে যে, বিষয়টি তালাক নাকি ফসখ একথা আজও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়নি। কেননা একদিকে কোনো কোনো ইমাম ও মুজতাহিদ এটাকে তালাক আখ্যায়িত করেছেন অপরদিকে অন্যান্য ইমামগণের মতে এটা তালাক নয় ফসখ। একইভাবে পরবর্তী যুগের বহু আলেম খোলা ফসখের অর্থে প্রাধান্য দেন। অপরদিকে অন্যান্য আলেমদের অনেকেই তালাক অর্থে প্রাধান্য দেন।

সাহাবীদের আসারেও পারস্পরিক যথেষ্ট মতবিরোধ পাওয়া যায় যা শরীয়তে অভিজ্ঞ লোকদের সকলেরই জানা। বিষয়টি যখন স্বতই বিতর্কিত তখন এর উপরোক্ত আয়াতের অন্তর্গত হওয়াও নিশ্চিত নয়। অনুরূপ বিষয়টি অন্যান্য বিতর্কিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বুনিয়াদ কিংবা দলীলও হতে পারে না। সুতরাং খোলাকে অকাট্যভাবে তালাকের পর্যায়ে কিরূপে গণ্য করা যায়। উপরন্তু এ কথাই বা কি করে বলা যায় যে, স্ত্রীলোকটি والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلثة قروء আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তার ইদ্দত সাধারণ তালাক প্রাপ্তা নারীর ন্যায় তিন হায়েযের কম হবে না।

দ্বিতীয় কারণ

'খোলা' ফসখ নয়–তালাকই একথা কিছুক্ষণের জন্যে মেনে নিলেও খোলাপ্রাপ্তা স্ত্রীর জন্য সাধারণভাবে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ন্যায় তিন হায়েয ইদ্দত পালন করা অপরিহার্য নয় এবং والمطلقات يتربصن আয়াতের অন্তর্ভূক্ত হওয়াও অনিবার্য নয়। কেননা, খোলাপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক তালাকপ্রাপ্তা নারীর মতো হওয়া সত্ত্বেও সম্ভবত উল্লেখিত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নাও হতে পারে। অন্যান্য অনেক তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর মতো এই স্ত্রী লোকটি ইদ্দতের সাধারণ নির্দেশের বহির্ভূত হতে পারে। এই সামষ্টিক কথাটা বুঝার জন্য নিম্নোক্ত তফসীল স্মরণ রাখা দরকার।

www.pathagar.com

সুতরাং এর ব্যখ্যা হল উল্লেখিত আয়াতে مُطَلَّقٰتٌ (তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকগণ) শব্দটি কোনো বিশেষ ধরনের তালাকের সাথে সম্পৃক্ত নয়। বরং সাধারণভাবে তালাকের ইদ্দত তিন হায়েযের কথা বলা হয়েছে। অথচ দেখা যায় এমন অনেক তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী আছে যাদের ইদ্দত মূলত হয় পালনই করতে হয় না, অথবা থাকলে সে ইদ্দত হায়েয নয়। কিংবা হায়েয হলেও তার পরিমাণ তিন নয়।

এ ধরনের মেয়েদের তালিকা নিম্নরূপঃ

একঃ যাদের সাথে স্বামী মিলিত হয়নি

যেসব স্ত্রীর সাথে স্বামীর সহবাস হয়নি এবং একান্তবাসেরও সুযোগ হয়নি। এমতাবস্থায় স্ত্রীলোকটিকে তালাক দিলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তার কোনো ইদ্দত পালন করতে হবে না। এই মেয়েটি তালাকপ্রাপ্তা হওয়া সত্ত্বেও সর্বসম্মতিক্রমে والمطلقات আয়াতের অন্তর্ভূক্ত নয় এরূপ তালাকপ্রাপ্তাদের জন্য বরং নির্দেশ হলোঃ

فما لكم عليهن من عدة تعتدونها

"ইদ্দতকে বিধান হিসেবে পালন করার জন্য তোমরা তাদের ওপর এটা চাপিয়ে দিতে পার না।"

দুইঃ না বালেগ স্ত্রী

যেসব মেয়ে এখনো বালেগ হয়নি। আর বালেগ না হওয়ার দরুন এখনো ঋতুস্রাব শুরু হয়নি। এমন মেয়েদের তালাক হলে সে তালাকপ্রাপ্তা হওয়া সত্ত্বেও ইদ্দত হিসেবে হায়েয পালন করার কোনো প্রশ্নই উঠে না।

তিন ঃ পূর্ণ বয়স্কা স্ত্রীলোক

অধিক বয়সে পৌছে যাওয়া এবং বার্ধক্য এসে যাওয়ার কারণে যেসব মেয়ের হায়েয হওয়ার আশা সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়ে গেছে। তাদের উভয়ের ইদ্দত একই ধরণের। অর্থাৎ তারা ইদ্দত পালন করবে মাস হিসেবে তিন মাস। তিন মাস গত হয়ে গেলে এদের ইদ্দতও পুরা হয়ে যাবে। তাদের সম্পর্কে এরশাদ হলোঃ

وَالّٰئِىْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ

www.pathagar.com

ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَّالّٰٓـِٔىْ لَمْ يَحِضْنَ - (الطلاق)

তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে থেকে যাদের হায়েয হওয়ার আর কোনো আশা নেই তাদের সম্পর্কে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে তাদেরকে তিনমাস ইদ্দত পালন করতে হবে। আর যাদের এখনো হায়েয শুরু হয়নি (তাদের কেও মাস গুনতি তিন মাস ইদ্দত পালন করতে হবে)।

চারঃ গর্ভবতী স্ত্রী

গর্ভাবস্থায় তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকগণের ইদ্দত হায়েয নয় বরং সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত সময়ই তাদের জন্য ইদ্দতের সময় সীমা। তাদের সম্পর্কে আল্লাহর বাণী হলোঃ

واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن - الخ

"গর্ভবতী স্ত্রীর ইদ্দত হলো গর্ভ খালাস হওয়া।" (সূরা তালাক)

পাঁচ : বাঁদী বা ক্রীতদাসী স্ত্রী

যেসব মেয়েরা স্বাধীন নয় বরং অন্যের মালিকানায় থাকার দরুন ক্রীতদাসী বা পরাধীন নারী নামে অভিহিত। তারা মনীব কর্তৃক তালাকপ্রাপ্তা হলে তাদের ইদ্দত হায়েয হিসেবে গণনা হলেও পরিমাণ কিন্তু তিন নয়, বরং দুই। তাদের সম্পর্কে রসূলের বাণী হলো- طلاق الامة ثنتان وعدتها حيضتان "তালাকপ্রাপ্তা বাঁদী বা ক্রীতদাসীর তালাক দুইটি এবং ইদ্দতও দুই হায়েয।" (আবু দাউদ, তিরমিজী)

উপরোক্ত পাঁচ ধরনের মেয়েলোক তালাকপ্রাপ্তা হওয়া সত্ত্বেও সর্বসম্মতিক্রমে তারা "والمطلقات" আয়াতের সাধারণ হুকুমের অন্তর্গত নয়। তাদের সম্পর্কে ভিন্ন আয়াত ও হাদীস থাকার কারণে তারা তালাকের ইদ্দত পালনের সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত হওয়া স্বীকৃত ও গৃহীত। তাদের ইদ্দতও তিন হায়েয নয়। বলাবাহুল্য এদেরকেও সংশ্লিষ্ট আয়াতের হুকুমের আওতা বহির্ভূত স্বীকার করা হয়েছে। এমতাবস্থায় খোলাপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে যেসব হাদীস এসেছে সেগুলোর উপর ভিত্তি করে সাবিত বিন কয়সের স্ত্রী এবং রুবাইয়্যা বিনতে মুআওয়াযের খোলার ঘটনার ন্যায়

www.pathagar.com

তাদেরকেও আয়াতের সাধারণ হুকুম থেকে বহির্ভূত হিসেবে গ্রহণ করলে তাতে ক্ষতি কি? উপরোক্ত তালাকপ্রাপ্তা নারীদের যেরূপ আয়াতের ব্যাপক হুকুম থেকে খারিজ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

তৃতীয় কারণ

খোলাপ্রাপ্তা স্ত্রীকে আয়াতের সাধারণ হুকুমের অন্তর্গত মেনে নিয়ে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ন্যায় তার ইদ্দত তিন হায়েয ধার্য করা হলে সাবিত বিন কয়েসের স্ত্রীর খোলা সম্পর্কিত হাদীসটি বিনা কারণে পরিত্যক্ত হওয়া অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। অথচ হাদীসটি অনিবার্যরূপে পরিত্যাগ করার কোনো সংগত কারণ নেই। ইমাম তিরমিযী এটাকে হাসান বলেছেন। আবূ দাউদ মৌনতার ভূমিকা পালন করেছেন। আর দার কুৎনী বলেছেন, اسناده صحيح হাদীসটির সনদ সহীহ (যাদুল মা'আদ ৪র্থ খন্ড ৪৮ পৃষ্ঠা)

খোলাপ্রাপ্তা স্ত্রীকে তালাকপ্রাপ্তার পর্যায়ে এনে একটি সহীহ হাদীসকে অকারণে ছেড়ে দেয়ার প্রয়োজনটাই কি? খোলা, তালাক হওয়ার বিষয়টি যেক্ষেত্রে আজও বিতর্কিত? তাই বিষয়টাকে এভাবে ব্যাখ্যা করা হোক না কেন যে, উপরোক্ত হাদীসের ভিত্তিতে কোনো কোনো তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ন্যায় খোলাকারিণী স্ত্রীও আয়াতের ব্যাপক অর্থ থেকে খারিজ সাব্যস্ত হবে এবং তার ইদ্দত এক হায়েযই ধার্যকৃত ও শরীয়ত নির্ধারিত বলে গণ্য হবে।

যেসকল হযরতগণ খোলাপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে مطلقات তালাকপ্রাপ্তাদের সাধারণ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করে তাদের ইদ্দত তিন হায়েয সাব্যস্ত করতে চান তাদেরকে একটা বাস্তব অসুবিধার সম্মুখীন এই হতে হবে যে, তারা বিনা কারণে একটি সহীহ হাদীস ত্যাগ করতে বাধ্য হবেন। যার সমর্থনে তাদের হাতে সংগত কোনো প্রমাণ নেই। এমতাবস্থায় হাদীসের সাথে সংগতিপূর্ণ নয় এর এমন ব্যাখ্যা দেয়া ছাড়া এই মুসকিল থেকে রক্ষা পাওয়ার দ্বিতীয় কোনো কৌশল থাকবে না।

হাদীসটির একটি ব্যাখ্যা

যেমন বলা যায়, فامرها ان تعتد حيضة হাদীসে যে حيضة শব্দের উল্লেখ হয়েছে তাতে হায়েয জাতীয় جنس উদ্দেশ্য এক হায়েয উদ্দেশ্য নয়। কেননা حيض শব্দের শেষে تاء অক্ষরটি জিনস তথা জাতীয় অর্থবোধক।

www.pathagar.com

সুতরাং হাদীসের অর্থ দাড়ালো–হায়েয জাতীয় বিষয় দিয়ে তোমার ইদ্দত পালন করতে হবে। جنس طهر ঋতুস্রাব সময় অথবা جنس شهور মাস জাতীয় সময় দ্বারা ইদ্দত পালন করা যাবে না। এ ধরনের ব্যাখ্যা আমাদের হানাফী মাযহাবের কোনো কোনো কিতাবে বর্ণিত আছে।

ব্যাখ্যাটি সহীহ নয়

আমাদের মতে এটি একটি অর্থহীন ব্যাখ্যা। নিম্ন বর্ণিত কারণে আমরা এ ব্যাখ্যা সঠিক মনে করতে পারি না। বরং আমাদের বিশ্বাস, হাদীসে ব্যবহৃত শব্দের এরূপ ব্যাখ্যা করার কোনো অবকাশ নেই। এবং নবী আলাইহিস্ সালামের উদ্দেশ্য আদৌ এটা নয়। কারণগুলো এইঃ

প্রথম কারণ

আরবী পরিভাষায় অভিজ্ঞ, আরবী ভাষার অর্থ এবং প্রয়োগ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞাত এবং নবীর বাণী চিরন্তনীর অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে গোটা উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী সচেতন ও সজাগ হলো তাঁর সরাসরি সান্নিধ্যপ্রাপ্ত একমাত্র ছাত্রগণ যাঁরা মুসলিম বিশ্বে সাহাবায়ে কিরাম নামে খ্যাত। তাঁরা কুরআন ও হাদীসের প্রথম সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ। নবীর এ সকল সম্মাণিত সাহাবী কেবলমাত্র সে ভাষার লোক ছিলেন না বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ ও তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে তারা ছিলেন সর্বাগ্রে ও শীর্ষ স্থানে। বিশেষত যেসব শব্দ ও বাক্য শরঈ আহকাম এবং দ্বীনী মাসআলা শিক্ষার ক্ষেত্রে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বলেছেন, তাঁদের সামনে পেশ করেছেন সেগুলোর অর্থ ও তাৎপর্য তাদের কাছে অস্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন থাকা অসম্ভব। এ ধরনের শব্দাবলী ব্যবহারের উদ্দেশ্য হলো শরয়ী আহকাম ও দ্বীনী শিক্ষা দেয়া যাতে করে রসূলের উদ্দেশ্যানুযায়ী আমল করা যায়। আর আমলের জন্যে সর্ব প্রথম প্রয়োজন হলো শব্দাবলীর অর্থ ও তাৎপর্য জ্ঞাত হওয়া। এটা ছাড়া আমল করা আদৌ সম্ভাব নয়।

সাবিত বিন কয়েসের স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে নবীর উক্ত এ বানী ان تعتد بحيضة। শরঈ হুকুম এবং দ্বীনী মাসআলার একটি শিক্ষা যা বাস্তবায়িত করে দ্বীনের উদ্দেশ্য পুরা করাই লক্ষ্য। মাসআলাটির সাথে অনেক শরঈ আহকাম সম্পৃক্ত

www.pathagar.com

হওয়ার কারণে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। এ জন্য সাবিত বিন কয়েসের স্ত্রী অবশ্যই প্রথমে হুজুরের উদ্দেশ্য জ্ঞাত হয়েই হুকুম পালনার্থে সে মোতাবিক কাজ করতে চেষ্টা করে থাকবেন।

অতএব হাদীসে বর্ণিত حيضة শব্দ দ্বারা যদি রসূলের এক হায়েয উদ্দেশ্য না হয় বরং তিন হায়েয হয় যেমন ব্যাখ্যাকারী হযরতগণের ধারণা– তাহলে সাবিত বিন কয়েসের স্ত্রী দ্বিতীয় বিবাহের জন্যে তিন হায়েয পর্যন্ত অবশ্যই ইদ্দত পালন করে থাকবেন। এবং সাধারণ সাহাবীগণও হাদীসের এই তাৎপর্যই বুঝে থাকবেন। অথচ সাবিত বিন কয়েসের স্ত্রী দ্বিতীয় বিবাহের জন্যে তিন হায়েয ইদ্দত পালন করেছেন– এমন কথা কোনো যয়ীফ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত নয়। সাধারণ সাহাবীগণও হাদীসের এ অর্থই নিয়েছেন এমন দাবীও করা সম্ভব নয়। বরং বিপরীতে সাহাবীগণ সম্পর্কে একথার প্রমাণ আছে যে, তাঁরা حيضة শব্দ দ্বারা এক হায়েযই বুঝিয়েছেন। রুবাইয়া বিনতি মুআওয়াযের খোলার ব্যাপারে ওবাইদাহ বিন ওলীদের রেওয়ায়েতটি একথার দলীল। রেওয়ায়েতটিতে এক হায়েয ইদ্দত পালনের কথা বলা হয়েছে। এমনকি রুবাইয়া নিজে হযরত ওসমান সম্পর্কে বললেনঃ

وانما يتبع فى ذالك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
فى مريم المغالية كانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه اه-

(অর্থাৎ হযরত ওসমান (রাঃ) এ ব্যাপারে রসূলুল্লার (সাঃ) ফয়সালারই অনুসরণ করেছেন মাত্র। সাবিত বিন কয়েসের স্ত্রী মরিয়ম মুগালিয়া যখন স্বামীর কাছ থেকে খোলা হাসিল করেছিল।) এতে প্রতীয়মাণ হয় যে, حيضة শব্দ দ্বারা সাধারণ সাহাবীগণ একটিমাত্র হায়েয বুঝেছেন; একের অধিক নয়। تاء তা জাতিবাচক হওয়ার যে ব্যাখ্যা দেয়া হয় তা ঠিক নয়।

দ্বিতীয় কারণ

ব্যাখ্যাটি অর্থহীন ও অশুদ্ধ হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হলো–ব্যাখ্যাকারীর উদ্দেশ্য তো শুধু এটাই যে, তাকে রক্ষক স্বীকার করা হলে কুরআনের আয়াতের (والمطلقات يتربصن) সাথে হাদীসের সামঞ্জস্যশীল অর্থ করার অবকাশ থাকে। অর্থাৎ, তিন হায়েয যা আয়াতেও উল্লেখ আছে। অথচ

www.pathagar.com

ব্যাখ্যার ছত্রছায়ায় হাদীসটির অর্থ তিন হায়েয ধরা হলে সেটা একটি পরিপূর্ণ ইদ্দতের রূপ লাভ করে। এরূপ হলে কতিপয় সূত্রে বর্ণিত রসূলের হাদীসটি অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। হাদীসটি হলো- لا عدة عليها الا ان تعتد حيضة (অর্থাৎ এক হায়েযের অতিরিক্ত তার উপর অপর কোন ইদ্দতই নাই।) কেননা, তিন হায়েয ইদ্দত সাব্যস্ত করলে খোলাপ্রাপ্তা স্ত্রীর জন্য তিন হায়েযের পরিপূর্ণ ইদ্দত পালন করা অপরিহার্য হবে। এমতাবস্থায় لا عدة عليها এর তাৎপর্য কি হবে? সুতরাং حيضة এর তা সমষ্টির জন্য নয় বরং এককের জন্য ধরতে হবে। অন্যথায় হাদীসের মধ্যে স্ববিরোধিতা অনিবার্যরূপে দেখা দিবে।

তৃতীয় কারণ

উপরন্তু حيضة শব্দটির সাথে واحدة (এক) শব্দসহ রেওয়ায়েতেরও উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। মাসায়ীতে আছে-

فامرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتربص
حيضة واحدة وتلحق باهلها -

"হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সাবিত বিন কয়েসের স্ত্রী রুবাইয়্যাকে দ্বিতীয় বিবাহের জন্য) এক হায়েয অপেক্ষা করার নির্দেশ দেন এবং এরপর আত্মীয় স্বজনের কাছে যাওয়ার অনুমতি দেন।"

এখন حيضة শব্দের 'তা'কে جنس মনে করে ব্যাখ্যাকারীগণ যদি তিন হায়েয হওয়া অপরিহার্য মনে করেন তাহলে حيضة واحدة তথা এক হায়েয হওয়ার সূত্রগুলির মধ্যে অযথা পরস্পর বৈপরিত্য দেখা দেয়। কেননা ব্যাখ্যাকারীগণের উক্তি ব্যাকরণগত দৃষ্টিভংগীতে আর হাদীসে রয়েছে واحدة (একক) শব্দের সুস্পষ্ট ঘোষণা যা যুক্তির মানদন্ডে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সুতরাং মানতেই হবে যে, حيضة এর تاء (তা) বর্ণটি সামগ্রিক নয় একক অর্থবোধক।

উপরোক্ত তিনটি কারণে আমরা ব্যাখ্যাদানকারীদের ব্যাখ্যাকে সঠিক ও যথার্থ মনে করতে পারি না। এ কারণে অধিকাংশের মতের সাথে একমত হওয়াও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। মোটকথা খোলাপ্রাপ্তা স্ত্রীর জন্য তিন হায়েয ইদ্দত গণ্য করা হলে নাসাঈ বর্ণিত হাদীসকে অকারণে বর্জন করতে

www.pathagar.com

হবে। পক্ষান্তরে তাকে আয়াতের সাধারণ হুকুমের বহির্ভূত মনে করা হলে কুরআন ও হাদীসের হুকুম স্বস্থানে প্রয়োগ করতে কোনো অসুবিধা থাকে না।

আলোচনার সারমর্ম

উপরোক্ত আলোচনা এবং মাসআলার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার আলোকে যেসব বিষয় অবগত হওয়া গেল সেগুলোর সারসংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

(ক) খোলাপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকদের ইদ্দতের মাসআলা সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরাম এবং চার ইমামের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশের মতে তাদের ইদ্দত তালাকপ্রাপ্তাদের মতো তিন হায়েয। অপর একটি নির্ভরযোগ্য ছোট দলের মতে তাদের ইদ্দত এক হায়েযের অতিরিক্ত নয়।

(খ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফয়সালা মতে খোলাপ্রাপ্তার ইদ্দত এক হায়েয; এরচেয়ে বেশী নয়। কেননা, এটা আসলে কোনো স্বতন্ত্র ইদ্দত নয়, বরং স্ত্রীলোকটি সন্তান সম্ভাব্য নয় দ্বিতীয় বিবাহের প্রাককালে একথাটি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়াই এই সময়সীমা নির্ধারণ করার মূল উদ্দেশ্য। এক হায়েয দ্বারাই এই উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে যায়। সুতরাং অতিরিক্তের প্রয়োজন নেই।

(গ) খোলার এক হায়েয ইদ্দত হওয়ার স্বপক্ষে সাহাবীগণের মধ্যে হযরত ওসমান, ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, রুবাইয়্যা বিনতে মুআওয়ায় এবং তাঁর চাচা (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণ। মযহাবী ইমামদের মধ্যে ইমাম ইসহাক, এক বর্ণনা মতে আহমদ বিন হাম্বলও এ মতের সমর্থক।

(ঘ) দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে তাদের মতই অধিকতর জোরালো সাব্যস্ত হয়। ইমাম ইসহাকের কথায় এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ইমাম তিরমিযী তাঁর জামে তিরমিযীতে এর উল্লেখ করেছেন। ইবনে তাইমিয়া এবং কাইয়্যেমও এ মতের সমর্থক।

(ঙ) খোলার ক্ষেত্রে স্ত্রীকে ফিরায়ে নেয়ার অবকাশ নেই। তবে স্বামী-স্ত্রী উভয় দ্বিতীয়বার বিবাহ নবায়ন করতে ইচ্ছা করলে করতে পারে। এই অধিকার তার আছে। তবে উভয়ের সন্তুষ্টি থাকা শর্ত।

www.pathagar.com

মাওলানা মওদূদীর ব্যাখ্যাসমূহ

খোলা মাসআলা সম্পর্কে মাওলানা মওদূদীর (র) ব্যাখ্যাসমূহের প্রতি ইঙ্গিতবাহী নিম্নোক্ত বিশ্লেষণ লক্ষণীয়ঃ

(ক) খোলা অবস্থায় যে তালাক হয় তা রিজঈ নয় বরং 'বায়িন'। যেহেতু মেয়েলোকটি অর্থ বা সম্পদের বিনিময়ে তালাক যেনো খরিদ করে নিলো। সুতরাং এই তালাক থেকে তাকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার স্বামীর অবশিষ্ট থাকে না। তবে এই মেয়ে ও পুরুষ যদি একে অপরের প্রতি রাজী হয়ে যায় এবং দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধন প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাহলে এরূপ করা তাদের উভয়ের জন্যে জায়েয।"

(খ) খোলার ইদ্দত মাত্র এক হায়েয। আসলে এটা ইদ্দতই নয়। বরং গর্ভধারণ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্যই এরূপ নির্দেশ এসেছে যাতে করে দ্বিতীয় বিয়ের সময় তার গর্ভধারণ না হওয়ার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।[১]

একথার ওপর জনৈক সুধী মাওলানাকে নিম্নোক্ত প্রশ্ন পাঠিয়ে দেন।

প্রশ্ন

"আপনি এই মাসালার সনদ লিখেননি (যে, খোলার ইদ্দত এক হায়েয নির্ধারিত) অথচ আপনার মন্তব্য আয়াতের তাৎপর্য, গবেষকদের উক্তি এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথার পরিপন্থী।

যথাঃ

ا۔ فی الفتح روی عبد الرزاق مرفوعا الخلع تطليقة

(১) আবদুর রাজ্জাক সূত্রে ফতহুল বারীতে মরফূ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, খোলা মূলত তালাক।"

---

১. এই বাক্য দ্বারা সন্দেহ হতে পারতো যে, খোলার ইদ্দত এক হায়েয হওয়া সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। সুতরাং মাওলানা মওদূদী সম্পূর্ণ বাক্য বাদ দিয়ে তদস্থলে তাফহীমুল কুরআনের ১ম খন্ডের ১৭৬ পৃষ্ঠায় পরিবর্তিত বাক্যে লিখেনঃ জমহুরের মতে তালাকের মতই খোলার ইদ্দত। তবে আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থে এমন কতিপয় রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে যাতে প্রতীয়মান হয় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খোলার ইদ্দত মাত্র এক হায়েযের কথা বলেছেন এবং তদানুযায়ী হযরত ওসমান (রা) একটি ঘটনার ফয়সালাও করেছেন। (ইবনে কাসীর ১ম খন্ড ২৭৬ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

(২) وروى الدارقطنى وابن عدى انه جعل النبى صلعم الخلع تطليقة

(২) দারকুতনী ও ইবনে আদী বর্ণনা করেছেন–মহানবী (সাঃ) খোলাকে তালাক হিসেবে গণ্য করেছেন।"

(৩) وروى مالك عن ابن عمر عدة المختلعة عدة المطلقة-

(৩) ইবনে ওমর সূত্রে মালেক বর্ণনা করেছেন, ইবনে ওমরের মতে খোলা গ্রহীতার ইদ্দত তালাকপ্রাপ্তার অনুরূপ।"

অবশ্য আবূ দাউদের একক রেওয়ায়েত আছে عدتها حيضة (অর্থাৎ, খোলা গ্রহীতার ইদ্দত এক হায়েয মাত্র।) কিন্তু তার এ বর্ণনা রাবীদের হস্তক্ষেপ দোষে দোষণীয় হিসাবে গণ্য। অধিকন্তু والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلثة قروء 'নস' এ কুরআনীরও পরিপন্থী। মেহেরবানী করে আয়াত, হাদীসসমূহ এবং মুহাদ্দিসগণের মন্তব্য সমূহের মধ্যে যথাযথ সামঞ্জস্য বজায় রেখে নির্ভরযোগ্য কিতাবের উধৃতিসহ প্রমাণভিত্তিক জবাব দান করুন যাতে করে নিশ্চিত হওয়া যায়।

এ প্রশ্নের জবাবে মাওলানা (র) লিখেছেন–

জবাব

খোলা গ্রহীতা নারীর ইদ্দত প্রসংগটি মূলত বিতর্কিত। ফকীহদের বৃহত্তর অংশ এ জাতীয় মহিলাকে তালাকপ্রাপ্তা মহিলার মতোই গণ্য করেন। আবার একটি নির্ভরযোগ্য অংশ এটাকে একটিমাত্র হায়েযের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তাদের এ মতের সপক্ষে কতিপয় হাদীসও রয়েছে। নাসাঈ ও তিবরানী রুবাইয়্যা বিনতে মুআওয়াযের এই হাদীসটির উল্লেখ করেছেন যে, নবী আলাইহিস সালাম সাবিত বিন কয়েসের স্ত্রীর খোলার ঘটনায় নির্দেশ দিয়েছিলেন– ان تتربص حيضة واحدة وتلحق باهلها (অর্থাৎ, সে এক হায়েয ইদ্দত পালন করবে, অতপর আত্মীয় স্বজনের নিকট চলে যাবে।) আবূ দাউদ এবং তিরমিজী ইবনে আব্বাসের (রা) এই হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সাবিত বিন কয়েসের স্ত্রীকেই হুকুম করেছিলেন ان تعتد بحيضة (অর্থাৎ, সে মাত্র এক হায়েয ইদ্দত পালন করবে।)

www.pathagar.com

অধিকন্তু তিরমিযী, নাসাঈ এবং ইবনে মাজা রুবাইয়্যা বিনতে মুআওয়াযের অনুরূপ মর্মের অপর এক রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছে। ইবনে আবূ শাইবাহ (র) ইবনে ওমরের (রাঃ) উধৃতি দিয়ে হযরত ওসমানের (রাঃ) অনুরূপ এক ফয়সালার কথাও উল্লেখ করেছেন এবং সাথে একথাও লিখেছেন যে, ইবনে ওমর (রাঃ) প্রথম প্রথম খোলা গ্রহীতার জন্য তিন হায়েয ইদ্দতের সমর্থক ছিলেন। হযরত ওসমানের (রাঃ) এরূপ ফয়সালার পর তিনি স্বমত পরিবর্তন করে এক হায়েয হওয়ার পক্ষে রায় দিতে থাকেন। তদ্রূপ ইবনে আবূ শাইবাহ (র) ইবনে আব্বাসের (রা) একই মর্মের ফত্ওয়া উল্লেখ করেন- عدتها حيضة (অর্থাৎ, তার ইদ্দত একমাস) ইবনে মাজা (র) রুবাইয়্যা বিনতে মুআওয়াযের উধৃতিসহ হযরত ওসমানের (রাঃ) উপরোল্লেখিত ফয়সালার যে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন তাতে হযরত ওসমানের (রাঃ) একথাটিও বর্ণিত আছে-

انما اتبع فى ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

(অর্থাৎ, হযরত ওসমান (রাঃ) তাঁর এ রায়ে রসূলুল্লাহর (সাঃ) ফায়সালারই অনুসরণ করেছেন) আশা করি এসব উধৃতিতে আপনি আশ্বস্ত হতে পারবেন। (তর্জুমানুল কুরআন, ২৭ খন্ড সঃ ১,২ মুহাররম, সফর- ১৩৭৬ হিঃ)

এই কি ইনসাফের দাবী?

খোলা গ্রহীতা মহিলার ইদ্দত সম্পর্কে মাওলানার (র) পেশকৃত এই সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপকার্থ বোধক জবাব সামনে রাখলে আমরা বুঝতে পারছি না যে, এটাকে কোন ন্যায় পরায়ণ আলেম ভুল বলার ধৃষ্টতা দেখাতে পারে না। কেননা, রেওয়ায়েত ও আসারের ভিত্তিতে খোলা গ্রহীতা মহিলার ইদ্দত এক হায়েয হওয়াই অধিকতর জোরালো মত বলে প্রতীয়মান হয়। সাহাবায়ে কিরামের এক জামায়াত এবং চার ইমামের মধ্য হতে এক রেওয়ায়েতানুযায়ী ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এবং ইমাম ইসহাক এই মতের সমর্থক। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) এবং তাঁর যোগ্যতম শাগরিদ ইবনে কাইয়্যেমও এই মত পোষণ করতেন। সহীহ হাদীস এবং আসারে সাহাবাও একথার সমর্থন করছেন। এসব দলীলের ভিত্তিতেই ইমাম ইসহাক এই মতটিকে সঠিক ও জোরালো বলেছেন।

www.pathagar.com

সাহাবীদের একটি জামায়াত, মযহাবী ইমামদের কোনো কোনো ইমাম এবং আলেমদের একটি বিশিষ্ট অংশ যে রায় গ্রহণ করেছেন সে রায়ের অনুরূপ রায় পোষণ করার অপরাধে মাওলানা মওদূদীকে (র) গোমরাহ কিংবা ভুল বলা কি ইনসাফের দাবী হতে পারে? গোমরাহীর ফত্ওয়াদাতা সেসব বুযর্গ ও আলেমদের কাছে আমাদের প্রশ্ন "খোলা গ্রহীতা মহিলার ইদ্দত এক হায়েয তার বেশী নয়" শত শত বছর পূর্বে এ আকীদা পোষণকারী সাহাবী এবং আলেমগণ কি আপনাদের আবেগ তাড়িত এই ফতওয়ার নির্মম আঘাতের শিকার হচ্ছেন না? আপনারা কি তাদেরকেও গোমরাহ বা বিভ্রান্ত বলার ধৃষ্ঠতা দেখাতে আগ্রহী? জবাব যদি না বোধক হয়, তাহলে আপনাদের কাছে তাদেরকে বাঁচানোর কোন কোন কৌশল আর কি কি উপায় রয়েছে? আপনারা তো দলীলের ভিত্তিতে সাহাবীদের মন্তব্যসমূহের মধ্য হতে একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেয়ার অর্থে সমালোচনা করাকে না জায়েয মনে করেন, অথচ সেই আপনারাই পরোক্ষ ভাষায় ও তাদেরকে গোমরাহ কিংবা বিপথগামী আখ্যামূলক ফত্ওয়াবাজীকে কেবল মাত্র জায়েয নয়; বরং দ্বীনের মহান খেদমতও মনে করে থাকেন।

ভুল এবং বিভ্রান্তি নিরুপনের একটি ভ্রমাত্মক মাপকাঠি

আসলে মুশকিল হলো, আজকাল ভুল নির্ভুল, গোমরাহী, হেদায়াত, পাপাচার ও পথভ্রষ্ঠতার এমন একটি ভুল মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয়েছে যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক এমন ব্যক্তি ফাসেক, গোমরাহ এবং বিভ্রান্ত বলে সাব্যস্ত হতে পারে, যে শরীয়তের স্বীকৃত বিধানের পরিবর্তে এমন কোনো দলের স্বীকৃত বিধানের খেলাফ দ্বীনের কোনো ব্যাপারে মত প্রকাশ করে, যে দল জনগণের মধ্যে ধর্মীয় স্বীকৃতি ও পৌরহিতের মর্যাদা লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। প্রসংগটা যদিও খুঁটিনাটি ও শাখাগত হোক আর অপ্রিয় অভিমতটি যতই প্রামাণ্য দলীল এবং শরঈ বিধানের ভিত্তিতেই পেশ করা হোক না কেন?

অথচ এটা এতো বড় ভ্রান্ত নীতি যে, সেটা প্রমান করার জন্য দলীলের প্রয়োজন নেই। হক ও বাতিল, ঠিক বেঠিকের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার সুস্পষ্ট পন্থাও কখনো এরূপ হতে পারে না। বরং এই মাপকাঠিতে হক-নাহক, সহীহ ও ফাসেদ উভয়ের মধ্যে অনেক সময় এমন ধরনের সংমিশ্রণ ঘটে যায়, যাতে ভালো-মন্দের পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

www.pathagar.com

আমাদের বিশ্বাস-এমন প্রত্যেক আকীদা, কথা ও কাজ গোমরাহী ও বিভ্রান্তিকর যা কুরআন দ্বারা সমর্থিত নয়। নবীর সুন্নত, সাহাবায়ে কিরাম ও সলফে সালেহীনের কাজেও যার সমর্থন নেই। এখন কথা হলো দ্বীনের ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে যেগুলো সম্পর্কে আগেকার আলেম ও বুযর্গগণ পরস্পরে মতপার্থক্য করেছেন। দলীলের ভিত্তিতে এসব মত পার্থক্য বিষয়াবলীর একাধিক মতের কোনো একটি মতের সাথে একমত হওয়া সম্পূর্ণ জায়েয আবার দলীলের ভিত্তিতে দ্বিতম পোষণ করাও জায়েয। এরূপ মত পোষণকারীদের কাউকে গোমরাহ, পথভ্রষ্ঠ বলা যাবে না। এ ধরনের মতৈক্য কিংবা মত পার্থক্য করার দরুন কোনো আলেমকে গালমন্দ কিংবা অপবাদের লক্ষ্যস্থল বানানো সঙ্গত নয়।

যারা একটি বিশেষ ফিকহী মত কিংবা কোনো দলের বিশেষ নীতির সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ভিত্তিতে ফিকাহের ভিন্নমত পোষণকারীদেরকে গোমরাহ হওয়ার ফতওয়া বাজী করে তারা প্রকৃতপক্ষে বিগত সময়ের এরূপ মত পোষণকারী সকল বুযর্গ ও আলেমদেরকেই গোমরাহ বলার ঘৃণিত ধৃষ্ঠতা দেখাচ্ছে। আর এ তৎপরতা এতো হীন ও অপ্রীতিকর যে, এর কারণে আগেকার উম্মত ধ্বংস হয়ে গেছে। আর এরূপ তৎপরতার কারণে বর্তমান মুসলিম জাতির মধ্যে অনৈক্য ও কাঁদা ছোড়াছুড়ির এমন এক দ্বারের উন্মোচন হয়েছে যা আজ পর্যন্ত বন্ধ হয়নি এবং ভবিষ্যতেও বন্ধ হওয়ার আশা নেই।

দ্বিতীয় কথা

খোলা গ্রহীতা স্ত্রীর ইদ্দত মাত্র এক হায়েয এর বেশী নয়—মাওলানা মওদূদীর এতদসংক্রান্ত অভিমতকে কেন্দ্র করেই উপরোক্ত আলোচনা পেশ করা হয়েছে। স্ত্রী স্বামীর অরাজীতে কোর্টের মাধ্যমে খোলা গ্রহণ করার ব্যাপারে শরীয়ত স্ত্রীকে অধিকার দিয়েছে কি দেয়নি? এ নিয়েই আমাদের নিম্নের আলোচনা। অধিকন্তু হাদীস ও প্রথম যুগের আলেমদের উক্তি সমূহের আলোকে একথার তত্ত্ব ও মৌলিকত্ব কি তাও আমরা আলোকপাত করতে ইচ্ছা রাখি।

শরীয়ত মেয়েদেরকে খোলার অধিকার দিয়েছে কি?

সমকালীন বুযর্গানেদ্বীনের মতে খোলার ব্যাপারে মাওলানা মওদূদী (র) আরো একটি ভুলের শিকার হয়েছেন। সে ভুলটি হলো, মাওলানার (র) মতে

www.pathagar.com

স্ত্রী স্বামীর ন্যায় খোলা হাসিল করার অধিকারীনী। শরীয়তের দৃষ্টিতে স্বামীর অ-রাজীতেও আদালতের মাধ্যমে স্ত্রী এ অধিকার পেতে পারে।

এই মাসআলা সম্পর্কেও আলেমগণ জনগণের মধ্যে মাওলানা মওদূদীর (র) বিরুদ্ধে এক বিতংস প্রোপাগাণ্ডা শুরু করেছেন। তারা এমন একটি অভিযান চালু করেন যা দেখে একজন অজ্ঞ লোকের মনে মযহাব সম্পর্কে অনীহা সৃষ্টি হতে পারে। কেননা আজ এ সকল হযরতগণ দ্বীন ও মযহাবের পতাকাবাহীরূপে সমাজে পরিচিত। তাদের মধ্যে দ্বীনের প্রাথমিক দাবী মেনে চলার দৈন্যতা দেখা দিলে এবং আল্লাহর বিধান ও তাদের দ্বারা এভাবে পদদলিত হতে থাকলে জন সাধারণ যা ইচ্ছা তা করতে কুণ্ঠিত হবে কোন্ কারণে?

এভাবে যারা আমাদের বাস্তব জীবনের মুকুরে ইসলামকে দর্শন করার প্রয়াসী তাদের মনে ইসলাম সম্পর্কে আমাদের এরূপ ঘৃণ্য তৎপরতার নিরিখে কি ধারণার সৃষ্টি হবে? অতএব, বুযর্গানে দ্বীনের খেদমতে আমাদের সনির্বন্ধ আরজ, মাওলানা মওদূদী (র) সাহেবের বিরোধিতা করা যদি আপনাদের একান্ত কামনা ও বাসনা হয়ে থাকে, তাহলে এ কাজ আপনারা আপন মনে চালিয়ে যান এবং স্বচ্ছন্দে বিরোধিতা করতে থাকুন। তবে বিরোধিতা করার জন্যে এমন পন্থা অবলম্বন করা থেকে দয়া করে বিরত থাকা উচিত যাতে ইসলামের অপূরণীয় ক্ষতির আশংকা বিদ্যমান।

মূল বক্তব্যে প্রত্যাবর্তন

মাওলানা মওদূদী (র) রচিত 'স্বামী স্ত্রীর অধিকার' গ্রন্থে যেসব কথা ও বাক্য আপত্তিকর ও অভিযোগপূর্ণ মনে করা হয়েছে আলোচনায় কেবলমাত্র সেগুলোর উল্লেখ করা যদিও মূল লক্ষ্য, তথাপি মাওলানা (র) সাহেবএই গ্রন্থে খোলা সম্পর্কে নিজ গবেষণা পর্যায়ে যা কিছু লিখেছেন চিন্তার খোরাক হিসেবে তাও পেশ করা হলো। কেননা তাঁর খোলা সম্পর্কিত চিন্তাধারা একটি তাত্ত্বিক ও যুক্তিগ্রাহ্য গবেষণা যা একজন অভিজ্ঞ আলেমে দ্বীনের আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতা এবং আইনানুগ পারদর্শিতার ফলশ্রুতি বৈ কি? সুতরাং মাওলানা মওদূদী সাহেব (র) এ বিষয়ে যা কিছু লিখেছেন তা স্ববিস্তারে 'স্বামী স্ত্রীর অধিকার' গ্রন্থ থেকে নিম্নে আলোচনা করা আমরা কেবল যথার্থই মনে করি না; বরং জরুরী মনে করি। সাথে সাথে আমরা ফকীহ ও মযহাবের

www.pathagar.com

ইমামদের তাত্ত্বিক গবেষণার নিরিখে গুরুত্বপূর্ণ অংশসমূহ টীকা টিপ্পনীর আকারে পর্যালোচনাও করবো। তাতে একথা জানা যাবে যে, বিষয়টির শরঈ মর্যাদা নিরুপন করার জন্যে মাওলানার (র) এই তাত্ত্বিক চিন্তাধারা একটি আরশি বিশেষ। এবং মাওলানা (র) এই লেখায় যা কিছু পেশ করেছেন মুসলিম জগতের ফকীহদের ব্যাখ্যার সাথে তার হুবহু মিল রয়েছে। পরন্তু সে উদ্দেশ্যও পরিষ্কার হয়ে যাবে যার ব্যাখ্যা করা এখানে উদ্দেশ্য। এতে আলোচনা দীর্ঘ হলেও এর উপকারিতা এই যে, যারা কতিপয় হযরতের ভুল ও বিকৃত প্রোপাগান্ডায় বিভ্রান্ত কিংবা পোপাগান্ডায় লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে নিষ্পাপ মনে করে তাদের প্রচারিত ও রটনাকে আপোষ ও নির্ভুল মনে করে প্রতারণার জালে ফেঁসে গেছে। অধিকন্তু এরূপ বিশদ বিবরণ ও দীর্ঘ আলোচনায় বিষয়বস্তুর মূল উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে তারা অবগত হওয়ার সুযোগ পাবে। নিম্নে মূল বিষয়বস্তু গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ্যণীয়।

খোলা সম্পর্কে মাওলানা মওদূদীর (র) ব্যাখ্যা সমূহ

স্বামী স্ত্রীর অধিকার নিরূপণে মাওলানা (র) তাঁর রচিত "স্বামী স্ত্রীর অধিকার" حقوق الزوجين গ্রন্থে বলেছেনঃ

"যে স্ত্রী স্বামীর অপসন্দনীয় এবং যার সাথে বনিবনা হওয়া আদৌ সম্ভবপর নয় তাকে তালাক দেয়ার অধিকার যেমনি ইসলামী বিধান মতে স্বীকৃত, তদ্রুপ যে স্বামী স্ত্রীর অপসন্দনীয় এবং যার সাথে ঘর সংসার [১] করা কিছুতেই সম্ভব নয়, তার কাছ থেকে স্ত্রীর খোলা লাভ করাও ইসলামী বিধানে সমর্থিত। এ ক্ষেত্রে শরঈ আহকামের দু'টি দিক রয়েছে। একটি চরিত্রগত, অপরটি আইনগত। চরিত্রগত দিক থেকে স্বামী হোক কিংবা স্ত্রী প্রত্যেকেই খোলা কিংবা তালাকের অধিকার শুধুমাত্র একটি শেষ উপায় হিসেবে প্রয়োগ ও গ্রহণ করা উচিত। যৌন লালসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তালাক এবং খোলাকে খেল তামাশা বানানো বিবেক সম্মত হতে পারে না। এ

১. এই কথা এবং আসন্ন বাক্যাবলী ও হাদীস সমূহ একধারেই প্রতিধ্বনি যে, মাওলানার মতে স্ত্রীর জন্য খোলার অধিকার কেবলমাত্র তখনই স্বীকৃত হবে যখন স্বামীর সাথে বৈবাহিক বা সংসার জীবন যাপন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। অন্যথায় এ অধিকার স্বীকৃত নয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, এরূপ সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার পরও কোন কোন আলেম ও মুত্তাকী পরিচয় ব্যক্তিত্ব বলে বেড়ায়, মাওলানা মওদূদী (র) সর্বাবস্থায় স্ত্রীকে খোলা করার অধিকার দিয়ে থাকেন।

www.pathagar.com

সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ ان الله لا يحب الذواقين والذواقات "আল্লাহ তায়ালা যৌন কামনায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত নারী পুরুষদেরকে পসন্দ করেন না।

لعن الله كل مطلاق ذواق "যৌন বিলাসী, প্রত্যেক তালাকদানকারীর উপর আল্লাহ অভিশাপ দেন"

ايما امرأة اختلعت من زوجها بغير نشوز فعليها لعنة الله

والملئكة والناس اجمعين

যে স্ত্রী তার স্বামীর অত্যাচার ব্যতিরেকে খোলা গ্রহণ করে তার উপর আল্লাহ ফিরিশতা ও সব মানুষের লা'নত। المختلعات هن المنافقات "খোলাকে খেল–তামাশা রূপে গ্রহণকারী মেয়েরা মুনাফেক।"

কিন্তু আইন। যার কাজ হলো ব্যক্তির অধিকার নিরূপণ করা। সে চারিত্রিক ও নৈতিক এদিক নিয়ে আলোচনা করে না। আইন যেভাবে স্বামীকে তালাক দেয়ার অধিকার দিয়েছে, তদ্রুপ স্ত্রীকে খোলা করার অধিকার দিয়েছে। যাতে করে উভয়ই প্রয়োজন বোধে বিবাহ বন্ধনের রজ্জু থেকে নিজকে মুক্ত করতে পারে। এবং স্বামী–স্ত্রীর কেউ যেনো এমন অস্বস্তিকর অবস্থার মুখোমুখী না হয় যাতে মনে ঘৃণা–বিদ্বেষ জন্ম নেয় এবং বিবাহের উদ্দেশ্য ব্যহত হয়ে বিবাহিত জীবন একটি দুর্বিসহ জীবনে পর্যবসিত হয়। অথচ এই দুর্বিসহ জীবন থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোনো উপায় নেই বলে একে অপরের সাথে যবরদস্তীভাবে সহঅবস্থান করতে বাধ্য হয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো—স্বামী–স্ত্রীর যে কেউ তাদের অধিকারকে অপব্যবহার ও স্বেচ্ছাচারমূলক প্রয়োগে অগ্রসর হলে আইন আপনগতিতে সম্ভাব্য ও যুক্তির ভিত্তিতে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কিন্তু অধিকার যথাযথভাবে প্রয়োগ করার রূপরেখা নির্ধারণ করা নির্ভর করে অনেকটা প্রয়োগকারীর সৎবিবেচনা, সততা ও আল্লাহভীতির উপর। যৌন স্বেচ্ছাচারিতা মিটানো অথবা অধিকার প্রয়োগ করার সত্যিকার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা এ ফয়সালা আল্লাহ এবং অধিকারের মালীক ব্যতীত আর কেউ করতে পারে না। আইন তাকে তার মৌলিক অধিকার প্রদান করার পর সে অধিকার অযথা প্রয়োগ করা থেকে বিরত রাখার জন্যে তার উপর শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে। সূতরাং তালাকের আলোচনায় আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন, স্বামীকে তালাক দেয়ার অধিকার প্রদানের সাথে

www.pathagar.com

কতগুলো শর্ত বেঁধে দেয়া হয়েছে। যেমন, স্ত্রীকে প্রদত্ত মোহর ফিরিয়ে না নেয়া, হায়েয অবস্থায় তালাক না দেয়া, তিন তহুরে এক একটি তালাক দেয়া, ইদ্দত পালন কালীন সময়ে স্ত্রীকে নিজের কাছে রাখা, তিন তালাক হয়ে যাওয়ার পর তাহলীল (স্ত্রীর অন্য স্বামীর ঘর সংসার করার পর স্বাভাবিক তালাকপ্রাপ্তা হয়ে ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর পুনরায় পূর্ব স্বামীর সাথে নূতন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া) ব্যতীত তাকে বিবাহ না করা ইত্যাদি। এমনিভাবে খোলার ক্ষেত্রেও স্ত্রীর উপর কতিপয় শর্ত আরোপ করা হয়েছে। শর্তগুলো কুরআনের নিম্নোক্ত সংক্ষিপ্ত আয়াতে সুবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে।

ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان
يخافا ان لا يقيما حدود الله فان خفتم ان لا يقيما حدود
الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به - (البقره)

"স্ত্রীদেরকে তোমরা যা কিছু দিয়েছো তা ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য হালাল নয়। তবে এটা স্বতন্ত্র কথা যে, স্বামী-স্ত্রী যদি আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না বলে আশংকা করে আর এহেন অবস্থায় তোমরাও যদি আশংকা কর যে, তারা উভয়ে আল্লাহ নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করতে পারবেনা, তাহলে স্ত্রীর কিছু বিনিময় দিয়ে তার স্বামী থেকে বিচ্ছেদ লাভ করায় কোনো গুনাহ নেই।"

এই আয়াত দ্বারা নিম্ন বর্ণিত আহকাম উদ্ভাবিত হয়ঃ

একঃ আল্লাহর দেয়া সীমারেখা লংঘন হওয়ার আশংকা দেখা দিলে কেবলমাত্র তখনই খোলা করা উচিত। فلا جناح عليهما আয়াতাংশ একথারই প্রতিধ্বনি যে, খোলা তালাকের মতো একটি খারাপ বিষয় হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর সীমা রক্ষা না হওয়ার শংকিত সময়ে তা খারাপ নয়।

দুইঃ স্ত্রী বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চাইলে স্বামীর তালাক অধিকার স্বেচ্ছায় প্রয়োগ করার সময় তাকে যেভাবে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় সেভাবে স্ত্রীকেও আর্থিক ক্ষতি সহ্য করতে হবে। স্বামী নিজে তালাক দিলে স্ত্রীকে দেয়া মোহর থেকে কিছুই ফেরত পাবে না।[১] আর স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হওয়ার

১. স্ত্রী সহবাসের পর তালাক দিলে এই হুকুম প্রযোজ্য। স্ত্রী সহবাসের আগে তালাক দিলে নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক ফেরত নিতে পারবে। যথাঃ-

www.pathagar.com

ইচ্ছা পোষণ করলে সে স্বামী থেকে গৃহীত সব অর্থ কিংবা অংশ বিশেষ ফেরৎ দিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে।[২]

তিনঃ ইফতিদার (অর্থাৎ বিনিময়ের মাধ্যমে মুক্তি লাভ করা) জন্য শুধুমাত্র ফিদইয়া দানকারীর ইচ্ছাই যথেষ্ট নয়। বরং ফিদইয়া গ্রহণকারীর সন্তুষ্টি থাকলে তবেই এ প্রসংগটি পরিপূর্ণ হতে পারে। অর্থাৎ স্ত্রী শুধু একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মাল পেশ করে স্বতঃই বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে না বরং পেশকৃত মাল স্বামীর গ্রহণোপযোগী হওয়াও জরুরী।

চারঃ খোলার জন্য কেবলমাত্র এতোটুকু পরিমাণ মাল যথেষ্ট যে, স্ত্রী তার সমুদয় মোহর কিংবা কিছু অংশ পেশ করে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দাবী করবে আর স্বামী তা কবুল করে তালাক দিয়ে দিবে। فلا جناح عليهما فيما افتدت به এই আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উভয় পক্ষের সন্তুষ্টিতে খোলা পূর্ণ হয়ে যায়। খোলা হওয়ার জন্যেও বিচারকের রায় থাকাকে যারা শর্ত বলে ভ্রম করেন উপরোক্ত আয়াত তাদের রায় খন্ডিত হওয়ার বাস্তব প্রমাণ।[৩]

وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم (البقرة)

স্ত্রী সহবাসের পর তালাক দিলে কিছুই ফেরত নিতে পারবে না।

وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا

اتاخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض (البقرة)

(২) ১ ও ২ নং যে যে হুকুমের কথা বলা হয়েছে তা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। এসব হুকুম সুস্পষ্ট। এখানে গোপন বা অস্পষ্ট হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। এসব হুকুম মুহূর্তের জন্যেও কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। সুতরাং এগুলো পর্যালোচনা নিস্প্রয়োজন (মুহাম্মদ ইউসুফ)

(৩) বিচারকের রায় বাকী খোলার জন্য শর্ত হওয়ার কথা যারা বলেন তাদের মধ্যে হাসান বসরী মুহাম্মদ বিন সিরীন এবং আবু ওবাইদ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ইবনে হাজর (র) ইমাম বুখারীর (র) শিরোনামের আওতায় লিখেছেন।

واشار المصنف الى الخلاف فى ذالك اخرجه سعيد بن منصور

....عن الحسن البصرى قال لا يجوز الخلع دون السلطان وقال

حماد بن زيد عن محمد بن سيرين مثل ذالك واختاره ابو عبيد اه

লেখক এই ব্যাপারে খেলাফের দিকে ইংগীত করেছেন। সাঈদ বিন মনসুর হাসান বসরী (র) থেকে এবং হাম্মান বিন যায়েদ (র) মুহম্মদ বিন সিরীন থেকে বর্ণনা করে বলেছেন। খোলা রাষ্ট্রপতি এবং বিচারকের সম্মতি ছাড়া জায়েব নেই। আবু ওবাইদও এই মত গ্রহণ করেছেন।

www.pathagar.com

পাঁচঃ যদি স্ত্রী ফিদইয়া পেশ করে এবং স্বামী তা গ্রহণ না করে, তাহলে خفتم আয়াতাংশ যাদেরকে সম্বোধন করেছে অর্থাৎ মুসলমান নেতৃবৃন্দ তাদের দিকে ফিরে যেতে হবে। আর যেহেতু নেতৃবৃন্দ আল্লার শাস্তি বিধান রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। সুতরাং এই বিধান লংঘিত হওয়ার আশংকা দেখা দিলে স্ত্রীদেরকে আল্লাহর শাস্তি বিধান রক্ষাকল্পে যতোটুকু অধিকার দেয়া হয়েছে তা প্রদান করার ব্যবস্থা করা নেতৃবৃন্দের উপর জরুরী হবে।

এই হলো সংক্ষিপ্ত আহকাম। আল্লাহর শাস্তি বিধান কোন্ কোন্ অবস্থায় লংঘিত হওয়ার আশংকা আছে তা বিস্তারিতভাবে এখানে বলা হয়নি। ফিদইয়া নিরূপণ করতে ইনসাফ কি? যদি স্ত্রী ফিদইয়া দিতে আগ্রহী হয় কিন্তু স্বামী

উপরোক্ত মত প্রমাণ করার জন্যে তারা যে আয়াত এবং দলীল পেশ করেছেন সেগুলো হাফেজ ইবনে হাজর (র) উল্লেখ করেছেন।

واستدل بقوله تعالى فان خفتم ان لا يقيما حدود الله - وبقوله
تعالى وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من
اهلها - قال فجعل الخوف لغير الزوجين ولم يقل فان خافا -
قال والمراد الولاة - ورده الطحاوي بانه شاذ مخالف لما عليه الجمهور
والحجم الغفير - ومن حيث النظر ان الطلاق جائز دون الحاكم فكذا
الخلع - ثم الذي ذهب اليه مبني على ان وجود الشقاق شرط في الخلع
والجمهور على خلافه واجابوا عن الآية بانها جرت على الغالب

فان خفتم ان لا يقيما حدود الله এবং فان خفتم شقاق بينهما

আয়াত দু'টি দ্বারা তারা এভাবে প্রমাণ করেছেন যে, خوف ভয় বা আশংকা স্বামী–স্ত্রীর পরিবর্তে সরকার এবং বিচারকের পক্ষ থেকে করেছেন যাতে প্রতীয়মান হয় যে, খোলার জন্য তাদের যে শর্ত এবং তাদের অনুমতি ও হুমুক থাকা শর্ত। তবে ইমাম তাহাভী (র) একথা রদ করে বলেছেন, এ উক্তি বিরল এবং জমহুরদের মতের খেলাফ। কারণ তালাক বিচারকের বিনানুমতিতে জায়েয হলে খোলা ও জায়েয হওয়া উচিত। পরন্তু তাদের এই মত একথার উপর নির্ভরশীল যে, খোলার মধ্যে স্বামী –স্ত্রীর উভয়ের পারস্পরিক মতানৈক্য থাকা শর্ত। অথচ একথা জমহুর সমর্থিত নয়। আয়াতের জবাব হলো এখানে অধিকাংশের ওপর নির্ভর করে شقاق কথার উল্লেখ করা হয়েছে আর আয়াত নাযিল হয়েছে সাধারন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। মুহাম্মদ ইউসুফ

www.pathagar.com

তা গ্রহণ করতে রাজী না হয় এমতাবস্থায় বিচারকের কি পন্থা অবলম্বন করা উচিত? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সামনে আগত খোলার মোকদ্দমা সমূহের ঘটনায় আমরা এসব সমস্যার বিস্তারিত বিবরণ জানতে পারি।

খোলার ক্ষেত্রে প্রথম যুগের উদাহরণ সমূহ

এ পর্যায়ে সাবিত বিন কয়েসের ঘটনা খোলার ক্ষেত্রে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য। দু'জন স্ত্রী তার থেকে খোলা হাসিল করে। এই ঘটনার বিবরণের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে। এগুলো একত্রিত করে দেখলে জানা যায়, সাবিতের কাছ থেকে তাঁর দু'জন স্ত্রী খোলা গ্রহণ করে ছিল। একজন হলো জামীলাহ বিনতে ওবাই বিন সলূল (আবদুল্লাহ বিন ওবাইয়ের বোন)। সাবিতের (রা) চেহারা এই মহিলার অপসন্দনীয় ছিল। সে রসূলের কাছে নিম্নোক্ত ভাষায় অভিযোগ দায়ের করেঃ

(১) یارسول الله لا یجمع راسی وراسه شیئ ابدًا۔ انی رفعت جانب الخباء فرأیته اقبل فی عدة نفر فاذا هو اشدهم سوادًا واقصرهم قامة واقبحهم وجهًا۔ (ابن جریر)

(২) والله ما کرهت منه دینًا ولا خلقًا الا انی کرهت دمامته (ابن جریر)

(৩) والله لولا مخافة الله اذا دخل علی لبصقت فی وجهه (ابن جریر)

(৪) یارسول الله بی من الجمال ما تری وثابت رجل دمیم۔ (عبدالرزاق، بحواله فتح الباری)

(৫) وما اعتب علیه فی خلق ولا دین ولکنی اکره الکفر فی الاسلام۔ (بخاری)

(১) ইয়া রসূলুল্লাহ! আমার এবং তাঁর মাথা একত্রিত করার কোনোই বস্তু নেই। আমার ঘোমটা খুলতেই সামনে যে কয়েকটি লোকের সাথে তাকে

www.pathagar.com

আসতে দেখলাম। আমি দেখলাম, এই লোকটিই সবচে কৃষ্ণবর্ণ, সবচেয়ে নীচু, সবচেয়ে বদসুরত। (ইবনে জরীর)

(২) আল্লাহর কসম! আমি তার দ্বীনদারী এবং নৈতিকতার কারণে তাকে অপসন্দ করছি না। আমার অপসন্দের কারণ তার কুৎসিত চেহারা। (ইবনে জরীর)

(৩) আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহর ভয় না হতো তাহলে সে যখন আমার কাছে আসছিল তখনই আমি তার মুখে থুথু নিক্ষেপ করতাম। (ইবনে জরীর)

(৪) ইয়া রসূলুল্লাহ! আমি সুন্দর চেহারার লাবন্যময়ী যুবতী যেমনটা আপনি দেখছেন আর সাবিত হলো একজন কুৎসিত লোক। (ফতহুল বারীসূত্রে আবদুর রাজ্জাক)

(৫) তাঁর দ্বীন ও চরিত্র সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। তবে ইসলামে আমার কুফরের ভয় হচ্ছে। (বুখারী)

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার এসব অভিযোগ শ্রবণ করে বললেনঃ أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ "তোমাকে সে যে বাগিচা দান করেছিল তাকি তুমি তাকে ফিরায়ে দিবে?" জামিলাহ্ বললোঃ হ্যাঁ ইয়া রসূলুল্লাহ! বরং সে চাইলে আরো বেশী দিতে প্রস্তুত। হুজুর বললেনঃ

أما الزيادة فلا ولكن حديقته "বেশীর প্রয়োজন নেই। কেবল তার বাগান ফিরিয়ে দাও।" তারপর সাবিতকে (রা) নির্দেশ দিলেনঃ اقبل الحديقة وطلقها تطليقة "বাগান ফিরায়ে নাও এবং তাকে এক তালাক দিয়ে দাও।"

সাবিত বিন কয়েসের (রাঃ) হাবীবাহ বিনতে সহল আনসারীয়া নামে অপর একজন স্ত্রী ছিল। ইমাম মালেক এবং আবূ দাউদ (রা) তার ঘটনা এভাবে ব্যক্ত করেছেনঃ একদিন ভোরবেলা হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘর থেকে বের হতেই হাবীবাহকে (রা) দন্ডায়মান দেখতে পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? হাবীবাহ (রা) আরজ করলেনঃ لا أنا ولا ثابت بن قيس "আমার এবং সাবিত বিন কয়েসের মধ্যে বনিবনা হতে পারে না।"

সাবিত (রাঃ) উপস্থিত হলে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেনঃ এই হলো হাবীবাহ। আল্লাহর যা ইচ্ছা তা সে এখানে ব্যক্ত করবে।

www.pathagar.com

হাবীবাহ (রা) বললেনঃ সাবিত (র) আমাকে যা কিছু দান করেছেন তার সবগুলোই আমার কাছে আছে। হুজুর সাবিতকে (রা) হুকুম দিলেন, তুমি এগুলো ফেরত নিয়ে তাকে বিদায় করে দাও। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে-خل سبيلها আবার কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে- فارقها উভয়ের তাৎপর্য একই। অর্থাৎ "তাকে বিদায় করে দাও।" আবূ দাউদ (র) এবং ইবনে জারীর (রা) হযরত আয়েশা (রা) থেকে ঘটনাটি এভাবে ব্যক্ত করেছেন–সাবিত (রা) হাবীবাকে এমনভাবে মার দেন যে তাতে তার হাড় ভেংগে যায়। হাবীবাহ (রা) হুযুরের কাছে অভিযোগ করলে তিনি সাবিতকে (রা) হুকুম দিলেনঃ خذ بعض مالها وفارقها তার মালের এক অংশ গ্রহণ কর এবং তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও।"[১] কিন্তু ইবনে মাজা হাবীবার যে ভাষ্য বর্ণনা করেছেন তাতে প্রতীয়মাণ হয় যে, হাবীবাহ সাবিতের (র) বিরুদ্ধে যে অভিযোগ পেশ করেছিলেন তা মারপিটের নয় বরং সেটা ছিল তার কুৎসিত

---

১. মাওলানা মওদূদী এই ঘটনাকে সাবেতের (র) দ্বিতীয় স্ত্রী হাবীবা বিনতে কিন্তু মামা হাবীবার যে ভাষ্য বর্ণনা করেছে তাতে প্রতীয়মান হয় যে, হাবীবাহ সাবিতের (রা) বিরুদ্ধে যে অভিযোগ পেশ করেছিলন তা মারপিটের নয় বরং সেটা ছিল তার কুৎসিত চেহারার। সহলের ঘটনা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। দু'টি ঘটনার কথা সম্ভবতঃ এ কারণে বলা হয়েছে যে, সাবিত বিন কয়েস (র) থেকে তার স্ত্রীদের খোলা হাসিল করার ব্যাপারে যেসব রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে সেগুলো নিয়ে মুহাদ্দিসগণ মত পার্থক্য করেছেন। কারো মতে একজন স্ত্রী একবার মাত্র খোলা করেছেন। তবে একথাটা মুহাদ্দিসগণের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁদের গ্রহণযোগ্য কথা হলো দু'জন স্ত্রীর দু'বার খোলা গ্রহণ করা যা মাওলানা (র) উল্লেখ করেছেন। তারা হলেন জামিলাহ এবং হাবিবাহ্। হাফেজ ইবনে হাজর বলেছেনঃ

قال ابن عبد البر اختلف فى امرأة ثابت بن قيس فذكر ا
لبصريون انها جميلة بنت ابى وذكر المدنيون انها حبيبة
(قلت) والذى يظهر انهما قصتان وقعتا لامرأتين لاختلاف
السياقين وشهرة الخبرين وصحة الطريقين-اهـ فتح البارى (۹ص ۳۲۸)

"ইবনে আবদুল বার্রা বলেন, সাবিত বিন কয়েসের (র) স্ত্রীর ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। বসরী মুহাদ্দিসগণের মতে তিনি ছিলেন জামিলাহ আর মাদানী হাদীসবেত্তাদের মতে হাবীবাহ। (ইবনে হাজর বলেন) আমি বলি দু'টি ঘটনা দু'জন স্ত্রীর ব্যাপারে সংঘটিত হয়। কারণ উভয়ের সম্পর্ক ভিন্ন এবং দু'টি হাদীসই মশহুর এবং সূত্রও সহীহ।" (ফতহুলবারী, ৯ম খন্ড, ৩২৮ পৃঃ)

www.pathagar.com

চেহারার। জামিলাহ যে কথা বলেছেন বলে অন্যান্য হাসীসমূহে বর্ণিত আছে তিনিও (ইবনে মাজা) সে কথাই বলেছেন। অর্থাৎ আল্লাহভীতি না থাকলে সাবিতের মুখে আমি থুথু নিক্ষেপ করতাম।[১]

হযরত ওমরের (রাঃ) সামনে একজন স্ত্রী ও পুরুষের ঘটনা পেশ করা হয়। তিনি মেয়েটিকে স্বামীর সাথে সহাবস্থানের পরামর্শ দেন। মেয়ে তা গ্রহণ করলেন না। তাতে তিনি মেয়েটিকে একটি আবর্জনাময় প্রকোষ্ঠে বন্ধ করে রাখলেন। তিনদিন বন্দী থাকার পর তিনি তাকে বের করে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তুমি কেমন আছো? উত্তরে মেয়েলোকটি বললোঃ আল্লাহর কসম! এই তিন রাতই আমি কিছুটা শান্তিতে কাটিয়েছি। এ কথা শুনে ওমর (রাঃ) তার স্বামীকে হুকুম দিলেন اخلعها ويحك ولو من قرطها "তার কানের ঝুমকার বিনিময়ে হলেও তাকে খোলা দিয়ে দাও।" [কাশফুল গুম্মা, ২য় খন্ড]

রুবাইয়্যা বিনতে মুআওয়ায বিন আফরা তার স্বামী থেকে তার সমুদয় সম্পদের বিনিময়ে খোলা হাসিল করতে চাইলেন। স্বামী তাতে রাজী হলোনা।

---

১. অভিযোগের কারণ মারধর ছিলনা বরং তা ছিল চেহারা কুৎসিত হওয়ার। ইবনে হজরের মতেও এটাই গ্রহনীয় কারণ। তিনি লিখেছেন

وقع فى قصة حبيبة بنت سهل عند ابى داؤد انه ضربها فكسر
بعضها لكن لم تشكه بسبب ذالك بل وقع التصريح بسبب اخر
وهو انه كان دميم الخلقة ففى حديث عمرو بن شعيب عن
ابيه عن جده عند ابن ماجة كانت حبيبة بنت سهل عند
ثابت بن قيس وكان رجلا دميما فقالت والله لولا مخافة
الله لبصقت فى وجهه ـ اه (فتح البارى، ج ٩ ص ٣٢٨)

আবু দাউদে হাবীবার ঘটনা উল্লেখ হয়েছে সাবিত তাকে এমন ভাবে মার দেয় যে, তাতে তার শরীরের একটি হাড় ভেংগে যায়। কিন্তু অভিযোগের আসল কারণ এটা ছিল না। অন্যান্য রেওয়াতে এর অন্য কারণ বর্ণিত হয়েছে। সেটা হলো তার চেহারা কুৎসিত হওয়া। ইবনে মাজা বিন শোয়াইবের বর্ণানায় একথার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। হাবীবাহ সাবিত বিন কয়েসের স্ত্রী ছিল। সাবিত ছিল একজন কুৎসিত লোক। হাবীবাহ বলেনঃ আমার আল্লাহ ভীতি না থাকলে সে আমার কাছে আসতেই তার মুখে থু থু নিক্ষেপ করতাম। (ফতহুলবারী, ৯ম খন্ড, ৩৩২৮ পৃঃ)

www.pathagar.com

হযরত ওসমানের (রাঃ) কাছে এই ঘটনা পৌছলো। হযরত ওসমান (রাঃ) তাকে নির্দেশ দিলেন, তার চুলের ফিতা পর্যন্ত নিয়ে তাকে খোলা দিয়ে দাও–

فاجازه وامره باخذ عقاص راسها فما دونه .اه

(ফতহুলবারী সূত্রে ইবনে সা'দ ৯ম খন্ড, ৩২৬ পৃঃ)

খোলার আহকাম

উপরোক্ত রেওয়ায়েত সমূহের আলোকে নিম্নোক্ত হুকুমগুলোর অবতারণা হয়ঃ

একঃ فان خفتم الا يقيما حدود الله সাবিত বিন কয়েসের বিবিগণ যেসব অভিযোগ করেছেন বলে বর্ণিত আছে এই আয়াতের তাফসীর সেটাই। স্বামীর চেহারা কুৎসিত, সে তার পসন্দনীয় নয়—স্ত্রীর এতোটুকু অভিযোগই খোলার জন্যে যথেষ্ট বলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনে করতেন। নবী (সাঃ) কুশ্রী ও সুশ্রী হওয়ার দর্শন বা প্রকৃতি সম্পর্কে কোনো বক্তব্য পেশ করেননি। কারণ তাঁর দৃষ্টি ছিল শরীয়তের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি। স্ত্রীর মনে স্বামীর প্রতি অবজ্ঞা, ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যভাব যখন প্রতীয়মান হয়ে গেল তখন নবী (সাঃ) তাদের দরখাস্ত কবুল করলেন। কেননা মনের দিক থেকে ঘৃণা ও বিষন্নতাসহ স্বামী স্ত্রীর সহাবস্থানে বাধ্য করার পরিণতি দ্বীন, নৈতিকতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে তালাক ও খোলার চেয়ে অধিক ক্ষতিকর।[১] তাতে

১. ইহা এমন এক সত্য যাকে ঘটনা প্রবাহের আলোকে অস্বীকার করা যায় না আবার মিথ্যা বলেও উড়িয়ে দেয়া চলেনা। কেননা যখন স্ত্রীর অন্তরে স্বামীর পক্ষ থেকে এমন ঘৃণা ও অনীহার সৃষ্টি হয় যাতে কোনো অবস্থাতেই সহাবস্থান করতে স্ত্রী রাজী নয় এবং স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক বহাল রাখাও সম্ভব নয়, এমতাবস্থায় জৈবিক চাহিদা চরিতার্থ করার জন্য সে কি কোনো অবৈধ উপায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হবেনা? এর পরিণতি দ্বীন, নৈতিকতা ও কৃষ্টির জন্য তালাক ও খোলার চেয়ে কি অধিকতর বিপদজ্জনক বরং ধংসাত্মক প্রমানিত হবে না? আজকের দিনে যেসব জাতির মন–মানস বর্বরীয় ক্রোধে আচ্ছন্ন এবং অবৈধ জাতীয় মর্যাদার আবেগে আপ্লুত এবং যারা কোনো অবস্থাতেই তালাক কিংবা খোলার মাধ্যমে স্ত্রীদেরকে বৈধ স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়; বরং সেটাকে তারা নিজেদের মৃত্যুসম মনে করে থাকে। মৃত্যু ছাড়া মেয়েদের বিবাহ বন্ধন থেকে স্বাধীনতা লাভ করার কথা চিন্তাও করা যায় না। সেখানে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কে ফাটল দেখা দিলে মেয়েরা গোপনে পরপুরুষের সাথে সম্পর্ক তৈরী করে নেয়। তারপর ধর্ম, নৈতিকতা ও সংস্কৃতির জন্য এর যে পরিণতি বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হয়, জাতীয় জীবনের উত্থান—পতন এবং আভ্যন্তরীন অবস্থা সম্পর্কে সচেতন প্রত্যেকটি লোকই সে অবস্থা অবলীলাক্রমে দেখতে পারে। এমতাবস্থায় তালাক কিংবা খোলার

www.pathagar.com

শরীয়তের লক্ষ্য ও-উদ্দেশ্যাবলী ক্ষুণ্ন হওয়ার আশংকা থাকে। কাজেই, নবী আলাইহিস্ সালামের কাজে এ নীতিই উৎসারিত হয় যে, স্ত্রী তার স্বামীকে অতিশয় অপসন্দ করে এবং কিছুতেই তার সাথে সহাবস্থান করতে চায়না— শুধু একথা প্রমাণিত হওয়াই খোলার হুকুম প্রয়োগের জন্যে যথেষ্ট।

দুইঃ হযরত ওমরের (রা) কাজে প্রতীয়মান হয় যে, ঘৃণা ও অবজ্ঞা করার কারণ খোঁজ করা জরুরী নয়। আর একথাটি যুক্তিসংগতও বটে। কেননা স্বামীর প্রতি ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য সৃষ্টি হওয়ার এমনসব কারণ থাকতে পারে যেগুলো কারো সামনে বর্ণনা করা যায় না। আবার এমন সব কারণও থাকতে পারে যেগুলোকে শ্রবণকারীগণ বীতশ্রদ্ধার কারণ হিসেবে যথেষ্ট মনে করবে না অথচ এগুলো নিয়ে রাতদিন অহর্নিশ ঝগড়া চলতেই থাকে এবং অন্তরে ঘৃণা সৃষ্টির জন্যে যথেষ্ট হয়ে থাকে। কাজেই, স্ত্রীর মনে স্বামীর প্রতি অবজ্ঞা ও ঘৃণ্য কিনা শুধু এতোটুকু যাচাই করাই বিচারকের কাজ। স্ত্রী যে বর্ণনা দিয়েছে তা ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের জন্য যথেষ্ট কিনা সে ফায়সালা করা তার কাজ নয়।

তিনঃ হযরত ওমরের (রাঃ) কাজে এটাও জানা যায় যে, ঘৃণা ও অবজ্ঞার কারণ অনুসন্ধানের জন্যে শরঈ কাযী কোনো যথার্থ কৌশল অবলম্বন করতে পারে যাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ না থাকে এবং তাদের দাম্পত্য জীবন যাপন করার আশা তিরোহিত হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় হয়।

চারঃ বিচারক হিতোপদেশ দিয়ে স্বামীর সাথে দাম্পত্য জীবন যাপনে স্ত্রীকে রাজী করানোর চেষ্টা অবশ্যই করতে পারে। কিন্তু তবে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে বাধ্য করতে পারে না। কেননা আল্লার দেয়া খোলা হাসিল করার অধিকার তার রয়েছে। স্বামীর সাথে ঘর সংসার করলে আল্লাহর সীমা রক্ষিত না হওয়ার সন্দেহ যদি স্ত্রী প্রকাশ করে, তাহলে আল্লাহর সীমা রেখা ভেংগে হলেও এই স্বামীর ঘর সংসার করতেই হবে—এমন কথা বলার অধিকার কারো নেই। [১]

প্রক্রিয়ায় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর অনুমতি কি ঐসব হীনমন্য ও ঘৃণ্য প্রক্রিয়ার চেয়ে শ্রেয় নয়? এতে দ্বীন, চরিত্র এবং সভ্যতা-সংস্কৃতি সব ধরনের পতন থেকে রক্ষা পাবে। (মুহাম্মদ ইউসুফ)

১. ১ থেকে ৪ নং পর্যন্ত কথাগুলো হযরত ওমরের (রা) কাজ থেকে উৎসারিত। কারণ তিনি প্রথমত স্বামীর সাথে ঘর-সংসার করার উপদেশ দেন। অতপর ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে কৌশলস্বরূপ তাকে তিন দিন পর্যন্ত বন্দী করে রাখেন। এতোসব উপায় অবলম্বনের পরও ঘৃণা ও অবজ্ঞার কারণসমূহ কখনো জিজ্ঞাসা করেন নাই।

www.pathagar.com

পাঁচঃ স্ত্রীলোকটি বৈধ প্রয়োজনীয়তার জন্য খোলার আবেদন করছে নাকি নিছক জৈবিক চাহিদা চরিতার্থ করার অভিলাষে বিচ্ছিন্ন হতে চায় খোলার ক্ষেত্রে কাযীর জন্য এ ধরনের প্রশ্নের গবেষণা করা আদৌ প্রয়োজন নেই। [১] এ

---

১. এই পঞ্চম দফা নিয়ে কোনো কোনো ইলমী মহলে মহা হৈ চৈ পড়ে যায়। জায়গায় জায়গায় সভা-সম্মেলনে বক্তৃতা বিবৃতিতে বলা হয় মওদূদী মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছেন। দেখুন; তিনি বলছেন "স্ত্রী খোলার দাবী নিয়ে বিচারকের কাছে গেলে খোলা দাবী বৈধ প্রয়োজনীয়তার কারণে নাকি শুধুমাত্র মনের খাহেশ চরিতার্থ করা উদ্দেশ্য? এমন প্রশ্নের অবতারণা বিচারকের আদৌ ঠিক নয়।"

এ সকল হযরতগণের উচিত ছিল এরূপ মস্তবড় ফতওয়া এবং জোরালো দাবীর স্বপক্ষে তৎোধিক মজবুত এবং ওজনদার দলীল পেশ করা। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, দলীলের প্রসঙ্গ উঠলেই তারা দলীলের কাজটি করেন বড় জোর প্রোপাগান্ডা এবং উত্তেজনাকর কথাবার্তায়। জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়, ভাইসব! এখন তো তোমাদের এবং আমাদের স্ত্রীগণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কারণ আমরা সকলেই দুর্বল এবং অধিক বয়সের লোক। আমাদের মেয়েরা এবং স্ত্রীগণ যদি এ মাসআলা জ্ঞাত হয় যে, তারা আমাদের অসম্মতিতেও খোলা করতে পারে; তাহলে সকল স্ত্রীলোক আমাদেরকে পরিত্যাগ করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। পাঠান এবং মুসলমানগণ! তোমাদের আত্মমর্যাদা কখনো একথা সহ্য করতে পারে কি? এই হলো তাদের কিতাব ও সুন্নত থেকে উৎসারিত দলীলের শক্তি যদ্বারা মাওলানা মওদূদীকে (র) তারা গোমরাহ ও ভ্রান্ত প্রমাণ করার জন্যে পেশ করেছেন। বিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহে স্বপক্ষীয় দাবী প্রমাণ করতে এবং প্রতিপক্ষের দাবী নাকচ করতে এ ধরনের দলীলের অবতারনা করা কোনো আলেমের কাছ থেকে আশা করা যায় কি?

তাছাড়া যে সকল হযরত ইলমী দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিষয়ের উপর আলোচনা করেছেন তারা দলীলরূপে এই হাদীসটি অথবা সমার্থবোধক অন্যান্য হাদীসের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। হাদীসটি হলো-المختلعات هن المنافقات। তারা বলেন, এসব হাদীসে খোলাকে গুনাহ বরং নিকৃষ্টতম অপরাধ বলা হয়েছে। (অথচ) মাওলানা মওদূদী (র) বললেন, খোলা স্ত্রীর অধিকার; প্রাপককে তা দিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা শরঈ কাযীর কর্তব্য বা ওয়াজিব। কিন্তু হযরতগণ মাওলানা মওদূদীর (র) একথা বলার তাৎপর্যের প্রতি খেয়ালই করেননি। তিনি কি সর্বাবস্থায় খোলাকে স্ত্রীদের বৈধ অধিকার মনে করেন এবং কোনো অবস্থাতেই এটাকে গুনাহ মনে করেন না নাকি কোনো কোনো পরিস্থিতিতে এটাকে বৈধ অধিকার মনে করে তা প্রদান করা কাযীর জন্য ওয়াযিব সাব্যস্থ করেন অথবা অবস্থা ও পরিবেশের প্রেক্ষাপটে এটাকে গুনাহ এবং জায়েয ধারনা করেন? আমরা মাওলানার (র) কথা যতোটুকু বুঝতে পেরেছি তাহলো-খোলার দু'টি দিক আছে। একটি নৈতিক অপরটি আইনগত। শুধুমাত্র মনের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার উদ্দেশ্য প্রনোদিত অহেতুক খোলা নৈতিকতার দিক থেকে মাওলানাও (র) মারাত্মক অপরাধ এবং গুনাহ মনে করতেন। আলোচনার প্রথমে তিনি একথার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন এবং এতদসংক্রান্ত হাদীসগুলোরও উল্লেখ করেছেন। অবশ্য আইনগত দিক থেকে খোলা স্ত্রীদের জন্য

www.pathagar.com

কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং খোলাফায়ে রাশেদীন বিচারক হিসেবে যখন খোলার ঘটনা শুনতেন তখন তাঁরা এ প্রশ্ন এড়িয়ে যেতেন। কারণ, প্রথমত এ প্রশ্নের যথাযথ গবেষণা করা কোনো বিচারকের জন্যই সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত স্বামীকে প্রদত্ত 'তালাক' অধিকারের মুকাবিলায় স্ত্রীকে দেয়া হয়েছে 'খোলার' অধিকার। প্রবৃত্তির কামনা চরিতার্থ করার আশংকা সমভাবে রয়েছে উভয় ক্ষেত্রে। অথচ তালাকের ক্ষেত্রে যৌন ক্ষুধা না মিটানোর শর্ত আইনগতভাবে আরোপ করা হয়না। সুতরাং আইনানুগ অধিকারের দৃষ্টিতেও স্ত্রীকে দেয়া খোলার অধিকারকে কোনো নৈতিক গন্ডির মধ্যে শৃংখলিত করা উচিত নয়। তৃতীয়ত খোলার দাবীকারিনী স্ত্রীলোকটি দু'টি অবস্থার মুখোমুখী হয়ে থাকে। সত্যিই তার খোলা করার প্রয়োজন অথবা নিছক কামুকতা। প্রথম অবস্থার মুখোমুখী হলে তার খোলার দাবী প্রত্যাখাত হওয়া যুলমের নামান্তর। আর দ্বিতীয় অবস্থায় যদি তাকে খোলা না দেয়া হয় তাহলে শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ অনেক উদ্দেশ্য ব্যহত হতে বাধ্য। সুতরাং যে নারী স্বভাবতই যৌন বিলাসী সে তো তার এই সহজাত কামুকতা প্রশমিত করার জন্য কোনো না কোনো কৌশল অবলম্বন করতে থাকবেই। এমতাবস্থায় যদি আপনি তাকে বৈধ পন্থায় বিচ্ছিন্ন হওয়ার সুযোগ না দেন তাহলে সে তার স্বভাবগত চাহিদা অবৈধ পন্থায় পূরণ করবে। আর এটা হবে অধিকতর ক্ষতিকর। কোনো ব্যক্তির বৈধ স্ত্রী হওয়া অবস্থায় একবার মাত্র ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে একজন মেয়েলোকের পর্যায়ক্রমে পঞ্চাশজন স্বামী গ্রহণ করা তুলনামূলক হারে উত্তম। ১

পুরুষকে প্রদত্ত তালাকের অনুরূপ অধিকার। প্রয়োজনবোধে এই অধিকার আদায় করে দেয়া শরীয়তের কাযীর দায়িত্ব। তবে শর্ত হলো, বিচারকের একথা সুস্পষ্টভাবে জানা থাকতে হবে যে, আল্লাহর সীমা রক্ষা করে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন যাপন করা অসম্ভব এবং উভয়ের সহাবস্থানও কিছুতেই সম্ভবপর নয়। এমতাবস্থায় স্ত্রীকে তার অধিকার দিয়ে দেয়াই সংশ্লিষ্ট বিচারকের কর্তব্য যদিও খোলার দাবী জৈবিক স্বাদ আস্বাদন প্রনোদিত কিংবা সত্যিকার প্রয়োজনের দরুনই হয়। এর স্বপক্ষে মাওলানা (র) কতিপয় জোরালো ও অকাট্য দলীল পেশ করেছেন। কাজেই সমালোচক ও অভিযোগকারী ভদ্রলোকদের এরূপ হীন প্রোপাগান্ডার পরিবর্তে তাত্ত্বিক পর্যালোচনার মাধ্যমে একথা প্রমান করাই যথার্থ ছিল যে, যুক্তির দুর্বলতার কারণে মাওলানার (র) ভূমিকা দুর্বল এবং দাবী অযৌক্তিক। কিন্তু আমাদের জানা মতে আজ অবধি কেউ এরূপ সমালোচনা করেনি, এরূপ একটি কথাও বলেনি। শুধু গোমরাহ হওয়ার একক ফতওয়াবাজীই জারি রাখা হয়েছে। (মুহাম্মদ ইউসুফ)

১. বুযর্গগণ মাওলানা মওদূদীর (র) বিরুদ্ধে সাক্ষ্য স্বরূপ এবং তাঁর গোমরাহ হওয়ার

www.pathagar.com

ছয়ঃ যদি স্ত্রী খোলা দাবী করে এবং স্বামী তাতে রাজী না হয়, তাহলে বিচারক তাকে পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিবেন। সমস্ত রেওয়ায়েতে একথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং খুলাফায়ে

দলীলস্বরূপ গণ আদালতে যেসব বক্তব্য উপস্থিত করেন এই বক্তব্য তন্মধ্যেকার একটি। অথচ তাঁর বর্ণিত বক্তব্যে ঈমানের যে চরম পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হয়েছে তা কেবলমাত্র প্রশংসাহর্য্য নয় বরং ঈর্ষা করারও উপযোগী। কেননা পরিপূর্ণ ঈমানের অনিবার্য দাবী হলো, মুমিন প্রতিনিয়ত অশ্লীলতা ও প্রগলভতা থেকে থাকবে কঠোরভাবে বিচ্ছিন্ন ও বিমুখ। ঈমানের দাবীর মহব্বতে সে হবে আপ্লুত। মহব্বত এবং ঘৃণায় তার হৃদয় হবে এমনভাবে কানায় কানায় ভর্তি যে, সমাজে অশ্লীলতা ও পাপাচারের অস্তিত্ব তার জন্য হবে অসহনীয় এবং শরঈ আহকাম ও বিধানের প্রতি অনীহা ও বিতশ্রদ্ধার ধারণা মুহূর্তের জন্যও মন-মানসে স্থান দিতে রাজী নয়। অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার প্রতি চরম বিষগ্রতা এবং ঈমান ও তার চাহিদার জন্য পরিপূর্ণ প্রসন্নতা ঈমানের মস্তবড় দু'টি আলামত। এ দু'টি আলামত যার মধ্যে বিরাজমান সে লাভ করে আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত ও আলোর অমূল্য সম্পদ। সে পরিগণিত হয় তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বান্দাদের মধ্যে। তাকে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত ধারণা করা হয় না। এ ধরনের লোকদের সম্পর্কেই বলা হয়েছেঃ

ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه فى قلوبكم وكره اليكم

الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون (الحجرات)

"তবে আল্লাহ তোমাদেরকে ঈমানের মহব্বত দিয়েছেন এবং তোমাদের অন্তরে করেছেন এটাকে আকর্ষণীয়। কুফর, পাপাচার এবং গুনাহের প্রতি করেছেন বিতশ্রদ্ধ। এমন লোকগণই নেককার এবং সৎ পথের অনুসারী।" (সূরা হুজুরাত, ৭ আয়াত)

এই ঈমানসুলভ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে মাওলানা মওদূদী (র) বলেছেনঃ "একজন লোকের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধা থাকা অবস্থায় একবার মাত্র ব্যভিচারের মতো জঘন্য পাপে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে পর্যায়ক্রমে পঞ্চাশ জন স্বামী গ্রহণ করা শরঈ বৈবাহিক নিয়মানুযায়ী অনেক গুণে ভালো।" কেননা, শরীয়তের দৃষ্টিতে পর্যায়ক্রমে পঞ্চাশটি বিবাহ কোনো গুনাহের কাজ নয় বরং জায়েয। আর জীবনে একবার মাত্র ব্যভিচারের পাপে কলংকিত হওয়া শুধুমাত্র পাপই নয়; বরং জঘণ্য অপরাধ যার দরুন সে কোনো সময় প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার মতো কঠোর শাস্তিরও উপযোগী হতে পারে।

কোনো আল্লামা, কোনো উঁচু দরজার আলেম যিনি মস্তবড় দ্বীনি প্রতিষ্ঠান এবং বিরাট ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কেবলমাত্র সনদ প্রাপ্তই নন বরং সেসব প্রতিষ্ঠানের প্রধানরূপেও অধিষ্ঠিত এমন ব্যক্তিত্ব কি কুরআন হাদীসের শিক্ষার আলোকে আমাদেরকে এ প্রমান দেয়ার দুঃসাহস দেখাতে পারেন যে, এই বক্তব্যে কুরআন-হাদীসের আলোকে সামান্যতম কোনো দোষ ত্রুটি পাওয়া যায়? মাওলানার (র) একথায় যদি বুযর্গানে দ্বীন অসন্তুষ্ট ও রুষ্ট হয়ে থাকেন তবে কি মাওলানার (র) একথা বলা উচিত ছিল যে," একটি মেয়েলোক একজন পুরুষ লোকের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধা থাকা

www.pathagar.com

রাশেদীন এরূপ ক্ষেত্রে সম্পদ গ্রহণ করতঃ স্ত্রীকে ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছেন। অবশ্য কাযীর নির্দেশ এতোটুকু অর্থবহ যে, যাকে নির্দেশ দেয়া হলো (স্বামী) সে এই নির্দেশ কার্যকর করতে বাধ্য। এমনকি সে যদি এই নির্দেশ কার্যকর করতে গড়িমসি করে তাহলে আদালতের বিচারক তাকে বন্দী করতে পারেন। শরীয়তে কাযীর মর্যাদা নিছক উপদেষ্টা পর্যায়ের নয়। তার নির্দেশ শুধুমাত্র পরামর্শ পর্যায়ের; তা মানা বা না মানা নির্দেশিত ব্যক্তির ইচ্ছাধীন- এমন নয়।

সাতঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাখ্যানুযায়ী খোলার হুকুম এক তালাক বাইনের সমমানের। অর্থাৎ, এরপর ইদ্দতের মধ্যে স্বামী তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। কেননা ফিরিয়ে আনার অধিকার অবশিষ্ট থাকলে খোলা প্রথার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যহত হয়ে যায়। অধিকন্তু স্ত্রী স্বামীকে খোলার ব্যাপারে যে অর্থ দিয়েছে তা বিবাহের বন্ধন থেকে নিজকে মুক্ত করার বিনিময়েই দেয়া হয়েছে। সুতরাং স্বামী বিনিময় গ্রহণ করার পর যদি স্ত্রীকে মুক্ত না করে দেয় তাহলে এটা হবে তার প্রতারণা ও হঠকারিতা যা শরীয়ত সম্মত নয়। হ্যাঁ, স্ত্রী চাইলে তাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারে। কেননা এটা এমন ধরনের তালাক যা সংঘটিত হওয়ার পর দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্যে তাহলীল (দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করার পর তালাকপ্রাপ্তা হওয়া) শর্ত নয়।

আটঃ খোলার বিনিময় নিরূপণ করার জন্য আল্লাহ তায়ালা কোনো শর্ত বা সীমা লাগাননি। যে পরিমাণ বিনিময়ের উপর স্বামী স্ত্রী রাজী হয় তার উপর খোলা হতে পারে। [১] তবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের এটা

অবস্থায় পঞ্চাশ বার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া 'খোলা' লাভ করে অপরকে বৈধসূত্রে বিবাহ করার চেয়ে অনেক ভালো? (মায়ায আল্লাহ!) তাহলে বলুন" একটি সহজ সরল কথাকে জটিল ও দুর্বোধ্য করার এই প্রবণতা কেন?" এরূপ তৎপরতাকে বুযর্গানেদীন দ্বীনের সর্বোত্তম খেদমতই বা মনে করার কারণ কি? (মুহাম্মদ ইউসুফ)

১. এ মাসআলায় ফকীহগণ মতপার্থক্য করেছেন যে, স্বামী তার স্ত্রীকে মহর হিসেবে প্রদত্ত অর্থ সম্পদের চেয়ে বেশী পরিমাণের ওপর খোলা হতে পারে কি পারে না? অন্যভাষায় খোলার বিনিময় পরিমাণ শুধুমাত্র মহর পরিমাণের উপর সীমিত থাকবে অথবা তার চেয়ে বেশী পরিমাণের উপরও হতে পারবে? মযহাব চতুষ্টয়ের ইমামগণ ব্যতীত অপরাপর কিছু সংখ্যক আলেমের মতে মহরের চেয়ে অধিক পরিমাণের উপর খোলা হতে পারে না। এবং মহরের চেয়ে অধিক পরিমাণ মাল খোলা হিসেবে গ্রহণ করা স্বামীর জন্যে জায়েয নয়। কেননা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাবিত বিন

www.pathagar.com

অপসন্দনীয় যে, স্বামী খোলার বিনিময়ে মালে মহরের অপেক্ষা বেশী গ্রহণ করবে। তিনি বলেছেনঃ لا يأخذ الرجل من المختلعة أكثر مما أعطاها "খোলা প্রার্থিনী স্ত্রীর কাছ থেকে মোহর প্রদত্ত মাল অপেক্ষা অধিক মাল গ্রহণ করা স্বামীর

কয়েসের (রাঃ) খোলায় সে বাগানটিই দেয়ার নির্দেশ দেন যেটি স্ত্রী মহর হিসেবে লাভ করেছিল। মহরের চেয়ে অধিক পরিমাণ সম্পর্কে তিনি বলেছেনঃ اما الزيادة فلا তবে বেশী পরিমাণ, না (অর্থাৎ গ্রহণ করো না।)

এতে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, মহরের চেয়ে বেশী মাল নেয়া স্বামীর জন্যে জায়েয নেই আর এই অতিরিক্ত মাল খোলার বিনিময় হতে পারবে না। হাফেজ ইবনে হজর (র) দলীলটি ব্যক্ত করে বলেছেনঃ

واستدل به على أن الخلع لا يكون إلا بما أعطى الرجل المرأة

عينا أو قدرها لقوله عليه السلام أتردين عليه حديقته

وفي رواية ابن عباس عند ابن ماجة والبيهقي فأمره أن

يأخذ منها ولا يزداد وفي رواية ابن المبارك عن عطاء أما

الزيادة فلا ـ اه (فتح الباري ج ۹ ص ۳۳۱)

"জামীলার হাদীস দ্বারা একথার দলীল পেশ করা হয়েছে যে, খোলা শুধুমাত্র স্ত্রীকে দেয়া মালে মহরের উপর হবে। হুবহু সে মালটি হোক কিংবা সমপরিমাণ হোক। কেননা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বাগানটি মহর হিসেবে জামীলার স্বামী সাবিত বিন কয়েস থেকে লাভ করেছিল সেটাই ফেরত দেয়ার আদেশ করেছেন। বাইহাকী ও ইবনে মাজায় ইবনে আব্বাসের যে রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে তাতেও বাগান ফেরত নেয়ার নির্দেশের কথাই উল্লেখ হয়েছে। অতিরিক্ত যেন না নেয়া হয়। ইবনে মুবারক আতা থেকে এই রেওয়ায়েত করেছেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাবিতকে (রাঃ) বেশী গ্রহণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেন।" (ফতহুল বারী, ৯ম খন্ড, ৩৩১ পৃষ্ঠা)

কিন্তু চার মযহাবের ইমামগণসহ জমহুর আলেমগণের মত মাওলানা মওদূদীর (র) গৃহীত মতেরই অনুরূপ। সে মতটি হলো, মহরের পরিমাণের চেয়ে বেশীর উপরও খোলা হতে পারে। তবে অতিরিক্ত মাল গ্রহণ করা এ কারণে মকরূহ হবে যে, এটা শিষ্টাচার ও উত্তম চরিত্রের খেলাফ। সুতরাং অতিরিক্ত গ্রহণকরাকে ভালো বলা যায় না। হাফেজ ইবনে হাজর (র) ইবনে বাত্তালের উদ্ধৃতি দিয়ে জমহুরের মত এভাবে ব্যক্ত করেছেনঃ

قال ابن بطال وذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن

يأخذ في الخلع أكثر مما أعطاها وقال مالك لم أر أحدا ممن

يقتدى بهم يمنع ذلك لكنه ليس من مكارم الأخلاق ـ اه

(فتح الباري ج ۹ ص ۳۲۶)

www.pathagar.com

জন্য সমীচীন নয়।" হযরত আলীও (রাঃ) স্পষ্ট ভাষায় এটাকে মাকরূহ বলেছেন। মুজতাহিদ ইমামগণও একথায় একমত। বরং স্ত্রী স্বামীর অত্যাচারের কারণে যদি খোলার দাবী করে তাহলে স্বামীর জন্য মাল গ্রহণ করাই মকরূহ। যেমন হেদায়াতে আছে- وان كان النشوز من قبله يكره له ان يأخذ منها عوضا-اه (অর্থাৎ, যুলুম স্বামীর তরফ থেকে হওয়া অবস্থায় তার জন্য বিনিময় মালগ্রহণ করাই বরং মাকরূহ।)

খোলা মাসআলার একটি মৌলিক ভুল

ইসলামী বিধানে নারী ও পুরুষের অধিকারে কি পর্যায়ের সমতা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এ সত্য খোলা সম্পর্কীত এই আলোচনায় প্রকাশ পায়। নারীদের থেকে

ইবনে বাত্তাল বলেছেন, জমহুরের মতে স্বামী মালে মহরের অতিরিক্ত মাল গ্রহণ করতে পারবে। ইমাম মালেক (র) বলেছেন, যারা দ্বীনের নেতৃপর্যাযের লোক তাদের কেউ একথা অস্বীকার করেননি। তবে এ কাজটি শালীনতা ও উদারতার খেলাফ বিধায় এটাকে উত্তম বলা যায় না। (ফতহুল বারী, ৯ম খন্ড, ৩২৬ পৃঃ)

অন্য এক জায়গায় হাফেজ ইবনে হাজর (র) বলেছেনঃ

وقال مالك لم ازل اسمع الناس ان الفدية تجوز بالصداق
وباكثر لقوله تعالى لا جناح عليهما فيما افتدت به ولحديث
حبيبة بنت سهل اه

ইমাম মালেক (র) বলেছেন, আমি আলেমদেরকে সব সময় একথা বলতে শুনে আসছি যে, খোলার বিনিময়ে শুধু মহর নেয়াও জায়েয আবার বেশী নেয়াও জায়েয। আল্লাহ বলেছেনঃ "স্ত্রী স্বামীকে যে মালই ফিদইয়া হিসেবে দান করতঃ মুক্তি লাভ করবে তাতে স্বামী স্ত্রী কারোই কোনো ক্ষতি নেই।" হাবীবাহ বিনতে মহলের হাদীসও একথার দলীল।

রয়ে গেল জামিলার হাদীসে হুযুরের সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বাণীঃ জমহুর এর জবাবে লিখেছেনঃ

ليس فيه ما يدل على الشرط فقد يجوز ان يكون ذالك وقع على سبيل
الاشارة رفقا بها-اه (فتح البارى ج٩ ص٣٢١)

এখানে শর্ত আরোপ করার কোনো দলীল নেই। বরং সম্ভবত হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জামীলার অবস্থার উপর সদয় হয়ে সাবিতকে (রাঃ) পরামর্শরূপে একথা বলেছেন যে, "বেশী গ্রহণ করোনা" (ফতহুল বারী, ৯ম খন্ড, ৩৩১ পৃষ্ঠা)

মোট কথা ৮ম দফায় মাওলানা মওদূদী (র) যা কিছু বলেছেন তা জমহুর আলেমদের মতের হুবহু অনুরূপ। এ ক্ষেত্রে তিনি একক বা স্বতন্ত্র নন। তাঁর মত জমহুর আলেমদের চিন্তাধারারও খেলাফ নয়।

www.pathagar.com

তাদের খোলা অধিকার কার্যতঃ ছিনিয়ে নেয়া এবং শরঈ বিধানের খেলাফ বিবাহ বন্ধনকে সম্পূর্ণরূপে পুরুষদের ইচ্ছার উপর কুক্ষিগত করা আমাদের ভুল তৎপরতা বৈকি। এ তৎপরতায় নারীদের অধিকার যে ক্ষুণ্ন করা হলো এবং হচ্ছে এর দায়-দায়িত্ব কখনো আল্লাহ ও রসূল প্রদত্ত বিধানের উপর বর্তায় না। বরং যারা এই নিয়ম-কানুন বুঝতে এবং তদানুযায়ী কাজ করতে চেষ্টা করেনি তাদের উপর বর্তাবে। আজও নারীদেরকে প্রদত্ত অধিকার যদি স্বীকৃতি পায় তাহলে আমাদের বৈবাহিক ব্যাপারসমূহে সৃষ্ট অনেক সমস্যার জট খুলে যাবে বরং জটিলতা সৃষ্টির পথই রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে।

ইসলামী শরীয়ত খোলা প্রসংগটি স্বামী স্ত্রীর ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছেন এবং এ বিষয়ে বিচারকের হস্তক্ষেপ করার অনুমতি নেই। এরূপ ভুল ধারণা পোষণ করার কারণে নারীরা খোলা হাসিল করার অধিকার থেকে কার্যতঃ সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত। ফলে খোলা দেয়া না দেয়া পুরুষের ইচ্ছায় বন্দী হয়ে যায়। যদি স্ত্রী খোলা চায় আর স্বামী ক্ষতি কিংবা স্বার্থ চরিতার্থ করার অভিপ্রায়ে দিতে রাজি না হয়; তাহলে নারীর জন্যে আর কোনো বিকল্প উপায় থাকে না। অথচ এ ধারণাটি শরীয়তের উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ খেলাফ। কেননা এক পক্ষকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করে অপর পক্ষের হাতে বিয়ে সংক্রান্ত সর্বময় ক্ষমতা তুলে দেয়া কখনো আল্লাহ-রাসূলের উদ্দেশ্য ছিল না। যদি এরূপ হতো তাহলে প্রথমে বর্ণিত বিবাহের সাথে সম্পৃক্ত বহুবিধ উচ্চ নৈতিকতা এবং সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্য ব্যহত হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক।

ইসলামী শরীয়তে বৈবাহিক বিধান সম্পাদন করা এই ভিত্তির উপর রাখা হয়েছে যে, নারী পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক যতোক্ষণ পর্যন্ত পূতঃ চরিত্র, সম্প্রীতি ও রহমতের সাথে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ততোক্ষণ পর্যন্ত এর স্থিতি প্রশংসনীয় এবং জরুরী। এটাকে ভেংগে ফেলা কিংবা ভেংগে ফেলার চেষ্টা করা ভয়ানক গর্হিত কাজ। আর এই সম্পর্ক যখন উভয়ের কিংবা কোনো একজনের চরিত্র হননের কারণ হয়ে দাঁড়ায় অথবা সম্প্রীতি ও সহানুভূতির স্থলে ঘৃণা ও অবজ্ঞার প্রবেশ ঘটায় তখন এটাকে ছিন্ন করা জরুরী হয়ে পড়ে এবং সে অবস্থায় এটাকে জিইয়ে রাখা শরীয়তের উদ্দেশ্যের খেলাফ। এই ভিত্তির অধীনে শরীয়ত বিবাহের ব্যাপারে উভয় পক্ষকে এমন একেকটি বিধিসম্মত হাতিয়ার প্রদান করেছে যদ্বারা বিবাহ বন্ধনের অসহনীয় অবস্থার সমাধান করা সম্ভব। পুরুষকে দেয়া আইনানুগ হাতিয়ারের নাম তালাক। এর

www.pathagar.com

প্রয়োগে তার রয়েছে পূর্ণ স্বাধীনতা, অপরদিকে নারীকে দেয়া বিধিসম্মত হাতিয়ারের নাম খোলা। যার প্রয়োগ পদ্ধতি হলো, বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করতে চাইলে প্রথমতঃ স্ত্রী স্বামীর কাছে ছিন্ন হওয়ার দাবী উত্থাপন করবে। স্বামী এ দাবী পূরণ করতে অস্বীকার করলে বিচারকের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। স্বামী স্ত্রীর অধিকারে এভাবেই সমতা অক্ষুণ্ন থাকতে পারে। আল্লাহ্ ও রসূল প্রকৃতপক্ষে এই সমতাই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় বিচারকের ভূমিকা মাঝখান থেকে বাদ দিয়ে এই সমতা বিগড়ে দেয়া হচ্ছে। কেননা নারীকে দেয়া আইনগত হাতিয়ার মূলতঃ এভাবে বিকল হয়ে যায় এবং কার্যতঃ আইন এমন বিকৃতরূপ ধারণ করে যে, বৈবাহিক সম্পর্কে আল্লাহর সীমা লংঘিত হওয়ার আশংকা দেখা দিলে কিংবা এ সম্পর্ক অসহনীয় হলে পুরুষরা বিবাহ বন্ধন অবলীলাক্রমে ছিন্ন করতে পারে। আর এই ভয় নারীদের হলে অথবা বৈবাহিক সম্পর্ক অসহনীয় হলে তাদের ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার কোনো উপায় নেই যতোক্ষণ না পুরুষগণ তাদেরকে মুক্ত করে দেয়। এতে নারীরা সম্পর্ক বজায় রাখতে বাধ্য হয়ে পড়ে, যদিও আল্লাহর সীমায় প্রতিষ্ঠিত থাকা তার পক্ষে অসম্ভব এবং বিবাহের শরঈ উদ্দেশ্যাবলী সম্পূর্ণরূপে ধসে যায়। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল প্রবর্তিত শরীয়তের উপর এতোবড় নির্লজ্জ অন্যায় অপবাদ আরোপ করার দুঃসাহস কারো আছে কি? যদি কেউ এরূপ ধৃষ্ঠতা দেখাতে চায় তাহলে ফকীহদের কথায় নয়, কুরআন-হাদীস থেকে এর প্রমাণ পেশ করা উচিত যে, আল্লাহ্ ও রসূল খোলার ব্যাপারে কাযীকে কোনো এখতেয়ারই দেননি।

খোলার মাসআলায় কাযীর ক্ষমতা

কুরআনের যে আয়াতে খোলার বিধান বর্ণিত হয়েছে তা পুনরায় পাঠ করুনঃ

فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لَّا یُقِیْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیْمَا
افْتَدَتْ بِهٖ - (بقره)

"আল্লার নির্ধারিত সীমায় অবস্থান করার ব্যাপারে যদি তোমরা শংকিত হও তাহলে স্ত্রী ফিদইয়ার বিনিময়ে আলাদা হয়ে যাওয়া তোমাদের দু'জনের জন্য (স্বামী-স্ত্রী) কোনো ক্ষতিকর নয়।" (সূরা বাকারা, ২২৯ আয়াত)

www.pathagar.com

এই আয়াতে স্বামী স্ত্রীর উল্লেখ নাম পুরুষের ক্রিয়ায় বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং خفتم (যদি তোমরা ভয় কর) ক্রিয়ার সম্বোধিত ব্যক্তি তারা হতে পারে না। সুতরাং একথা মানতে বাধ্য যে, সম্বোধিত ব্যক্তি হলেন মুসলিম সমাজপতি ও কর্তৃপক্ষগণ। আল্লাহর নির্দেশের উদ্দেশ্য হলো-খোলায় স্বামী স্ত্রী উভয়ের পরস্পর রাজী না হলে কর্তৃপক্ষের কাছে ফয়সালার ভার ন্যস্ত করতে হবে। আমাদের উপরোল্লেখিত হাদীসসমূহ একথার প্রমাণ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং খুলাফায়ে রাশেধীনদের কাছে খোলার দাবী নিয়ে স্ত্রীদের আগমন এবং তাদের বক্তব্য শ্রবণ করা একথার দলীল যে, খোলার ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে পরস্পরে রাজী না হলে তা বিচারকের দায়িত্বে ন্যস্ত করা উচিত। এখন যদি বিচারক এ ব্যাপারে বাস্তবে নিরুপায় হয় এবং স্বামী রাজী না হওয়া অবস্থায় কাযী তার নিজস্ব ফয়সালা প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হন এবং প্রয়োগ করার ক্ষমতাও না রাখেন তাহলে কাযীকে বিচারকরূপে ঘোষণা দেয়া মূলত প্রহসন বৈ কি!

কারণ এমতাবস্থায় তার কাছে যাওয়া না যাওয়ার ফল একই। অথচ এ ব্যাপারে হাদীসসমূহে কাযীকে ক্ষমতাহীন প্রমাণ করা হয়েছে কি? নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের যতোগুলো ফয়সালার কথা উপরে উল্লেখ হয়েছে সেগুলোর প্রায় প্রত্যেকটিতেই আদেশ সূচক ক্রিয়া প্রয়োগ হয়েছে। যেমন, طلقها (তাকে তালাক দিয়ে দাও) فارقها (তা থেকে পৃথক হয়ে যাও) خل سبيلها (তাকে ছেড়ে দাও)। কোথাও নবী আলাইহিস সালাম স্বামীকে এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন বলে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে জারীর হযরত ইবনে আববাস (রা) থেকে যে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন তার ভাষা এরূপঃ ففرق بينهما (তারপর তিনি তাদের উভয়কে পৃথক করে দেন)। জমীলাহ বিনতে উবাই বিন সুলূলের বর্ণিত রেওয়ায়েতটির ভাষাও অনুরূপ। তারপরও একথা সন্দেহ করার কোনো অবকাশ নেই যে, খোলার ব্যাপারে কাযী নির্দেশ প্রদানের অনুমতি প্রাপ্ত নন। রয়ে গেল এ প্রশ্ন, যদি স্বামী কাযীর নির্দেশকে পরামর্শ মনে করে মানতে অস্বীকার করে তাহলে কাযী তার নির্দেশ জোর করে চাপিয়ে দিতে পারবে কি-না? জবাবে বলা যায়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে এমন কোনো উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় না যে, তিনি একটি নির্দেশ দিয়েছেন যা লংঘন করার কেউ দুঃসাহস দেখিয়েছে।

www.pathagar.com

অবশ্য আমরা সাইয়্যেদুনা হযরত আলীর (রাঃ) একটি ফয়সালার উপর তুলনামূলক বিচার করতে পারি। তিনি একজন ঔদ্ধত্ব স্বামীকে বলেছিলেনঃ لست ببارح حتى ترضى بمثل ما رضيت به "স্ত্রীলোকটি যেভাবে নির্দেশ গ্রহণ করতে রাজী হয়েছে সেভাবে তুমিও নির্দেশ গ্রহণে রাজী না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে ছেড়ে দেয়া যাবে না।" হুকুম তামিল করতে অস্বীকার করায় যদি বিচারপতি একজন স্বামীকে নিজের তত্ত্বাবধানে রাখতে পারেন, তাহলে তার নিজের ফয়সালা লংঘিত হওয়ার ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ করার অধিকার থাকাতো সহজেই অনুমেয়। দুনিয়ার সমুদয় ব্যাপারের মধ্যে শুধুমাত্র খোলার ক্ষেত্রে বিচারকের অধিকার ক্ষুণ্ন করার কোনো যুক্তিসংগত কারণ থাকতে পারে না।

ফিকাহের কিতাবসমূহে এমন কতিপয় শাখা প্রশাখাগত মাসআলা পাওয়া যায় যাতে স্বামী তালাক দিতে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে বিচারককে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছিন্ন ঘটানোর ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। তাহলে খোলার ক্ষেত্রে বিচারকের এই অধিকার ক্ষুণ্ন হবে কেন? [হুকূকুযযাও জাইন (স্বামী–স্ত্রীর অধিকার)]

খোলার মাসআলায় "বিচারকের ক্ষমতাসমূহ "শিরোনামের অন্তর্গত এ ব্যাপারে মাওলানা (র) যা কিছু বলেছেন তার সারমর্ম হলো–ইসলামী শরীয়ত স্বামীকে যেভাবে তালাক দেয়ার অধিকার দিয়েছে এবং এই অধিকার স্ত্রীর সম্মতি ব্যতিরেকে যখন ইচ্ছা প্রয়োগ করার স্বাধীনতা স্বামীর রয়েছে সেভাবে স্ত্রীকেও খোলা হাসিল করার অধিকার দেয়া হয়েছে। যদি স্বামী স্ত্রীকে খোলা দিতে সম্মত না হয়, তাহলে স্ত্রী অবশ্যই আদালতের শরণাপন্ন হতে পারবে এবং আদালত স্বামীর সম্মতি ব্যতীত স্ত্রীর অধিকার আদায় করে দেয়ার সম্পূর্ণ অধিকারী।

সমকালীন আলেমগণ এই দ্বিতীয় কথার উপরই আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন যার ব্যাখ্যার জন্যে এখানে 'স্বামী স্ত্রীর অধিকার' গ্রন্থের একটি পূর্ণ অধ্যায় তুলে ধরা হয়েছে। নিম্নে আমরা প্রথমতঃ ইসলামী ফকীহদের চিন্তার আলোকে বিষয়টির ব্যাখ্যা পেশ করতে চাই। অতপর আমরা প্রমাণ করতে চেষ্টা করবো যে, এ ব্যাপারে মাওলানা মওদূদী (র) তাঁর নিজস্ব মত হিসেবে যে নীতি গ্রহণ করেছেন তাতে তিনি এক ও একক নাকি ইতিপূর্বে অন্যান্য ফকীহগণ ও এরূপ মত পোষণ করতেন। মাওলানা মওদূদী সাহেব (র) তাঁর

www.pathagar.com

মতের স্বপক্ষে যেসব দলীল পেশ করেছেন সেগুলোও সংক্ষিপ্ত আকারে পরিশেষে উল্লেখ করা হবে।

ইসলামী ফকীহদের অভিমত সমূহ

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্মতিতে খোলার ব্যাপারটি নিষ্পত্তি না হলে বিচারকের এজলাসে অভিযোগ করলে সে অবস্থায় স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বিচারপতি স্বামী স্ত্রী উভয়ের মধ্যে বিচ্ছিন্ন ঘটানোর ক্ষমতা রাখেন কিনা এ নিয়ে ওলামায়ে উম্মত এবং ফুকাহায়ে ইসলামের মতপার্থক্য রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা, শাফেঈ এবং ইমাম আহমদের (র) অভিমত

ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম শাফেঈ (র) ও ইমাম আহমদ (র) এই তিনজন ইমামের মতে স্বামীর অনুমতি এবং সম্মতি ছাড়া উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর ক্ষমতা বিচারকের নেই। শরীয়তের দৃষ্টিতেও সে এ কাজের অনুমতি প্রাপ্ত নন। এর ভিত্তিতেই ব্যাপারটি আদালতে দায়ের হওয়ার অবস্থায় স্বামীর অসম্মতিতে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর বিচারকের ক্ষমতাকে এই তিনজন ইমাম স্বীকার করেন না। কারণ বিচারককে তালাক এবং বিচ্ছিন্ন করার ওকীল বানানো হয়নি। সম্মতি থাকা অবস্থায় স্বামী স্ত্রী উভয়ই বিচ্ছিন্ন হওয়ার স্বাধীনতা লাভ করবে আর অসম্মতি অবস্থায় কেবলমাত্র স্বামীর অধিকারই স্বীকৃত হবে।

ইমাম মালেক (র), ইমাম আওযাঈর (র) ও ইমাম ইসহাকের (র) অভিমত

অপরদিকে এই তিনজন ইমামের মতে স্বামী স্বেচ্ছায় স্ত্রীকে খোলা দিতে রাজী না হলে খোলার মাধ্যমে স্বামীর অসম্মতিতে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর ব্যাপারে কাযী ও বিচারপতির পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। শরীয়তের দৃষ্টিতে তাঁরা এ কাজের অনুমতি প্রাপ্তও বটে। এ কারণে কাযী ও বিচারক তালাক ও বিচ্ছিন্নতার ওকীল না হওয়া সত্ত্বেও ব্যাপারটি আদালতে দায়ের হলে বিচারক স্বামীর সম্মতি ছাড়া বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে।

হাফেজ ইবনে হাজর (র) মতপার্থক্যগুলো দলীলসহ উল্লেখ করেছেন। যথাঃ

www.pathagar.com

قال ابن بطال اجمع العلماء على ان المخاطب بقوله تعالى
وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، الحكام وان المراد بقوله تعالى اِنْ
يُّرِيْدَا اِصْلَاحًا الحكمان- وان الحكمين يكون احدهما من
جهة الرجل والآخر من جهة المرأة -وانهما اذا اختلفا
لم ينفذ قولهما- وان اتفقا نفذ في الجمع بينهما من غير
توكيل - واختلفوا فيما اذا اتفقوا على الفرقة فقال مالك
والاوزاعي واسحق ينفذ بغير توكيل ولا اذن من الزوجين و
قال الكوفيون والشافعي واحمد يحتاجان الى الاذن -
فاما مالك ومن تابعه فالحقوه بالعنين والمولى- فان
الحاكم يطلق عليهما فكذالك هذا- وايضا فلما كان الخاطب
بذالك الحكام وان الارسال اليهم دل على ان بلوغ الغاية
من الجمع والتفريق اليهم وجرى الباقون على الاصل وهو
ان الطلاق بيد الزوج فان اذن في ذالك والاطلق عليه الحاكم

"ইবনে বাত্তালের ভাষ্য অনুযায়ী আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, وان خفتم আয়াতের সম্বোধিত ব্যক্তিগণ হলেন বিচারকগণ এবং ان يريدا اصلاحا আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য দু'জন বিচারক। একজন স্বামীর পক্ষ থেকে অপরজন স্ত্রীর পক্ষ থেকে।"

এ কথায়ও তাঁরা একমত যে, যদি উভয়ের মধ্যে আপোষে মতবিরোধ দেখা যায় তাহলে কারো ফয়সালাই নির্ভরযোগ্য হবে না। যদি স্বামী স্ত্রী উভয়কে একত্রিত রাখার ব্যাপারে ঐক্যমত হয়, তাহলে উভয়ের সিদ্ধান্ত নির্ভরযোগ্য হবে যদিও স্বামী স্ত্রীর কেউ তাদেরকে এ ব্যাপারে ওকীল না বানিয়ে থাকেন। আলেমগণ কেবলমাত্র তখনই মতপার্থক্য করেছেন যখন উভয় সালিস বিচ্ছেদ ঘটানোর ব্যাপারে একমত হয়ে যান।

ইমাম মালেক (র), ইমাম আওয়াঈ (র) ও ইমাম ইসহাকের (র) মতে বিচ্ছেদে একমত হওয়া অবস্থায়ও তাদের ফয়সালা নির্ভরযোগ্য হবে যদিও স্বামী স্ত্রীর কেউ তাদেরকে ওকীল বানায়নি কিংবা অনুমতিও দেয়নি।

www.pathagar.com

কুফাবাসী আলেমগণ ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমদ (র) এই তিনজনের মতে সালিসদ্বয়কে অনুমতি পেতে হবে। ইমাম মালেক (র) এবং তাঁর অনুসারী আলেমগণের পেশকৃত দলীল হলো-এটা নপুংষক স্বামীর হুকুমের অন্তর্গত অথবা যে স্বামী স্ত্রীর সাথে ঈলা করেছে তার সাথে তুলনীয়। এমন অবস্থায় বিচারক তো বিবাহ ভেংগে দিতে পারেন। তাহলে এখানেও তিনি বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবেন। তাদের দ্বিতীয় দলীল হলো এর خِفْتُمْ সম্বোধিত ব্যক্তিগণ যখন বিচারকমন্ডলি সাব্যস্থ হলো তখন দু'জন বিচারক প্রেরণ করাও তাদের জিম্মায় হবে এবং ভাংগা-গড়ার চূড়ান্ত ফায়সালাও তাদের ইচ্ছার উপরই ন্যস্ত হবে। তাছাড়া অন্যান্য আলেমগণ মূলের উপর ভিত্তি করে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করে বলেছেন-তালাক শুধুমাত্র স্বামীর এখতিয়ার। যদি স্বামী বিচারক বা দু'জনকে অনুমতি দেন তবে তো উত্তম। অন্যথায় বিচারক জোরপূর্বক তালাক দানে তাকে বাধ্য করবেন।

(ফতহুলবারী, ৯ম খন্ড, ৩৩২ পৃষ্ঠা)

মতপার্থক্যের সারমর্ম

হাফেজ ইবনে হাজর আসকালানীর (র) ব্যাখ্যায় এ সত্য প্রকাশিত হলো যে, যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর ব্যাপারে উভয় সালিস একমত হন তাহলে এ বিষয়ে আলেমগণ ভিন্ন মত পোষণ করেন। ইমাম আযম (র), ইমাম শাফেঈ (র) ও ইমাম আহমদের (র) মতে অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত সালিস স্বেচ্ছায় উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে না। অপর পক্ষে ইমাম মালেক (র), ইমাম আওযাঈ (র) ও ইমাম ইসহাকের (র) মতে স্বামী-স্ত্রী কারোর অনুমতি না থাকলেও সালিসদ্বয় উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। একথার সমর্থনে তাঁরা দু'টি দলীল পেশ করেছেন। একটি দলীল কিয়াস। যে স্বামী নপুংষক এবং স্ত্রীর অধিকার আদায় করতে অক্ষম তার ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে বিচারক সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান এবং বিনানুমতিতেই এ কাজ করার অধিকার তাঁর রয়েছে। তবে শর্ত হলো, স্ত্রী দাবী করলে এখানেও (অর্থাৎ খোলার মাসআলায়ও) সম্মতি ও অনুমতি ছাড়া বিচারক উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন। এভাবে যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর সাথে ঈলা করেছে তাদের মধ্যেও বিচারক যখন অনুমতি ছাড়া বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন, তখন এ ক্ষেত্রেও (খোলার) তিনি তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় দলীল হলো, আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এ বিষয়ের প্রাথমিক কার্যাবলী বিচারকদের ইচ্ছার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। প্রাথমিক কার্যাবলী যখন তার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে, তখন চূড়ান্ত ফয়সালা তথা একত্রিত রাখা অথবা বিচ্ছিন্ন করা তাদের উপরই ন্যস্ত হওয়া সহজেই অনুমেয়। যেহেতু দু'পক্ষের দু'জন শালিসের মর্যাদাও কেবলমাত্র পরামর্শ দাতা এবং সংশোধনকারী রূপেই নয় বরং এক ধরনের বিচারক বটে; সুতরাং তারাও বিচারকের ন্যায় উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর ব্যাপারে অনুমতি প্রাপ্ত হিসেবে গণ্য হবে। আলেম সমাজে বিষয়টি নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়ায় ফকীহগণ এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দেন। ব্যাখ্যার ফলশ্রুতিতে এ বিষয়ে দু'টি অভিমতের অবতারণা হয়। দলীল-প্রমানের যৌক্তিকতার প্রেক্ষাপটে কোনো একটি মতের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করা, একটিকে প্রাধান্য দিয়ে অপরটিকে দুর্বল মনে করে বর্জন করা আদৌ দোষণীয় নয়। তাই এ ক্ষেত্রে মাওলানা মওদূদী (র) যদি ইমাম আযম ও শাফেঈ সাহেবের অভিমতের মুকাবিলায় ইমাম মালেক (র), ইমাম আওযাঈ (র) ও ইমাম ইসহাকের (র) অভিমতকে প্রাধান্য দিয়ে বলেন, খোলার ব্যাপারে বিচারক একেবারে ক্ষমতাহীন নহেন বরং তিনি স্বেচ্ছায় স্বামী স্ত্রীর অসম্মতিতেও উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর অধিকার রাখেন। তাহলে তাঁর এই মত পোষণ করা ওলামায়ে রাব্বানী মহলে অমার্জনীয় অপরাধরূপে গণ্য হবে কোন্ যুক্তিতে? অথচ তিন ইমামের উপরোক্ত মত গ্রহণের স্বপক্ষে মাওলানা (র) যে দলীল ও যুক্তি পেশ করেছেন তাতে উপরোক্ত অভিমতটি গ্রহণযোগ্য হওয়া এবং প্রাধান্য পাওয়া যথার্থ ও যুক্তিগ্রাহ্য প্রতীয়মান হয়। সুতরাং উপরোক্ত মত পোষণ করার ব্যাপারে মাওলানা মওদূদী (র) একা কিংবা একঘরে নয়; আর এটা তার নবাবিষ্কৃত অভিমতও নয়। বরং আগে থেকে বহুল প্রচলিত দু'টি ফিকহী প্রবাহের একটি যা দলীলের ভিত্তিতে প্রাধান্য পেয়েছে। এ ধরনের প্রাধান্য প্রদান ও গ্রহণ কোনো নতুন কথা নয়। ইসলামী চিন্তাবিদগণ সবসময়ই এহেন চিরাচরিত ধারায় বিচরণে অভ্যস্থ। সম্মানিত আলেমগণ শরঈ দলীলের ভিত্তিতে এই মতের উপর সমালোচনা করার অধিকার অবশ্যই রাখেন। কিন্তু এই মত ও নীতিকে বাতিল ঘোষণা করা, মঞ্চে দাঁড়িয়ে এর বিরুদ্ধে জনগণের কাছে ঘৃণ্য প্রোপাগান্ডা করা, ধর্মীয় উত্তেজনার আড়ালে জনগণের মনে মাওলানার (র) বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টি করা অথবা এ কারণে মওলানার (র) উপর বিভিন্ন ধরনের ফতওয়াবাজী করা তাদের জন্য আদৌ শোভনীয় নয়।

www.pathagar.com

আলোচ্য মাসআলার স্বপক্ষীয় দলীলসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

"বিচারক ও প্রশাসক খোলার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর অধিকার রাখেন এবং কোনো স্ত্রী এ ব্যাপারে আদালতের শরণাপন্ন হলে তার অধিকার পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করা আদালতের নৈতিক দায়িত্ব।"—এই মত পোষণ করার স্বপক্ষে মাওলানা (র) যেসব দলীল পেশ করেছেন সেগুলো আমরা নিম্নে সংক্ষেপে তুলে ধরছি।"

প্রথম দলীল

فَإِنْ خِفْتُمْ খোলার এই আয়াতের সম্বোধিত ব্যক্তিগণ হচ্ছেন সর্বসম্মতিক্রমে সমকালীন কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসকগণ। এতে আকার-ইংগীতে প্রতীয়মান হয় যে, যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তিক্ততা ও অপ্রিয় সম্পর্কের সৃষ্টি হয় যদ্বারা আল্লাহর সীমা লংঘিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয় এবং স্বামী সন্তুষ্টচিত্তে স্ত্রীকে খোলা দিতে রাজী না হয়, তাহলে এমতাবস্থায় খোলার ব্যাপারটি আদালতে দায়ের করতে হবে। কেননা আল্লাহর সীমারেখার রক্ষণাবেক্ষণ তাদেরই দায়িত্বে ন্যস্ত। এ কথার সমর্থনে যে সমস্ত হাদীস প্রণিধানযোগ্য সেগুলো হলঃ

"হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীদের শাসনামলে নারীগণ খোলার প্রার্থনা নিয়ে তাঁদের আদালতে হাজির হতো এবং তাঁরাও নারীদের অভিযোগ শুনতেন।"

এখন বিচারক কার্যক্ষেত্রে এ বিষয়ে যদি ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েন এবং স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীকে তার খোলার অধিকার আদায় করে দিতে অক্ষম হন, তাহলে বিচারকের কাছে মামলা দায়ের করার প্রয়োজন কি এবং এতে মহিলারই বা ফায়দা কি?

দ্বিতীয় দলীল

খোলার ব্যাপারে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যতোগুলো ফয়সালা বর্ণিত আছে সেগুলোতে নবী আলাইহিস সালাম স্বামীকে তালাক দিতে অথবা ছেড়ে দিতে কিংবা আলাদা করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন অথবা তিনি নিজে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন। এদ্বারা বিচারকের ক্ষমতাহীন হওয়ার কথা প্রমাণ হয় না বরং বিচ্ছিন্ন করতে এবং ফয়সালা করার অধিকার ও ক্ষমতা

www.pathagar.com

তার আছে বলেই প্রমাণিত হয়। সুতরাং তিনি উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতেও অনুমতি প্রাপ্ত হিসেবে বিবেচিত হবেন।

তৃতীয় দলীল

হযরত আলীর (রা) পূর্বের রেওয়ায়েত দ্বারা একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, স্বামী শালিসদ্বয়ের ফয়সালা মানতে অস্বীকার করলে আদালতের বিচারক বন্দী হিসেবে তাকে আটক রাখতে পারেন। এতে প্রমান হয় যে, বিচারক স্বেচ্ছায় উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর সিদ্ধান্তই গ্রহণ এবং তা মেনে নিতে স্বামীকে বাধ্য করারও অধিকারী।

চতুর্থ দলীল

দুনিয়াজুড়ে স্বীকৃত বিধান রয়েছে যে, বিচারপতি তার এজলাসে দায়েরকৃত মামলার চূড়ান্ত ফয়সালা দানের পূর্ণ অধিকারী। তাহলে খোলার ঘটনা তাঁর এজলাসে উত্থাপিত হলে সেক্ষেত্রে তাঁর ফয়সালা করার অধিকার খর্ব করার যুক্তি কি? অথচ সব ব্যাপার থেকে খোলার ব্যাপারটি ব্যতিক্রম রাখার কোনো জোরালো দলীল আজ অবধি কোথাও পাওয়া যায়নি।

পঞ্চম দলীল

ফিকাহের কিতাবসমূহে খোলা ছাড়া এমন কতিপয় ছোটখাটো ব্যাপার পাওয়া যায় যার মধ্যে বিচারকের নির্দেশে যদি স্বামী তালাক দিতে অস্বীকার করে তাহলে কাযী নিজের ইচ্ছায় উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন। যেমন নপুংসক, উন্মাদ, দেওয়ানাদের সর্বাবস্থায় অথবা লিয়ানের অবস্থায়। তাহলে একমাত্র খোলার ব্যাপারে বিচারককে ক্ষমতাহীন করা হবে কেন?

ষষ্ঠ দলীল

খোলার ব্যাপারে যদি বিচারককে নিঃস্ব ও ক্ষমতাহীনরূপে মূল্যায়ণ করা হয় এবং স্বামীর সম্মতির উপর ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে অবস্থা বিশেষে এমন বিপর্যয় দেখা দিতে পারে যা বৈবাহিক বিধানের উদ্দেশ্যাবলীকে মূলোৎপাটন করে দিবে। যেমন, স্ত্রীর যৌনাচারে লিপ্ত হওয়া অথবা মুরতাদ হতে বাধ্য হওয়া অথবা নামেমাত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থেকে জীবনভর অসহ্য জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকা যা কোনক্রমেই ইসলামের

www.pathagar.com

পারিবারিক বিধানের উদ্দেশ্য হতে পারে না। বস্তুত এ ধরনের বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে যে উদ্দেশ্যে বৈবাহিক বিধান রচিত হয়েছে শরীয়তের সে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছা আদৌ সম্ভব নয়। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সম্প্রীতি ও হৃদ্যতার অনাবিল ফল্গুধারা সৃষ্টি করা এবং পরিষ্কারভাবে সভ্যতা ও সংস্কৃতির সেবা করার অনবদ্য স্পৃহা বৈবাহিক সম্পর্কের অন্যতম যে লক্ষ্য তাও এ ধরনের সম্পর্কে ব্যাহত হয়ে যায়। তদ্রূপভাবে এ ধরনের বৈবাহিক বন্ধনকে 'ইহসান' নামে আখ্যায়িত করা যায় না এবং এদ্বারা চরিত্রের হেফাজত হতে পারে না। এমতাবস্থায় যদি স্ত্রীর প্রদত্ত অধিকার 'খোলাকে' সম্পূর্ণরূপে ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং পরিণতিতে একটি নিরপরাধ নারীর জীবন নষ্ট হয়ে যায় কিংবা পাপ পঙ্কিলতায় ডুবে যায় অথবা মুরতাদ হতে বাধ্য হয় তাহলে বলুন! এর দায়-দায়িত্ব বহন করবে কে? আল্লাহ ও তাঁর রসূল তো এরূপ দায়িত্ব থেকে অবশ্যম্ভাবীরূপে মুক্ত ও স্বাধীন। কেননা তাঁদের দেয়া বিধানে বিন্দুমাত্র খুঁত নেই।

উপরোক্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বুদ্ধিবৃত্তিক দলীলের ভিত্তিতে মরহুম মাওলানা মওদূদী সাহেব খোলার ক্ষেত্রে বিচারকের ক্ষমতা ও অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে স্বামীর অসম্মতিতেও বিচারক উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর পূর্ণ অধিকারী বলে মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর এই মতটি ইমাম মালেকের (রঃ), ইমাম আওযাঈ ও ইমাম ইসহাকের (রঃ) অভিমতেরই প্রতিধ্বনি বৈ কি?

গালি-গালাজ, ভর্ৎসনা ও তিরস্কারের পথ পরিহার করে কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষার আলোকে মাওলানার প্রদত্ত অভিমত ভুল এবং তাঁর পেশকৃত দলীলগুলো সঠিক নয় এমন কথা বলার কোনো আল্লাহর বান্দা আছেন কি? অথবা মরহুম মাওলানার উপস্থাপিত দলীলগুলোর তত্ত্বভিত্তিক সমালোচনা করার কষ্ট সহ্য করার কি কেউ আছেন?

সংকলকের পক্ষ থেকে সপ্তম দলীল

এ ব্যাপারে শরীয়ত নারীকে পুরুষের ন্যায় একটি বিধি সম্মত হাতিয়ার দিয়েছে যা 'খোলা' নামে পরিচিত। প্রয়োজন বোধে সময় মতো নারী তার এই হাতিয়ার ব্যবহার করতে পারে। কেবলমাত্র স্বামীর সম্মতির উপর খোলার ব্যাপারটি নির্ভরশীল নয়। এর স্বপক্ষে মাওলানা মওদুদীর (র) পেশকৃত উপরোক্ত দলীল ছাড়া আরো একটি দলীল পেশ করা যায় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু

www.pathagar.com

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বৈধ প্রয়োজন ব্যতিরেকে যেসব মেয়েরা নিজেদের স্বামী থেকে খোলা করতে আগ্রহী তাদেরকে মুনাফিক বলেছেনঃ

المختلعات هن المنافقات ـ অর্থাৎ "খোলা প্রার্থী নারী মূলত মুনাফিক"

তিনি আরো বলেছেন

ايما امرأة اختلعت من زوجها بغير نشوز فعليها لعنة الله والملئكة والناس اجمعين

"এমন খোলা প্রার্থী নারীদের প্রতি রয়েছে আল্লাহ, ফিরিশতা এবং সমগ্র মানুষের অভিশাপ যারা স্বামীর নিগ্রহ ও অত্যাচার ব্যতিত অকারণে এ পথে অগ্রসর হয়।" এহেন নারী আল্লাহর মহব্বতের দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত।

ان الله لا يحب الذواقين والذواقات

"যৌন বিলাসী পুরুষ নারীকে আল্লাহ্ আদৌ ভালবাসেন না।"

কামুক, প্রতারণা ও প্ররোচণামূলক খোলা প্রাপ্তীয় নারীকে হাদীসে বিভিন্ন ভংগীতে বিভিন্ন ভাষায় ভর্ৎসনা ও অভিশপ্ত করা হয়েছে। তাতে এ সত্যই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠে যে, খোলার অন্তরালে নারী জাতি মারাত্মক গুনাহ্ ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়া বিচিত্র নয়।

খোলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নারীর মর্যাদা দাবীদার বা হকদার না হয়ে যদি হয় আবেদনকারিণী এবং দরখাস্ত কারিণীরূপে আর বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকে স্বামীর হাতে; প্রয়োজনে শিথিল বা ছিন্ন করতে নারীর কানাকড়ি অধিকার যদি স্বীকৃত না হয় এমনকি আদালতের শরণাপন্ন হয়েও নয়; তখন 'খোলার' দাবী নিছক একটি অনুগ্রহ কিংবা দয়া প্রার্থনা রূপে পর্যবসিত হয়ে যায়। তদুপরি অধিকার ও দাবীর প্রকৃত রূপ 'খোলা' শব্দে আর অবশিষ্ট থাকে না। দরখাস্ত কিংবা আবেদন তা যতো বড় নির্মমই হোক না কেনো তার পরিণতিতে এরূপ সাংঘাতিক ও জঘন্য শাস্তি ও ভর্ৎসনার কথা উল্লেখ করা শরীয়তের বিধানে কোন ক্রমেই যুক্তিসংগত ও যথাযথ হতে পারে না। অতএব, 'খোলা'র ব্যাপারে একজন নারীর মর্যাদা দরখাস্ত কারিণী কিংবা দয়া প্রার্থীণীরূপে নয়; বরং 'খোলা' হল বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন করার একটি বৈধ দাবী এবং বিধি সম্মত হাতিয়ার বিশেষ। এই সূত্রের সাথে দ্বীন-দুনিয়ার বহুবিধ উপকারিতা, সামাজিক ও তামদ্দুনিক কল্যাণ সম্পৃক্ত যা অপ্রয়োজনে

www.pathagar.com

ছিন্ন করা হলে নস্যাৎ হয়ে যায়। এ কারণে স্বামী স্ত্রীর যে কেউ অকারণে অযথা এই সম্পর্ক ছিন্ন করে কিংবা করায় যার ফলে উপরোক্ত উপকারীতা ব্যহত হয়- সে মারাত্মক অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হবে। পরিনতিতে সে শাস্তির যোগ্য হবে এবং অভিশাপেরও উপযুক্ত গণ্য হবে। 'খোলা'র মাধ্যমে নারীর পক্ষ থেকে যেহেতু এই সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে থাকে; সুতরাং অকারণে খোলা প্রার্থীণী নারী মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং অভিশাপের যোগ্য হওয়া যুক্তিযুক্ত ও যথার্থ। এমনকি শাস্তি স্বরূপ বেহেশত থেকে বঞ্চিত হওয়াও বিচিত্র নয়। অতএব, প্রতীয়মান হয় যে, 'খোলা'র ব্যাপারে স্ত্রী স্বামীর ন্যায় দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করার ক্ষেত্রে একজন হকদার মর্যাদাসম্পন্ন। তার এই হক বা অধিকার প্রাপ্তির জন্যে সে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। প্রয়োজন বোধে সে আদালতের মাধ্যমে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করতে পর্যন্ত সক্ষম।

সারকথা

'খোলা'র ব্যাপারে মরহুম মাওলানা মওদূদীর (র) ভূমিকা সমকালীন মাশায়েখ ও আলেমগণের মতে ভুল বা দুর্বল হলেও দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে সবল ও নির্ভুল হওয়া পরিক্ষিত সত্য। তাঁর অনুসৃত নীতি যথেষ্ট ওজনদার। ইমাম মালেক (র), ইমাম আওযাঈ (র) ও ইমাম ইসহাক (র) এই তিনজন ইমামেরও এই অভিমত। "মরহুম মওদূদী (র) সাহেবের গৃহিত নীতি ইমাম আযমের (র) নীতির খেলাফ"- এর উপর ভিত্তি করে সম্মানিত আলেমগণ যদি তাঁর বিরোধিতা করতে চান, তাহলে দলীলের ভিত্তিতে তাঁর অনুসৃত নীতির সমালোচনা করার তাঁদের অধিকার নিঃসন্দেহে স্বীকার্য। কিন্তু তাই বলে তাঁর গৃহীত নীতির দরুন তাঁকে গোমরাহ বলা কোনো ক্রমেই ঠিক হতে পারে না। কেননা এটা তাঁর একক নীতি নয়। তিনি এ ব্যাপারে উপরোল্লেখিত তিনজন ইমামেরই অনুসারী মাত্র। তাঁকে গুমরাহ হওয়ার ফতওয়া দানের অর্থ সে ফতওয়ার বানের আঘাতে উপরোক্ত তিনজন বিশ্ব বরেন্য ইমামকে ক্ষত বিক্ষত করা হয়। এরূপ আঘাত হানা চরম বে-ইজ্জতি ও বে-আদবী বৈ কি! একজন আল্লাহ প্রিয় লোক দ্বারা এরূপ ধৃষ্টতাপূর্ণ কাজ হওয়ার কল্পনা করাও অসম্ভব। একজন আলেম তো দূরের কথা একজন সাধারণ মু'মিনের পক্ষেও এজাতীয় আচরণ শোভনীয় হতে পারে না।

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

সাহাবায়ে কিরামের ভ্রান্তি প্রসংগ

জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের কোনো কোনো স্বার্থান্বেষী ও সুবিধাবাদী নেতা সম্প্রতি এক নতুন প্রসংগ দাঁড় করেছেন। মাওলানা মওদূদীকে (র) গোমরাহ প্রমাণ করার জন্যে তারা নিজেদের বক্তৃতা-বিবৃতিতে যত্রতত্র এ প্রসংগটিকে দলীলরূপে জনগণের কাছে উপস্থাপিত করে থাকেন। প্রসংগটি হলো সাহাবাগণের ভুল বুঝা। এসব আলেমের বক্তব্য হলো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীসমূহ বুঝার ব্যাপারে সাহাবাগণের আদৌ ভুল হতে পারে না। যদি কোনো আলেম তাঁদের সম্পর্কে লিখে বা বলে যে, তারাও এরূপ ভুল করতে পারেন তাহলে তার গোমরাহ হওয়া অনিবার্য। আসল কথা হলো, জমিয়তের দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দ এবং ওলামায়ে ইসলাম যদি আমাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতেন তাহলে আমরা তাদেরকে অবশ্যই পরামর্শ দিতাম, বর্তমানে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ইসলামের যে ধারা অতিবাহিত হচ্ছে এবং দ্বীনে মুহাম্মদীর এখানে যে করুন অবস্থা, তার পরিপ্রেক্ষিতে সব সময়ের জন্যে অথবা অন্তত কিছু দিনের জন্যে এ ধরনের মতপার্থক্যের প্রচার পত্র বিলি করা থেকে বিরত থাকা উচিত যাতে করে যে যমীন ইসলামের পবিত্র নামে অর্জিত হয়েছে সেখানে ইসলামী পদ্ধতিতে জীবন যাপনের জন্যে অধিকতর যথোপযোগী হতে পারে এবং ইসলামী জীবন পদ্ধতির যা কিছু আশা ভরসা অবশিষ্ট আছে তাও একেবারে বিলুপ্ত হয়ে না যায়। আপনি স্বীকার করুন কিংবা না করুন, তবে একথা ধ্রুব সত্য যা মুহূর্তের তরেও একজন বিবেকবান লোক অস্বীকার করতে পারবে না যে, এ ধরনের কাঁদা ছোড়াছুড়িতে সামগ্রিকভাবে ইসলাম ও মুসলমান কারোই উপকার কানাকড়িও হয়নি; বরং অভূত ক্ষতি হয়েছে যা পূরণযোগ্য নহে। হ্যা, এতে কোনো কোনো সদস্য ও কর্মকর্তার কিছুটা ব্যক্তিগত স্বার্থ যে হয়নি এমন নয়। যেমন তার নেতৃত্বের আপেক্ষিক সম্প্রসারণ হওয়া অথবা তাদের প্রচার প্রোপাগান্ডার পরিধি বিস্তৃত হওয়া কিংবা কারো জীবিকার উপায় সৃষ্টি হওয়া। অথবা কোনো বরেণ্য ব্যক্তির দৃষ্টিতে তার মর্যাদা ও বিশ্বস্ততা বেড়ে যাওয়া। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে এ জাতীয় মতপার্থ্যকের পরিণামে ইসলাম কিংবা মুসলমানদের এতটুকু কল্যাণের পরিবর্তে ক্ষতিই হয়েছে বেশী। এ ধরনের মতবিরোধীতা একদিকে জনমহল

www.pathagar.com

অত্যন্ত ঘোলাটে হয়ে যায় এবং জনগণ বিভ্রান্ত ও হতভম্ব হয়ে পড়ে। কেননা উভয় পক্ষেই আলেমের উপস্থিতি। কার কথা তারা মানবে কার কথা মানবে না। কাকে তারা সত্য ও সনাতন মানবে কাকে গোমরাহ আর নির্বাচনে কাকে জিতাবে কাকে হারাবে। এ প্রশ্নে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে।

অপরদিকে এ ধরনের মতবিরোধের দরুন পাকিস্তানের ভূখন্ডে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সম্ভাবনাটুকুও শেষ হতে চলছে। আর তাতে ঐ শ্রেণীর লোকেরাই উপকৃত হচ্ছে যারা ইসলামকে জীবন বিধানরূপে এ দেশে ইসলামের আগমনকে অসহ্য মনে করছে। জমিয়তের দায়িত্বশীল আলেমগণ কাঁদা ছোড়াছুড়ির এই ঘৃণ্য তৎপরতা যদি ত্যাগ করতে কিংবা মুলতবী করতে একান্ত রাজী না হোন বরং টিকিয়ে রাখতে আগ্রহী হন, তাহলে তাদের জন্য অন্তত এতোটুকু সাবধানতা অবলম্বন করা অত্যন্ত জরুরী যে, ইলমী ও বিতর্কিত সমস্যাগুলো মঞ্চে বর্ণনা করার পূর্বে ঐসব সমস্যার তত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান সম্পন্ন আলেমদের নির্বাচন করা। কেননা জমিয়তের কাছে অভিজ্ঞ আলেমের তো আর কমতি নেই।

বাকী থাকল সেসব লোক যারা এসব বিষয়ে অপরিণত শিশু এবং সার্টিফিকেট প্রাপ্তির পর মঞ্চ আর সংবাদপত্র ছাড়া জীবনে কোনো কিতাব স্পর্শ পর্যন্ত করেনি তারা এরূপ বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করার আদৌ উপযুক্ত নয় এবং এ কাজ তাদের জন্যে যথার্থ হতে পারে না। তারা লিডার কিংবা এডিটর তো হতে পারেন কিন্তু আলেম নামে আদৌ চিহ্নিত হওয়ার যোগ্য নন। নেতৃত্ব ও সম্পাদনার কাজই তাদের শোভা পায়; ইলমী মাসায়েল নিয়ে মাথা ঘামানো তাদের কাজ নয়। বিশেষত বড় বড় জলসা ও সেমিনারে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ আলেমদের উপস্থিতিতে এসব ভদ্রলোকেরা ইলমী পুঁজিহীনতার দরুন দ্বীনি মাসায়েলের যখন ভুল বর্ণনা দিতে শুরু করেন তখন শুধুমাত্র জমিয়তের নয়; বরং গোটা আলেম সমাজের বদনাম ঘটে, মান–মর্যাদা বিঘ্নিত হয়। অথচ জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করাই এ সকল হুযুরদের দায়িত্ব। কিন্তু কার্যত এরাই প্রতিপক্ষের সকলকে ভর্ৎসনা আর গালিগালাজের আবর্জনায় নোংরা করতে ভীষণ তৎপর। এ সব হুযুরগণ আজ কাল আলোচ্য বিষয়ের উপর কথামালার যে ফুলঝুড়ি ছড়াচ্ছেন এবং ইলম ও ফজীলতের যে মনি–মুক্তা বিতরণ করেছেন সেদিকে তাকালে এ প্রত্যয় দৃঢ় হয় যে, হযরতগণ ঐসব সমস্যা সম্পর্কে একেবারে আনাড়ী অনভিজ্ঞ।

www.pathagar.com

সমস্যাগুলো সম্পর্কে চিন্তা মূলক কোনো ইলমের চর্চা তাদের আছে বলেও মনে হয় না। জিঘাংসা ও শত্রুতার আবেগে তারা এতোই উন্নত যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীতে মাওলানা মওদূদীর (র) মার্জিত গবেষণা ও ইলমী রায়ের উপর দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে সমালোচনা করার পরিবর্তে তাৎক্ষণিকভাবে কুফরী বা গোমরাহীর ফতওয়া জুড়ে দেন। তারা এতোটা অর্বাচীন যে, এ ধরনের মাসআলায় মতবিরোধ করলে বিরোধী মত পোষণকারীকে কাফের বা গোমরাহ ফতওয়া দেয়া যায় কিনা তাও জানেন না। এ বিষয় আমাদের বুযর্গগণ কি মত পোষণ করতেন এবং মাওলানা মওদূদীর (র) সাথে তাঁদের রায় মিলে যায় নিতো? সে কথাও তাদের জ্ঞানের আওতায় ধরা দেয় না।

নিম্নে আমরা আলোচ্য বিষয়ের তত্ত্বপূর্ণ চিত্র তুলে ধরছি যাতে উপরোল্লেখিত বক্তব্যের যথার্থতা ফুটে উঠে।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীসমূহ বুঝতে সাহাবাগণ ভুল করতে পারেন কি?

১৯৬৩ সনের অক্টোবর মাসের 'তর্জুমানুল কুরআন'-এ প্রকাশিত তাফহীমুল কুরআনের একটি নিবন্ধ থেকে এই প্রসংগটির অবতারণা করা হয়। কুরআনে হযরত সুলাইমান (আঃ) সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছেঃ

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ

"এবং সুলাইমানকেও আমি পরীক্ষার সম্মুখীন করেছি। তাঁর চেয়ারে একটি দেহ রেখে দিয়েছি। তার পর তিনি সেদিকে ঝুঁকে পড়েন।" (সূরা সাদ)

এই আয়াতে স্পষ্টত দু'টি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। এক, হযরত সুলাইমানকে (আঃ) বিপর্যয়ে ফেলা হয়। দুই, চেয়ারে একটি দেহ রাখা হয়। কুরআনে কিন্তু ফিতনার কোনো ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি যে, ফিতনার ধরন কি এবং চেয়ারে শরীর নিয়ে রেখে দেয়ার তাৎপর্যই বা কি! শরীর নিয়ে রেখে দেয়া তাঁর জন্যে কি ধরনের হুঁশিয়ারী ছিল যদ্দরুন তিনি তওবা করেন? সে বিষয়েও কোনো তথ্য উল্লেখ করা হয়নি। এসব সাম্ভাব্য প্রশ্নের জবাবে তাফসীরকারগণ যে চারটি নীতি গ্রহণ করেছেন মাওলানা মওদূদী (র) সেগুলো উল্লেখ করত তার প্রত্যেকটির পর্যালোচনা করেছেন। এ পর্যায়ে তৃতীয় দলের অনুসৃত নীতি ব্যক্ত করে তিনি লিখেছেনঃ

www.pathagar.com

"তৃতীয় দলের বক্তব্য হলো, একদিন সুলাইমান (আঃ) এইমর্মে কসম করেন–" আজ রাতে আমি আমার ৭০ জন স্ত্রীর সাথে মিলিত হবো এবং প্রত্যেকের গর্ভ থেকে একজন মুজাহিদ জন্মলাভ করবে।" কিন্তু তিনি একথা বলার সময় ইনশা আল্লাহ (আল্লাহ চাইলে) বলেননি। ফলে একজন মাত্র স্ত্রী গর্ভধারন করলেন এবং একটি অসম্পূর্ণ সন্তান প্রসব করেন। এই সন্তানটিকে ধাত্রী সুলাইমানের (আঃ) আসনে রেখে দেয়।"

এই নীতি সম্পর্কে মাওলানা (র) তো একথা স্বীকার করেছেন যে, কথাগুলো হযরত আবূ হোরাইরার (রাঃ) বর্ণিত হুযুরের একটি হাদীসের হুবহু বর্ণনা। হাদীসটি বুখারী–মুসলিমে কতিপয় সূত্রে বর্ণিত। সনদের দিক থেকে হাদীসটি জোরদার এবং এর সঠিকতা সম্পর্কে কোনো বিতর্ক করা যায় না। বুখারীর কয়েক জায়গায় এই হাদীসটি উল্লেখ হয়েছে একথাও মরহুম মাওলানা বলেছেন। সুতরাং মরহুম মাওলানার ভাষায়ঃ

"এই হাদীসটি হযরত আবূ হোরাইরা (রাঃ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। ইমাম বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন সূত্রে হাদীসটির উল্লেখ করেছেন। এসব গ্রন্থে স্ত্রীদের সংখ্যা ৬০, ৭০, ৯০, ৯৯, ১০০ ইত্যাকার বলা হয়েছে। সনদের দিক থেকে এগুলোর অধিকাংশের রেওয়ায়েত সবল, শক্তিশালী এবং এগুলোর সঠিকতার উপরও কোন কথা বলা যায় না।"

কিন্তু দেরায়েতের নিয়মের আওতায় মাওলানা (র) হাদীসের বিষয় বস্তুর উপর নিম্ন বর্ণিত পর্যালোচনা করেনঃ

"তবে হাদীসের বিষয়বস্তু মুক্ত বুদ্ধির খেলাফ। কেননা বিবেকের সুস্পষ্ট দাবী হল–যেভাবে কথাটি বর্ণিত হয়েছে নবী আলাইহিস সালাম সম্ভবত কথাটি আদৌ এভাবে বলেননি। বরং তিনি সম্ভবত কোনো ক্ষেত্রে ইহুদীদের অলীক কাহিনীর আলোচনা করতে গিয়ে উদাহরণ স্বরূপ একথা বলে থাকবেন। আর শ্রোতাগণ ভুল বশত ধরে নিলেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা নিজের পক্ষ থেকে সত্য ঘটনা হিসেবেই বর্ণনা করছেন। এ ধরনের রেওয়ায়েত শুধুমাত্র সনদের সঠিকতার উপর নির্ভর করে লোকদের অন্তরে বসানোর চেষ্টা করা দ্বীনকে হাস্যকর হিসাবে উপাস্থাপন করারই নামান্তর। প্রত্যেকেই হিসেব করে দেখতে পারে, শীতের

www.pathagar.com

দীর্ঘল রজনীতেও ই'শা থেকে ফজরের মধ্যবর্তী সময়ের পরিমাণ ১০/১১ ঘন্টার অধিক নয়। যদি স্ত্রীদের ন্যূনতম সংখ্যা ৬০ মেনে নেয়া হয় তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায়, হযরত সুলাইমান (আঃ) কোনো বিরতি ছাড়া সেরাতে প্রতি ঘন্টায় ৬ জন স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েছেন। এ হিসেবে তিনি ১০/১১ ঘন্টা অবিরতভাবে স্ত্রী সহবাসের করেন। এটা কার্যত সম্ভব কি? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন কথা ঘটনারূপে বর্ণনা করেছেন বলে আশা করা কি যথার্থ? অধিকন্তু হাদীসের কোথাও একথার উল্লেখ নেই যে, কুরআনে হযরত সুলাইমানের (আঃ) চেয়ারে যে দেহ রাখা হয়েছিল সেটা ছিল এই অপূর্ণাংগ শিশুরই দেহ। কাজেই, হুযূরের বর্ণিত ঘটনা এই আয়াতেরই তাফসীর স্বরূপ ছিল এমন দাবী করা যায় না। তাছাড়া এই শিশুর ভূমিষ্ট হওয়ায় হযরত সুলাইমানের (আঃ) ইস্তেগফার করা তো বুঝা যায়। কিন্তু ইস্তেগফারের সাথে "আমাকে এমন বাদশাহী দাও যা আমার পরে আর কারো জন্য যথার্থ নয়" এমন দোয়া করার অর্থ বোধগম্য নহে।

[তর্জুমানুল কুরআন খঃ ৬১ স-১, ১লা অক্টোবর ১৯৬৩]

মরহুম মাওলানা হাদীসের বিষয়বস্তুর ওপর যা কিছু পর্যালোচনা করেছেন সেটা এ ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ কর্তৃক অনুসৃত নীতির খেলাফ নয়। এমন অনেক হাদীসের খোঁজ পাওয়া যায় যেগুলো হাদীসবেত্তাগণের কাছে সনদের দিক থেকে সহীহরূপে স্বীকৃত। এতদসত্ত্বেও হাদীসের বিষয়বস্তু অকাট্য উক্তি কিংবা মুক্তজ্ঞানের সুস্পষ্ট বিরোধী হলে হাদীস বিশারদগণ সেগুলোর চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করে গ্রহণ যোগ্য না হওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। মাওলানার (র) এই পর্যালোচনার সাথে কারো একমত না হওয়া এবং হাদীসটিকে বিষয়বস্তু ও সনদ উভয় দিক থেকেই দৃঢ়ভাবে সহীহ বলার অধিকার তার আছে। কেননা একটি হাদীস একজন আলেমের দৃষ্টিতে বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিবেকের খেলাফ হওয়ার দরুন গ্রহণযোগ্য না হতে পারে। কিন্তু অপর একজন আলেমের দৃষ্টিতে সেটা উভয় দিক থেকেই সহীহ ও গ্রহণযোগ্য হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

কিন্তু "মরহুম মাওলানা (র) তাঁর এই পর্যালোচনা মূলক প্রবন্ধে হাদীসটির শ্রোতা সাহাবায়ে কিরামদের প্রতি ভুলের সম্পৃক্তি দ্বারা সাহাবীদের সাথে চরম বে-আদবী করেছেন, কাজেই মওদূদী (র) সাহেব গোমরাহ হয়ে গেছেন। আর নবীর বাণী বুঝতে সাহাবীগণ কখনো ভুল করতে পারেন না। এমন কথা

www.pathagar.com

যারা বলেন তারা সাংঘাতিকভুল করছেন এরূপ ধারনা করা প্রকৃতপক্ষে বাস্তবতার সম্পূর্ণ খেলাফ। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এসব বেচারাদের ঐসব মাসআলার তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা তো দূরের কথা সেগুলোর প্রাথমিক বিষয়েও তাদের অবগতি মাত্র নেই। নিম্নে আমরা বিষয়টির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা পেশ করতে চাই।

বিষয়াশ্রয়ী ব্যাখ্যা

ভুল বুঝার যতোগুলো সাম্ভাব্য দিক ও ধরন হতে পারে তার সবগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা করা বিষয়টির ব্যাখ্যার জন্য জরুরী যাতে করে এর তত্ত্ব অনুধাবনে জটিল তা না থাকে। তদুপরি অস্পষ্টতা মুক্ত হয়ে পাঠকের দিব্য দৃষ্টির সামনে সবদিক স্বচ্ছ হয়ে ফুটে উঠে।

ভুল বুঝার প্রকার

غلط فہمی (গলতফাহমী) শব্দের অর্থ বুঝতে ও অনুধাবন করতে ভুল করা। এর সাম্ভাব্য প্রকার তিনটি হতে পারেঃ

ইজতেহাদী ভুল বুঝা

প্রথম প্রকার ইজতেহাদী ভুল বুঝা এর অর্থ হলো-প্রমান হীন (গায়র মানসূস) ঘটনার জন্য শরঈ দলীল ও প্রমানভিত্তিক আহকামের আহলাকে ইজতিহাদ তথা চিন্তা-গবেষণার আশ্রয়ে হুকুম উদ্ভাবন করতঃ মনে করা যে, এটাই দলীল বিহীন বিষয়ের হুকুম, কিন্তু এ ধরনের উদ্ভাবনে কখনো ভুল হয়ে যাওয়া যেহেতু দলীল এবং প্রমানভিত্তিক আহকামের সূত্র ধরে হুকুম বের করা এবং তা বুঝার ক্ষেত্রে ভুল হয়ে থাকে, কাজেই এ জাতীয় ভ্রান্তি "ইজতেহাদী ভুল বুঝা" নামে পরিচিত। শরীয়তের আলেমগণ এর অপর নাম দিয়েছেন خطا فی الاجتہاد (ইজতিহাদে ভুল)। প্রত্যেক মুজতিয়াহিদ এ ধরনের ভুল করতে পারেন। কোনো মুজতাহিদই এরূপ ভুল করা থেকে মুক্ত ও পবিত্র নয়। এমনকি নবী-রসূলগণ পর্যন্ত যখন এরূপ ভুল থেকে নিরাপদ নয় তখন সাহাবী বা অপরাপর মুজতাহিদগণ এরূপ ভুল করা থেকে মাহফুজ থাকবেন কি করে? অবশ্য এটা স্বতন্ত্র যে, নবীগণ ছাড়া অন্যান্য মুজতাহিদগণ যেভাবে ইজতেহাদী ভুল বুঝার শিকার এবং তাঁরা সে ভুলেই থেকে যান কিন্তু নবীগণ এরূপ ভুল করলে সাথে সাথেই তাদেরকে সাবধান করে সে ভুল শোধরে দেয়া হতো যে, এই ইজতিহাদ আল্লার ইচ্ছার অনুকূল নয়। এতত্ত্বের ওপর

www.pathagar.com

সকল চিন্তাবিদ ও গবেষক আলেমগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন। এবং كل مجتهد يخطئ ويصيب (অর্থাৎ, প্রত্যেক মুজতাহিদ ভুল এবং শুদ্ধ করতে পারেন।) একথাটি তাঁদের স্বীকৃত নীতি হিসেবে গৃহীত হয়েছে। নীতিবান আলেমগণ একথাও সুস্পষ্টভাষায় স্বীকার করেছেন যে, ان النبي يخطئ في الاجتهاد ولكن لا يقر على الخطاء "অর্থাৎ ইজতিহাদে নবীও ভুল করতে পারেন, তবে ভুলের ওপর তাঁদেরকে অবস্থান করতে দেয়া হয়নি।"

একথার দলীল ও অধিক ব্যাখ্যা জানতে হলে উসূলে ফিকাহের প্রামান্য গ্রন্থ রাজি দেখা যেতে পারে। যথা–তাওযীহ, তালবীহ, মুসাল্লামুস সুবূত অথবা ইমাম শাতবী রচিত আলমওয়াফ্‌কাকাত, কিংবা আল্লামা তাফতাযানী কর্তৃক প্রণীত কালাম শাস্ত্রের উপর লিখিত 'শরহে আকাইদ' প্রভৃতি কিতাবগুলোতে ইজতিহাদের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ইচ্ছা হলে কেউ এ গুলো দেখে নিতে পারেন।

বক্তব্যের সারমর্ম অনুধাবন ভ্রান্তি

ভুল বুঝার এটা দ্বিতীয় প্রকার। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীর অর্থ ও তাৎপর্য ভুল বুঝলে তা এই ২য় প্রকারের আওতায় পড়ে। এ ধরনের ভুলও সাহাবা ও অন্যান্য মুজতাহিদগণ করতে পারেন। এথেকে তাঁরা মুক্ত নন। রেওয়ায়েত ও হাদীসে আহকাম সম্বলিত এর অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। সব উদাহরণের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া এই স্বল্প পরিসরের সম্ভব পর এবং উদ্দেশ্যও নয়। এর জন্যে প্রয়োজন বিরাট কিতাব, বিরাট দফতরের। কাজেই উদ্দেশ্য ও বিষয়ের ব্যাখ্যার জন্য কতিপয় উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে। তাতে এ সত্য উজ্জল ও স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, হুজুরের বাণী বুঝার ব্যাপারে সাহাবীগণেরও ভুল হতে পারে।

প্রথম উদাহরণ

ইমাম তাহাভী (র) 'মাআনির আসারে' বিভিন্ন সূত্রে কতিপয় সাহাবী থেকে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন প্রথম উদাহরণ হিসেবে সেটি করা হচ্ছে। হাদীসটির ভাষা এরূপঃ الماء من الماء। "বীর্যপাত হলেই গোসল করা ওয়াজিব হবে।"

www.pathagar.com

হাদীসটি কতিপয় সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত। তাঁদের মধ্যে আবূ সাঈদ খুদরী (র), যায়েদ বিন সাবিত (র), রিফাআহ বিন বিন রাফে (র), যোবাইর বিন আল আওয়াম (র), তালহা বিন ওবাইদুল্লাহ (র), আবূ আইউব আনসারী (র) প্রমুখ সাহাবীগণ রয়েছেন।

হাদীসের অর্থ ও সারমর্ম

শারে তথা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য সামনে রেখে উপরোক্ত কথা বলেছেন সেটা বুঝতে উপরোল্লেখিত সাহাবীগণ ভুলের শিকার হন। তাঁরা হাদীসের অর্থ এরূপ বুঝলেন, নিদ্রা ও জাগ্রত উভয় অবস্থাতে বীর্যপাত ঘটলে গোসল ওয়াজিব হবে, আর বীর্যপাত না হলে হবেনা। এর ওপর ভিত্তি করেই 'ইকসাল': التقاء الختانين অর্থাৎ পুরুসাংগ স্ত্রীর যোনীতে শুধুমাত্র ঢুকলে গোসল ওয়াজিব না হওয়ার অর্থই তাঁরা বুঝে নেন। কেননা একাজে তো আর বীর্যপাত হয়নি।

তাঁদের মতে হুকুমটি ইসলামের প্রাথমিক অবস্থার সাথে নির্ধারিত ছিলনা। বরং এটা এক সর্বকালীন বিধান। এই মাসআলা নিয়ে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে মত পার্থক্য যখন তীব্র হয়ে উঠলো এবং হযরত ওমরের (র) শাসনামলে প্রসংগটি আহালতী মামলা হিসাবে তাঁর সামনে দায়ের করা হল; তখন আদালতে জনাকীর্ণ সমাবেশে সকল আনসার সমর্থক বলে উঠলেনঃ "বীর্যপাত না হলে শুধুমাত্র উভয় লিংগের প্রবেশের কারণে গোসল কখনো ওয়াজিব হতে পারে না।" বিপরীতে হযরত আলী (র) এবং হযরত মুয়ায (র) বললেনঃ উভয় লিংগের শুধুমাত্র প্রবেশের কারণে গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়।

قال على بالناس فاتفق الناس ان الماء لا يكون الا من الماء - الا ما
كان من على ومعاذ فقالا اذا جاوز الختان الختان فقد وجب
الغسل (طحاوی، ج ۱ ص ۳۱)-

আনসারগণ উক্ত হাদীসের যে অর্থ ও তাৎপর্য বুঝেছেন রসূলের এ বাণীর অর্থ আদৌ এটা ছিলনা। নিদ্রাবস্থায় কেউ সহবাস ও স্ত্রীসংগম করার কথা দৃঢ়ভাবে অনুভব করা সত্ত্বেও জাগ্রত হয়ে কাপড় বা শরীরে বীর্যপাতের আলামত বা চিহ্ন না পেলে তার ওপর গোসল ওয়াজিব হবে না, পেলে ওয়াজিব হবে। রসূলের এই বিশেষ বাণী ছিল নিদ্রাবস্থার একটি বিশেষ ক্ষেত্রের জন্য। এ সম্পর্কে ইমাম তাহাভীর (র) ভাষ্য নিম্নরূপঃ

www.pathagar.com

ما فيه ذكر الماء من الماء فان ابن عباس قد روي عنه

في ذالك ان مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم

به قد كان غير ما حمله عليه اهل المقالة الاولى-

"গোসল ওয়াজিব হওয়ার হুকুম বীর্যপাত হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত এ মর্মে বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে ইবনে আববাস (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তির উদ্দেশ্য প্রথম মত পোষণকারী তথা আনসারদের অনুরূপ ছিলনা। বরং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল অন্য কিছু।"

তারপর তিনি স্বীয় দাবীর সমর্থনে ইবনে আব্বাসের (র) নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করেনঃ

عن ابن عباس قال ان قوله عليه السلام الماء من الماء انما

ذالك في الاحتلام اذا رأى انه يجامع ثم لم ينزل فلا غسل

عليه اه (طحاوي ج ١ ص ٣٠)

"হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ الماء من الماء- রসূলের এই বাণী নির্দেশ স্বপ্নযোগে বীর্যপাত হলে প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ নিদ্রাবস্থায় কেউ সংগম করার কথা অনুভব করলো, কিন্তু আসলে তার বীর্যস্খলন হল না, এমতাবস্থায় গোসল করা তার ওপর ওয়াজিব হবে না।" (তাহাবী, ১ম খন্ড, ৩০ পৃঃ)

অথবা অধিকাংশ মুহাদ্দিস রসূলের (সাঃ) উক্ত বাণী যে তাৎপর্য গ্রহণ করেছেন তাহলো–হুকুমটি ছিল ইসলামের প্রথম যুগের জন্যে নির্দিষ্ট। যখন সাহাবীগণ ছিলেন একেবারে নিঃস্ব বস্ত্রের ছিল তীব্র অভাব; স্বামী–স্ত্রী এক বিছানায় রাত্রিবাস করলে তাতে উভয়ের লিংগ প্রবেশ হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। এ অবস্থায় গোসল ওয়াজিব হওয়ার নির্দেশ দেয়া হলে তা পালন করা সাহাবীদের কষ্টকর ব্যাপার ছিল। কাজেই এহেন বিশেষ পরিস্থিতে রাসূল (সাঃ) তাঁদেরকে সাময়িক অবকাশ দিয়ে ইরশাদ করলেন–অর্থাৎ বীর্যপাত ব্যতীত শুধুমাত্র লিংগের অংশ বিশেষ প্রবেশ করার দরুনই গোসল ওয়াজিব হবেনা। কিন্তু পরে যখন দারিদ্র মোচন হয়ে অবস্থার উন্নতি হয়, তখন এই অবকাশেরও অবসান ঘটে, পূর্বের হুকুম রহিত হয়ে যায় এবং এরূপ কাজের

www.pathagar.com

জন্য গোসল ওয়াজিব হওয়ার হুকুম দেয়া হয়।" এ ক্ষেত্রে নিম্ন বর্ণিত রেওয়ায়েতটি প্রণিধানযোগ্যঃ

عن ابى بن كعب قال انما كان الماء من الماء رخصة فى
اول الاسلام ثم نهى عن ذلك وامر بالغسل - وفى رواية
عنه انما كان الماء من الماء فى اول الاسلام فلما احكم
الله الامر نهى عنه - اه طحاوى ، ج ١ ص ٣٠ ،

"হযরত ওবাই বিন কাআব বলেন, রাসূলুল্লার الماء من الماء হাদীসটি ইসলামের প্রথম যুগের অন্তবর্তীকালীন হুকুম ছিল। পরবর্তীতে সে হুকুম রহিত হয়ে গোসল ওয়াজিব করা হয়। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, এই হুকুম ছিল ইসলামের প্রথম যুগের। আল্লাহ তায়ালা দীনকে মজবুত করে দিলে এই হুকুম রহিত হয়ে যায়" (তাহাবী, ১ম খন্ড, ৩০ পৃঃ)

মোটকথা উভয় অবস্থাতেই الماء من الماء হাদীস দ্বারা রাসূলের সে উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য অবশ্যই ছিলনা আনসারদের এক বিরাট জামাআত যা মনে করেছিলেন। বরং তাঁর (সাঃ) উদ্দেশ্য ছিল ভিন্নতর। এখন বলুনঃ সাহাবা কিরামের এক বিরাট অংশের রাসূলুল্লার বাণী বুঝার ব্যাপারে ভুল হয়েছিল কি হয়নি? ইমাম তাহাভী (র) নিজে তাদের এই ভুল বুঝার কথা স্বীকার করেছেন কি করেননি? যদি জবাব ইতিবাচক হয় আর হবে অবশ্যই, তাহলে যে সকল আলেম ও মুহাদ্দিস সাহাবীদের প্রতি ভুলের সম্পৃক্তি করেছেন মাওলানা মওদূদীর (র) ন্যায় তারা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট প্রমানিত হবেন কি হবেন না? বলুন। আর যদি তাঁরা গোমরাহ প্রমানিত না হয়, তাহলে হযরত আবূ হোরাইরার (র) প্রতি ভুলের সম্পর্ক নির্দেশ করার অপরাধে বেচারা মওদূদীই কি একা রয়ে গেলেন পথহারা-গোমরাহ হওয়ার জন্যে? এই অন্যায়-অযৌক্তিক ব্যবধানের সপক্ষে কোন দলীল থাকলে সামনে আনা হোক।

দ্বিতীয় উদাহরণ

কিবলাকে সামনে ও পিছনে করে প্রস্রাব ও পায়খানা করা সম্পর্কিত হাদীসটি দ্বিতীয় উদাহরণ হিসেবে পেশ করা যায়। এ সম্পর্কে হুযুরের বাণী নিম্নরূপঃ

www.pathagar.com

اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول
ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا۔

"মদীনাবাসীগণ। তোমরা কিবলাকে সামনে করে এবং পশ্চাৎদিকে রেখে পায়খানা প্রস্রাব করোনা। বরং তোমরা পূর্ব বা পশ্চিমমুখী হয়ে বসো।"

(বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ)"

হাদীসটি হযরত আবূ আইউব আনসারী (র) কর্তৃক বর্ণিত। এতে নির্দেশটি ঘরে ও উন্মুক্ত জায়গা উভয়স্থানের কিংবা শুধুমাত্র উন্মুক্তস্থানের বেলায় প্রযোজ্য কিনা সেকথা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। এমনিভাবে হাদীস দ্বারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য সম্পর্কেও সুস্পষ্টরূপে কিছু জানা যায়নি। কাজেই সাহাবীগণ নিজেদের বুদ্ধি-বিবেক মতো হাদীসটির উদ্দেশ্য নিরূপন করার চেষ্টা করেছেন। এ পর্যায়ের হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (র) হুযুরের হাদীস দ্বারা এটাই বুঝেছেন যে, হুকুমটি উন্মুক্ত জায়গা এবং ঘর সর্ব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বরং খোলা জায়গায় প্রস্রাব-পায়খানা করার সময় কিবলা সামনে বা পিছন করে না বসার জন্য নির্দেশ দেওয়াই রাসূলের উদ্দেশ্য। বাকী রইলো ঘরে বা বাথরূমের কথা। চতুর্দিক আড়াল করা জায়গায় কিবলাহমুখী হয়ে পায়খানা প্রস্রাব করা জায়েয এবং কিবলাকে পিছন দিয়ে বসাও জায়েয। অনুরূপ মানুষ ও কিবলার মাঝখানে কোনো বস্তুর আড়াল থাকলে তখন খোলা জায়গায়ও কিবলাকে সামনে করে কিংবা পিছনে রেখে প্রস্রাব পায়খানা করা দুরস্ত। তাঁর এ মতের সমর্থনে নিম্ন বর্ণিত রেওয়ায়েত উল্লেখ করা যায়ঃ

عن مروان الاصفر قال رأيت ابن عمر اناخ راحلته
مستقبل القبلة ثم جلس يبول اليها فقلت يا ابا
عبد الرحمن اليس قد نهى عن هذا قال بلى انما نهى
عن ذالك فى الفضاء فاذا كان بينك وبين القبلة شيئ
يسترك فلا بأس به ، (ابوداؤد)

মারওয়ান আসফার (র) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি ইবনে ওমরকে (রা) দেখলাম তিনি তার বাহন বসিয়ে দিয়ে নিজে কিবলাহ মুখী হয়ে প্রস্রাব করলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম-এভাবে প্রস্রাব করা নিষিদ্ধ

www.pathagar.com

নয় কি? তিনি বললেন, এই নিষিদ্ধ খোলা জায়গার জন্যে যেখানে লোক এবং কিবলার মধ্যে পর্দা স্বরূপ কোনো আড়াল না থাকে। পর্দাস্বরূপ আড়াল থাকলে কিবলাহমুখী হয়ে প্রস্রাব পায়খানা করাতে কোনো দোষ নেই। (আবূ দাউদ)

এই হাদীস দ্বারা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আবূ আইউব (র) কর্তৃক বর্ণিত হুযুরের নিষিদধ হাদীসের তাৎপর্য হযরত ইবনে ওমর (র) যা বুঝেছিলেন তাহলো, হাদীসের নিষেদ কেবলমাত্র খোলা জায়গায় যেখানে কিবলাহ থেকে আড়াল হওয়ার কিছু নেই। অথচ হাদীসের রাবী আবূ আইউব (র) স্বয়ং খোলা ও অখোলা উভয় স্থানের জন্যে এর নিষেধ প্রযোজ্য করতেন। সুতরাং সিরিয়া এসেও তিনি স্বমতে অটল ছিলেন। চতুর্দিক পর্দা করা জায়গায়ও তিনি কিবলামুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করেননি। তাঁর সে মত আবূ দাউদের ভাষায়ঃ

فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل
القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله - (ابوداود)

"আবূ আইউব বলেছেন, আমরা সিরিয়ায় পৌছে সেখানকার পায়খানাগুলো কিবলামুখী করে তৈরী দেখতে পেলাম। আমরা পেশাব পায়খানার সময় কেবলামুখী হওয়া থেকে যথা সম্ভব বিরত থাকতাম। তদুপরি কিছুটা কেবলামুখী হয়ে গেলে তজ্জন্য আল্লার কাছে মাগফিরাত কামনা করতাম।" (আবূ দাউদ)

এই উভয় অর্থের মধ্যে হানাফী আলেমগণ হযরত আবূ আইউবের (র) গৃহীত অর্থই গ্রহণ করেছেন। ইবনে ওমরের (র) অর্থকে তাঁরা ভুল বলেছেন।

এবার মেহেরবানী করে বলুন, আপনাদের মতে হুযুরের বাণী বুঝতে সাহাবীগণের ভুল হয়েছে কি হয়নি? আপনারা নিজেরা এই ভুল স্বীকার করেন কি করেন না? আপনাদের মতে হযরত ইবনে ওমরের (র) গৃহীত অর্থ যদি হুযুরের বাণীর উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয় তাহলে আবূ আইউবের (র) গৃহীত অর্থকে ভুল বলতে হবে। আর হযরত আবূ আইউব আনসারীর (র) গৃহীত অর্থ শুদ্ধ হলে ইবনে ওমরের (র) গৃহীত অর্থকে ভুল বলতে হবে। এমতাবস্থায় আপনারাও তো মাওলানা মওদূদীর (র) ন্যায় গোমরাহীর বাণে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যান। শুধু কি আপনারা এর ফলে বরং গোটা হানাফী

www.pathagar.com

আলেম সমাজ গোমরাহ হতে বাধ্য। কেননা তাঁদের সকলের ধারনা, হাদীসটির সঠিক অর্থ উদ্ধারে ইবনে ওমর (র) ভুলের শিকার হয়েছিলেন।

আপনাদের অবস্থা-

فما لكم تبنون قصرا وتهدمون مصرا ؟ وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ؟

কথায় বলেঃ "নগর ধসিয়ে মহল নির্মাণ আর অজানা বিষয়ে বাক্যবান" তুল্য। যা আপন মতে বিন্দু, অথচ আল্লার কাছে প্রচন্ড।)

তৃতীয় উদাহরণ [স্থান পরিবর্তনের ইখতিয়ার প্রসংগ]

"ক্রেতা ও বিক্রেতার ইখতিয়ার সম্পর্কে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا। অর্থাৎ, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই একে অপর থেকে পৃথক না হওয়া পর্যন্ত কেনা-বেচার ব্যাপারে তাদের স্বাধীনতা থাকবে।"

হাদীসটি ইবনে ওমর (র) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীসে ব্যবহৃত خيار শব্দটির দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, স্থানের ইখতিয়ার خيار مجلس দুই, গ্রহণের ইখতিয়ার خيار قبول হাদীসের অর্থ হলো-ক্রেতা ও বিক্রেতা যদিও বেচা-কেনার কথা বার্তা চূড়ান্ত করে ফেলে তবুও যেস্থানে বসে কথা বার্তা চূড়ান্ত হয়েছে সে স্থান উভয়ের ত্যাগ না করা পর্যন্ত তাদের ইখতিয়ার অবশিষ্ট থাকবে এবং সে স্থানে বসেই প্রত্যেকেই অপরের সম্মতি ব্যতীত চুক্তিপত্র বাতিল করতে পারবে। এ মর্মে تفرق শব্দের অর্থ হবে শারীরিক ভাবে পৃথক বা আগল হয়ে যাওয়া দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করার ইখতিয়ারের তাৎপর্য হলো-ক্রেতা ও বিক্রেতার যে কেউ প্রস্তাব উত্থাপন করার পর দ্বিতীয় জনের কবুল বা গ্রহণ করার ইখতিয়ার থাকা। অর্থাৎ প্রস্তাব করার পর কবুল বা গ্রহণ না করা পর্যন্ত চুক্তিপত্র বাতিল করার স্বাধীনতা থাকবে। এ অর্থে تفرق শব্দের উদ্দেশ্য হবে কথায় পৃথক বা আগল হওয়া। আবার এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, خيار দ্বারা উদ্দেশ্য কবুল করা আর تفرق এর অর্থ হলো শারীরিকভাবে পৃথক হয়ে যাওয়া। তখন হাদীসের তাৎপর্য হবে-মজলিশ (বেচা-কেনার স্থান) থেকে পৃথক না হওয়া পর্যন্ত গ্রহণ করার ইখতিয়ার দীর্ঘায়িত হবে। তবে خيار

www.pathagar.com

দ্বারা কবুল করার ইখতিয়ার উদ্দেশ্য হলে হাদীসের তাৎপর্য হবে একজনের প্রস্তাবনার জবাব দেয়া দ্বিতীয় জনের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। বরং দ্বিতীয় জনের ইচ্ছা করলে গ্রহণ করতে পারে আবার নাকচও করে দিতে পারে।" দ্বিতীয় জনের এই ইখতিয়ার মজলিস ভংগ হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

আমাদের হানাফী আলেমগণ হাদীসটি দ্বিতীয় মতের ওপর প্রয়োগ করে দাবী করেছেন যে, হাদীস দ্বারা হুযুরের উদ্দেশ্য শুধু শেষটিই। প্রথম ধারনা ও অর্থ হুযুরের আদৌ উদ্দেশ্য নয়। এ কারণেই তারা বলেন, ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে একবার চুক্তিপত্র হয়ে গেলে মজলিশের ইখতিয়ার আর কারো জন্যই অবশিষ্ট থাকবে না।

শাফেঈ মতাবলম্বীদের দাবী হলো, হাদীস দ্বারা হুযুরের উদ্দেশ্য শুধু প্রথম অর্থ দ্বিতীয় অর্থ আদৌ নয়। একারণেই তারা বলেন, ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে বেচা-কেনার কথা চূড়ান্ত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আলোচনার বৈঠক বসে থাকা অবস্থায় উভয় ইচ্ছা করলে কেনা-বেচার পূর্ব সিদ্ধান্ত বাতিল করতে পারবে। এই ইচ্ছার নামই হলো خيار مجلس তথা-বৈঠকে অধিকার।

শাফেঈগণ তাঁদের মতের সমর্থনে হাদীসটির রাবী আবদুল্লাহ বিন ওমরের (রা) কাজ ও বুঝ উভয়কেই দলীলরূপে পেশ করেন। তিনি হাদীসে ব্যবহৃত خيار শব্দটি বৈঠকের خيار এবং تفرق শব্দটিকে শারীরিকা পৃথক হওয়ার কথা বলেছেন। কাজেই তাদের মতে হাদীটির তাৎপর্য দাঁড়ায় ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে বেচা-কেনার কথা পাকা হওয়া সত্ত্বেও বৈঠক থেকে পৃথক হয়ে উঠে না যাওয়া পর্যন্ত চুক্তি বাতিল করার অধিকার উভয়ের বহাল থাকে। কথা ইমাম তিরমিযীর (র) ভাষায়

والقول الاول اصح لان ابن عمر هو روى عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم وهو اعلم بمعنى ما روى ـ اه

"অর্থাৎ প্রথম অর্থ خيار مجلس এবং تفرق بالابدان অধিকার সহীহ, কেননা ইবনে ওমরই (র) এই হাদীসটি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। আর নিজের বর্ণিত হাদীসের যথার্ত অপরের তুলনায় তিনিই বেশী জানা স্বাভাবিক।

অধিকন্তু ইবনে ওমরের (র) কাজও এরূপ ছিল। যখনই তিনি কারো সাথে বেচা-কেনার চুক্তি করতেন তখন কথা চূড়ান্ত করার পর বৈঠক থেকে

www.pathagar.com

দাঁড়িয়ে পৃথক হয়ে যেতেন, যাতে করে خيار مجلس এর সূত্র ধরে চুক্তিপত্র বাতিল বা ভংগ করার কোনো অবকাশ না থাকে। ইমাম তিরমিযী (র) এ প্রসংগে বলেছেনঃ

وكان ابن عمر اذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له اه
وروى عنه انه كان اذا اراد ان يوجب البيع مشى ليجب
له ـ اه (ترمذى، ج ١ ص ١٥٠)

ইবনে ওমর (রা) যখন বসে কারো সাথে বেচা–কেনার কথা চূড়ান্ত করতেন তখন (চুক্তি করার পর) দাঁড়িয়ে যেতেন যাতে চুক্তিটি অপরিহার্য ও কার্যকর হয়ে যায়। আবার এরূপও বর্ণিত আছে যে, চুক্তিটি দৃঢ় ও কার্যকর করার ইচ্ছা করলে চুক্তি হওয়ার পর তিনি বৈঠক থেকে উঠে চলে যেতেন। যাতে চুক্তি ভংগ করার কোনো অবকাশ না থাকে।
(তিরমিযী, ১ম খন্ড, ১৫০ পৃষ্ঠা)

কিন্তু আমরা হানাফী মতাবলম্বীগণ কখনো উপরোক্ত অর্থ ও তাৎপর্য স্বীকার করিনা। আমাদের মতে خيار এর অর্থ কবুল করার خيار আর تفرق এর অর্থ আলোচনা থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া।

এবার আপনাদের মতো আলেম ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্বের কাছে আমাদের জিজ্ঞাস্য, ইবনে ওমর (রা) কি হুযুরের হাদীস বুঝতে ভুল করেছেন অথবা করেননি? যদি ভুল করে থাকেন এবং আমরা হানাফীগণ সকলেই তা অকপটে স্বীকার করি তাহলে ইবনে ওমরের (রা) প্রতি ভুল হওয়ার কথা সম্পৃক্ত করাতে হানাফী আলেমগণ সম্পর্কে আপনাদের মহৎ অভিমত কি হবে? তাতে কি গোমরাহ হওয়ার ফতওয়াটি বুমেরাং হয়ে আপনাদের উপরই বর্তাবে না? যদি তাই হয় তাহলে আপনারা নিজেরাই গোমরাহ হয়ে অপরকে গোমরাহ বলার অধিকার আপনারা কোথায় পেলেন? এরূপ অভিমত পোষণ করার দরুন যদি আপনারা গোমরাহ না হোন তাহলে মরহুম মাওলানা মওদূদীকে আবূ হোরাইরার (রা) প্রতি ভুল করার কথা সম্পৃক্ত করাতে গোমরাহ বলবেন কোন যুক্তিতে? فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا "হায়....) এদের কি হয়ে গেল–এরাতো কথাই বুঝতে চায় না।"

আর যদি বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রা) হাদীসের যে অর্থ ও মর্মার্থ বুঝেছেন সেটাই ঠিক ও যথার্থ। হাদীসের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য বুঝতে তাঁর

www.pathagar.com

কোনো ভুল হয়নি তাহলে আপনারা হাদীসের যে অর্থ ও তাৎপর্য বুঝেছেন তার বুনিয়াদ কি? هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين- (অর্থাৎ, "তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে এর প্রমাণ উপস্থিত কর।"

নবীর কথা শুনতে ভুল করা

ভুল বুঝার দ্বিতীয় প্রকারের কথা আলোচনা করা হলো। এই প্রকার ভুল হওয়ার তিনটি উদাহরণ উপরে বর্ণিত হয়েছে। ভুল বুঝার তৃতীয় প্রকারের কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই। নবীর কথা শ্রবণ করার ব্যাপারে ভুল বুঝা হলো তৃতীয় প্রকারের অন্তর্গত। এর তাৎপর্য হলো—রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী ভালোভাবে শুনার ব্যাপারে ভুল বুঝা। শ্রোতা মনে করছেন তিনি যা শুনেছেন তার সবটুকুই হুযুরের বাণী অথচ সবটাই হুজুরের বাণী নয় বরং কিয়দংশ তাঁর বাণী। এ ধরনের ভুল বুঝার প্রকৃতি এরূপও হতে পারে যে, একজন সাহাবী একটি বাণী শুনে বাণীটি রসূলের মুখ নিঃসৃত বলে ধারণা করলেন অথচ বাণীটি অন্য কারো। এ সম্পর্কে কোনো কারণে শ্রোতা সাহাবীর মনে সন্দেহ দেখা দিলেও তিনি পরিশেষে এটাকে রাসূলের বাণীরূপেই মূল্যায়ণ করলেন। সাহাবীগণ শ্রবণ করার ক্ষেত্রে এরূপ দু'ধরনের ভুল করতে পারেন। তাঁরা এথেকে নিরাপদও নন। নিম্নে উভয় প্রকার ভুলের উদাহরণ পেশ করা হলো।

প্রথম প্রকারের উদাহরণ
[দু'ঈদের একত্রিত হওয়া প্রসংগ]

এ ক্ষেত্রে দু'ঈদ একত্রিত হওয়ার মাসআলাটি পেশ করা যায়। এ প্রসংগে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি বাণী শ্রবণ করতে গিয়ে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রাঃ) ভুল করে বসলেন। আর এই ভুলের উপর ভিত্তি করেই তাঁরা দু'ঈদ একত্রিত হওয়ার মাসআলায় জমহুরে সাহাবীর খেলাফ নিজেদের ভিন্ন মত কায়েম করেন। এ ক্ষেত্রে নিজস্ব মতকে তাঁরা রসূলের প্রদর্শিত মত ও সুন্নত বলেই বিশ্বাস করতেন।

ব্যাপার হ'ল'–ঘটনাক্রমে একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে জুমআর দিনে ঈদ এসে যায়। মদীনায়ে মুনাওয়ারার শহরতলী ও গ্রাম থেকে যারা মদীনায় ঈদের নামায পড়তে আসেন তাদের উপর জুমআ ফরয

www.pathagar.com

ছিল না পরন্তু যুহরের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করাও ছিল তাদের জন্যে খুবই কষ্টদায়ক। এ কারণে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু গ্রাম ও শহরতলীবাসীদেরকে অবকাশ ও অনুমতি দিয়ে বললেনঃ

قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء اجزأه من
الجمعة وانا مجمعون - (اخرجه ابوداود من رواية ابي هريرة رض)

"আজ তোমাদের জন্যে দু'টি ঈদের সমাবেশ ঘটেছে। কেউ ইচ্ছা করলে জুমআর পরিবর্তে শুধু ঈদের নামায আদায় করে বিদায় নিতে পারে। (জুমআ না পড়লেও তার চলবে) অবশ্য আমরা জুমআও আদায় করবো।"

(আবূ দাউদ)

যায়েদ বিন আরকামের বর্ণনা নিম্নরূপঃ

عن اياس بن ابي رملة الشامي قال شهدت معاوية
بن ابي سفيان وهو يسأل زيد بن ارقم قال اشهدت مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟
قال نعم قال فكيف صنع؟ قال انه صلى العيد ثم رخص
في الجمعة فقال من شاء ان يصلي فليصل - (ابوداود)

"আয়াস বিন আবূ রামলাহ (র) বলেন, আমি হযরত মুআবিয়ার (রা) খেদমতে হাজির হলাম। তখন তিনি যায়েদ বিন আরকামকে হুযুরের যামানায় একই দিনে দু'টি ঈদ একত্রিত হতে দেখেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করছিলেন। যায়েদ উত্তরে বললেনঃ হ্যাঁ। হযরত মুআবিয়া (রা) জিজ্ঞাসা করলেনঃ রসূলুল্লাহ সেদিন কিভাবে কি কি করতেন? তিনি বললেনঃ হুযুর ঈদের নামায পড়িয়ে দিয়ে জুমআ সম্পর্কে বললেনঃ যে ইচ্ছা কর সে জুমআর নামায পড় আর যে যেতে চাও সে চলে যেতে পারে।" (আবূ দাউদ)

ইমাম শাফেঈ (র) 'কিতাবুল উম' গ্রন্থে ওমর বিন আবদুল আযীয (র) থেকে এই রেওয়ায়েতটি মুরসাল হিসেবে উল্লেখ করেছেনঃ

عن عمر بن عبد العزيز قال اجتمع عيدان على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من احب ان

www.pathagar.com

يجلس من اهل العالية فليجلس من غير حرج - اه

ওমর বিন আবদুল আযীয (র) বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের যমানায় দু'টি ঈদ একত্রিত হয়। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, শহরতলী থেকে যারা এসেছেন তারা জুমআর সময় হওয়া পর্যন্ত ইচ্ছা করলে সানন্দে অপেক্ষা করতে পারেন। আর যারা চলে যেতে চায় তাতে কোনো ক্ষতি নেই।

ইমাম শাফেঈ (র) হযরত ওসমান (রাঃ) থেকে মওকুফ হিসেবে রেওয়ায়েত করেনঃ

عن ابي عبيد مولى ابن ازهر قال شهدت مع عثمان بن
عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب فقال انه قد اجتمع
لكم في يومكم هذا عيدان فمن احب من اهل العالية
ان ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن احب ان يرجع فليرجع - اه

"আবূ ওবাইদ (রাঃ) বলেন, একবার আমি হযরত ওসমানের (রাঃ) সাথে ঈদের নামাযে হাযির হলাম। তিনি এসে ঈদের নামায পড়িয়ে খোৎবায় বললেনঃ আজকে দু'টি ঈদ একত্রিত হয়েছে। শহরের উপকণ্ঠ থেকে আগত লোকগণ ইচ্ছা করলে জুমআর জন্যে অপেক্ষা করতে পারে আর যারা নিজ নিজ পাড়াস্থ বা মহল্লায় ফিরে যেতে চায় তারা চলে যেতে পারে।"

(বযলুল মজহূদ, ২য় খন্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা)

হাদীসের মূল শব্দাবলী কি?

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদের মূল শব্দাবলী কি তা আমাদের জানা নেই। হযরত আবূ হোরাইরা (রাঃ) ও যায়েদ বিন আরকামের (রাঃ) মাধ্যমে মরফূ হিসেবে আবূ দাউদ (র) যেভাবে উল্লেখ করেছেন এটাই হাদীসের মূল শব্দাবলী অথবা হযরত ওসমান (রাঃ) এবং ওমর বিন আবদুল আযীযের (র) বরাতে 'কিতাবুল উম' গ্রন্থে ইমাম শাফেঈ (র) মুরসাল ও মওকূফরূপে যা বর্ণনা করেছেন সেটাই হাদীসের আসল শব্দ সমষ্টি।

মওকূফ ও মুরসাল রেওয়ায়েত যেগুলো হযরত ওসমান (রাঃ) ও ওমর বিন আবদুল আযীযের (র) বরাতে বর্ণিত হয়েছে, যদি সেগুলো মূল শব্দাবলী হয়, তাহলে আবূ হোরাইরা (রাঃ) ও যায়েদ বিন আরকাম (রাঃ) হুযুরের

www.pathagar.com

হাদীস শুনতে ভুল করেছেন একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। কেননা মূল বাণীতে রয়েছে من اهل العالية কিন্তু এ মূল বাক্য তাঁরা শুনেননি, বরং তাঁরা ধারনা করলেন, আমরা যা শুনেছি এটাই হুযূরের বাণী। অর্থাৎ من شاء اجزأه من الجمعة. অথবা من شاء ان يصلي فليصل- এই বাক্যদ্বয়ই রাসূলের মূল কথা। এ কারণেই তাঁরা এ বাক্যের ভিত্তিতে গ্রামবাসী ও শহরবাসী সকলের জন্যেই ঈদের দিনের জুমআ পড়া বা না পড়ার অবকাশ দেয়ার পক্ষপাতী। একইভাবে আবদুল্লাহ বিন যোবাইর (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হুযূরের বাণী শুনতে ভুলের শিকার হয়েছেন। তাঁরা উভয়ই শ্রুত বাণীর ভিত্তিতে শহরবাসীদের জন্য ঈদের দিনের জুমআ ত্যাগ করা জায়েয মনে করতেন। তাঁরা নিজেরাও এরূপ আমল করতেন। আবূ দাউদে আতা বিন আবূ রিবাহ সূত্রে ইবনে যুবাইর (রাঃ) সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছেঃ

عن عطاء ابن ابي رباح قال صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد
في يوم جمعة اول النهار ثم رحنا الى الجمعة فلم يخرج
الينا فصلينا وحدانا ـ وكان ابن عباس بالطائف فلما
قدم ذكرنا له ذالك فقال اصاب السنة ـ

"আতা বিন আবূ রিবাহ বলেন, আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রাঃ) আমাদেরকে জুমআর দিন ঈদের নামায পড়ালেন দিনের প্রথম অংশে। দ্বিপ্রহরের পর জুমআর নামায পড়ার জন্যে পুনরায় আমরা তার কাছে গেলাম। কিন্তু তিনি ঘর থেকেই বের হলেন না। সুতরাং আমরা আলাদা আলাদা হয়ে পড়ে নিলাম। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) সে সময় তায়েফ ছিলেন। তিনি তায়েফ থেকে আসার পর আমরা তাঁর কাছে ইবনে যুবায়েরের (রাঃ) ঘটনা ব্যক্ত করলাম। তিনি বললেনঃ ইবনে যুবাইর (রাঃ) সুন্নত অনুযায়ী কাজ করেছেন।" (আবূ দাউদ, ১ম খন্ড, ১৫৩ পৃঃ)

কিন্তু যায়েদ বিন আরকাম এবং আবূ হোরাইরা সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়েত উল্লেখিত শব্দাবলীকে যদি হাদীসের মূল শব্দ বা বাক্য ধরে নেয়া হয়, তাহলে হযরত ওসমান (রাঃ) ও ওমর বিন আবদুল আযীযের (র) বর্ণিত বাক্য من اهل العالية হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীর অর্থ ও তাৎপর্যের ব্যাখ্যাস্বরূপ। আর তাতে একথা বলা উদ্দেশ্য হবে যে, হুজুর

www.pathagar.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদিও শব্দগুলো ব্যাপকার্থে প্রয়োগ করেছেন কিন্তু তাতে কেবলমাত্র গ্রাম ও শহরতলীবাসীদেরকে জুমআর নামায থেকে অব্যাহতি দেয়াই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। মদীনাবাসী এবং সাধারণ শহরবাসী উদ্দেশ্য ছিল না। (انا مُجَمِّعُوْنَ) হাদীসের এই বাক্যাংশ একথার সুস্পষ্ট ইংগীত বৈকি।

এ অবস্থায় যায়েদ বিন আরকাম (রাঃ) আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রাঃ), ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই তিনজন সাহাবীর হুজুরের বাণীর অর্থ ও তাৎপর্য বুঝতে ভুল হয়ে থাকবে। কেননা তাঁরা হাদীসটিকে সাধারণভাবে সুযোগদানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। অথচ হাদীসের তাৎপর্য এবং হুজুরের উদ্দেশ্য এটা ছিল না। বরং গ্রামবাসী ও শহরের উপকণ্ঠে বসবাসকারীদেরকে অবকাশ দেয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। যাহোক, উভয় অবস্থাতেই উপরোক্ত সাহাবীগণ কোনো না কোনোভাবে অবশ্যই ভুল করেছেন। আর এই ভুল কোনো সময় হয় শ্রবণে আবার কোনো সময় হয় হাদীসের অর্থ ও মর্মার্থ বুঝার ব্যাপারে।

কাজেই মরহুম মাওলানা মওদূদী (র) সাহেবের প্রতিপক্ষ হযরতগণের একথা আদৌ ঠিক নয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ নিঃসৃত বাণী হাদীস শ্রবণ কিংবা হাদীসের অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝার ব্যাপারে সাহাবীগণের ভুল হতে পারে না।

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহীর (র) ব্যাখ্যা

অবিভক্ত ভারতের প্রখ্যাত আলেম শাইখুল মাশায়েখ হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহীর (র) সুস্পষ্ট মত হলো–এ ঘটনায় ইবনে আববাস (র) ও ইবনে যুবাইর (র) উভয়ই হুজুরের বাণী বুঝতে ভুল করেছেন। তাঁরা রসূলের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বুঝতে পারেননি। اصاب السنة ইবনে আব্বাসের উক্তি ও ইবনে যুবাইরের আমলের জবাবে তিনি লিখেছেনঃ

واما ابن عباس وابن الزبير فكانا اذ ذاك صغيرين غير
انهما سمعا المنادى والنداء (من شاء منكم ان يصلى
فليصل ومن شاء الرجوع فليرجع) باذ انهما وان لم
يفهما ما اريد به فاخر ابن الزبير صلوة العيد وقدم
الجمعة - اهـ (بحواله بذل المجهود، ج ٢، ص ١٧٣)

www.pathagar.com

"ইবনে আব্বাস ও ইবনে যুবাইর সে সময় ছিলেন বয়সে ছোট। তবে তাঁরা হুজূরের নিয়োগকৃত ঘোষকদের কথা নিজ কানে শুনেছেন। ঘোষণাটি হলো– من شاء ان يصلي فليصل ومن شاء الرجوع فليرجع (অর্থাৎ, তোমাদের যার ইচ্ছা নামায পড়ুক, যার মন চায় চলে যাক।) কিন্তু তারা উভয়ই নবীর কথার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য বুঝতে পারেননি। এ জন্যে ইবনে যুবাইর (রাঃ) ঈদের নামায কিছুটা দেরীতে পড়তেন এবং জুমআর নামায কিছুটা আগে এনে উভয় নামায একত্রে পড়তেন।"

ولما كان ابن عباس سمع باذنه ما نودي به في ذالك
الوقت قال فيه انه اصاب السنة اي ما سمعته من النبي صلى
الله عليه وسلم من قوله من شاء فليصل .. انتهى

ইবনে আব্বাসও (রাঃ) যেহেতু ঘোষকের কথা নিজ কানে শুনেছিলেন সুতরাং তিনি ইবনে যুবাইরের (রাঃ) কাজ সুন্নত মুতাবিক হয়েছে বলে মন্তব্য করেন। অর্থাৎ আমি হাদীস যেভাবে শুনেছি তিনি সেভাবে কাজ করেছেন। নবীর বাণী হলোঃ من شاء فليصل (অর্থাৎ, যার ইচ্ছা নামাজ পড়ুক, যার ইচ্ছা চলে যাক।)

(বজলুল মজহূদ, ১ম খন্ড, ১৭৩ পৃষ্ঠা)

এবার বলুন, উপরোক্ত বাক্যে হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (র) ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও ইবনে যুবাইর (রাঃ) সম্পর্কে فلم يفهما ما اريد به তারা উভয়ই হাদীসের তাৎপর্য বুঝতে পারেননি একথা বলেছেন কি বলেননি? অথচ হাদীসের উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র পল্লী ও শহরতলী বাসীদেরকে অবকাশ দেয়া। মদীনার নগরবাসীরা এর আওতাভুক্ত ছিল না।

এবার অভিযোগকারী হুযুরদের পাক দরবারে আমার জিজ্ঞাসা, সাহাবীদের প্রতি "ভুল বুঝার" সম্পৃক্ত করা যদি গোমরাহী হয় আর যে কেউ এরূপ সম্বোধন করার ফলে মাওলানা মওদূদীর (র) ন্যায় গোমরাহ হতে বাধ্য, তাহলে শাইখুল মাশায়েখ হযরত রশীদ আহমদ গাংগুহী (র) সম্পর্কে আপনাদের সুউচ্চ রায়ের মূল্যায়ণ কিভাবে করবেন! কেননা তিনিও তো উপরোক্ত ব্যাখ্যায় একাধিক সাহাবীদের প্রতি ভুলের সম্পৃক্তি করে আপনাদের দৃষ্টিতে ভয়ানক অপরাধে অপরাধী! প্রসঙ্গত কবির ছন্দ এ ক্ষেত্রে মানায় ভাল, বেজায় মানান সইঃ

www.pathagar.com

جو تیری زلف میں آئی تو حسن کہلائی
وہ تیرگی جو مرے نامۂ سیاہ میں ہے

"আমার চরিত্রের মলিনতা তোমার দৃষ্টিতে পড়লে তা স্বচ্ছ বিমল হয়ে যায়।"

উপরন্তু এ প্রসঙ্গেই তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীঃ

من قال لاخيه كافر فقد باء بها احدهما ان كان كما قال
والا رجعت عليه (مسلم)

"কাফের ফতওয়াবাজী করলে ফতওয়া প্রাপ্ত ব্যক্তি যদি প্রকৃতপক্ষে কাফের না হয় তাহলে ফতওয়া দাতার উপর সে কুফরী প্রত্যাবর্তন করবে।" (মুসলিম)

কাউকে গোমরাহ ফতওয়া দেয়ার ব্যাপারেও একই পরিণতি হবে। অর্থাৎ, লোকটি বাস্তবে গোমরাহ না হলে ফতওয়াবাজীর বেসাতীতে লিপ্ত ব্যক্তিই গোমরাহ হওয়ার কলংক বহন করবে। সত্য কথা হলো, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে দ্বীন-ইসলামের মুক্তা আহরণ ও বহন করে গোটা মুসলিম জাতির নিকট যথাযথ পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে সম্মানিত সাহাবীগণের ভূমিকা যদিও পূত পবিত্র মাধ্যম স্বরূপ, কুরআন-হাদীসে উল্লেখ হয়েছে তাঁদের অগণিত প্রশংসা ও স্তুতি, তবুও তাঁরা মানব সুলভ দুর্বলতা থেকে মুক্ত নন এবং মানবীয় প্রয়োজনীয়তা থেকেও তাঁরা ছিলেন না নিষ্কৃতি প্রাপ্ত। বুঝতে ভুল করা মানবসুলভ দুর্বলতা। এই দুর্বলতা থেকে মানব নামক জীব আদৌ মুক্ত থাকতে পারে না। তবে যাদের মুক্ত থাকার দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন তাঁদের কথা স্বতন্ত্র।

পরিপূর্ণ কথা শ্রবণ অথবা কথার উদ্দেশ্য বুঝার ব্যাপারে সাহাবীগণ যে ভুল করেছেন তার উদাহরণ ও ব্যাখ্যা হলো উপরোক্ত বর্ণনা। শ্রুত কথা প্রকৃতপক্ষে নবীর নয় বরং অন্য কারো কিন্তু সন্দেহ হওয়ার কারণে সাহাবীগণ শ্রুত কথা রসূলের প্রতি সম্পৃক্ত করেই বর্ণনা করেন। সাহাবীগণের এমন ভুল হওয়ার উপমা নিম্নে পেশ করা হলো।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ
[تلك الغرانيق العلى لا قصة এর কাহিনী]

তাফসীরকারগণ বিভিন্নসূত্রে ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক তাবেঈ ও মুফাসসির ইমামের মাধ্যমে এই কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কাহিনীটি হলো—মক্কী জীবনে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার সূরায়ে নাজম পাঠ করলেন। যখন তিনি اَفَرَأَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى وَمَنٰتَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى (আচ্ছা, তোমরা কি লাত, ওয্যা এবং তৃতীয় একটি মানাতের অবস্থার প্রতিও লক্ষ্য করেছ?)

এতোটুকু পর্যন্ত পৌছলেন তখন শ্রোতাগণ যেনো এ বাক্যও শুনলেন تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى (অর্থাৎ, এরা সেই উর্ধ জগতের উপাস্যপাখী, যাদের সুফারিশ আশা করা যায়)

কাহিনীটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে কিছু সূত্র যঈফ আর কতিপয় সূত্র সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজর আসকালানীর ন্যায় হাদীস বেত্তার ব্যাখ্যা হলোঃ

وقد ذكرت ان ثلثة اسانيد منها على شرط الصحيح و
هى مراسيل يحتج بالمرسل من يحتج به وكذا من لا يحتج به
لاعتضاد بعضها ببعض - اه

"আমি প্রথমেই উল্লেখ করেছি রেওয়ায়েতটির তিনটি সনদ সহীহ হওয়ার শর্তের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। এই সনদগুলো মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও যেসব লোক এ ধরনের সনদকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেন তারা তো করেনই আর যারা গ্রহণ করেন না তাদের কাছেও দলীল হওয়ার যোগ্য। কেননা অধিক সূত্র থাকার দরুন হাদীসটিতে শক্তির সঞ্চার হয়েছে।"

সনদটির যঈফ সূত্রগুলো সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজর (র) বলেনঃ

لكن كثرة الطرق تدل على ان للقصة اصلا (فتح البارى ج ٨ ص ٣٥٥)

(কিন্তু ইহার সূত্রসমূহ অধিক হওয়া দ্বারা ইহাই প্রমাণ হয় যে, কাহিনীটা ভিত্তিহীন নয়।) [ফতহুল বারী ৮ম খন্ড, ৩৫৫ পৃষ্ঠা]

www.pathagar.com

আলেমদের উক্তি সমূহ

কাহিনীটির কতিপয় সূত্রের বাক্য নিম্নরূপঃ

عن سعيد بن جبير قال قرأ رسول الله صلى الله عليه
وسلم بمكة والنجم فلما بلغ افرأيتم اللات والعزى
ومنات الثالثة الاخرى - القى الشيطان على لسانه تلك
الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى (فتح الباري، ج ٨ ص ٣٥٥)

(অর্থাৎ, হযরত সাঈদ বিন জুবাইর (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মক্কায় থাকাবস্থায় একবার সূরা 'নজম' তিলাওয়াত করেন। যখন তিনি افرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الاخرى পর্যন্ত পৌছলেন, তখন শয়তান তাঁর কিরাআতে تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى বাক্যের মিশ্রণ ঘটিয়ে দেয় এবং এ বাক্যটি উপস্থিত সাহাবীগণ শুনতে পান।) (ফতহুলবারী, ৮ম খন্ড, ৩৫৫ পৃষ্ঠা)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষার উপর শয়তানের হস্তক্ষেপ করার কথা স্বীকার করা ইসমতে আম্বিয়া নীতির সুস্পষ্ট খেলাফ। এ কারণে বিষয়টি নিয়ে আলেমগণ মতপার্থক্য করেছেন। কেউ তো কাহিনীকে আদৌ স্বীকার করেননি। কিসসাটিকে তাঁরা কাল্পনিক ভিত্তিহীন ও সার্বৈব মিথ্যা বলেছেন। যথা–কাযী আয়ায মালেকী এবং মুহাম্মদ বিন ইসহাক প্রমুখ। অপরাপর আলেমগণ মূল কাহিনীকে সঠিক হিসেবে গ্রহণ করতঃ শয়তানী প্রভাবের বিভিন্ন ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। এ মতের স্বপক্ষে আছেন হাফেজ ইবনে হাজর, ইমাম তাবারী, ইবনে আরাবী প্রমুখ আলেমগণ।

প্রথম ব্যাখ্যা

প্রথম ব্যাখ্যা দেয়া হয় এভাবে—কথাগুলো হযূরের মুখ থেকে নিদ্রা ও তন্দ্রাবস্থায় বের হয়ে আসে। সে সময় তিনি ছিলেন অবচেতন। অতপর আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এ বিষয়ে সতর্ক করে দেন। এ মত প্রকাশ করেছেন কাতাদাহ (রাঃ)। তাঁর ভাষায়ঃ

جرى ذالك على لسانه حين اصابته سنة وهو لا يشعر
فلما علم بذالك احكم الله اياته - اه

www.pathagar.com

"হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অজান্তে তন্দ্রাবস্থায় তাঁর মুখ থেকে বাক্যটি বের হয়ে যায়। যখন তিনি এ সম্পর্কে জানলেন তখন আল্লাহ তায়ালা সেসব কথা ছাটাই করে দিয়ে আয়াতটিকে মুহকাম করে দেন।" (ফতহুল বারী, ১ম খন্ড, ৩৫৫ পৃষ্ঠা)

কিন্তু কাযী আয়ায এ ব্যাখ্যা রদ করে দেন। صرح به الحافظ ابن حجر في الفتح۔ আর ইবনে হজর ফতহুল বারীতে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা

কথাগুলো মুশরিকরা প্রত্যেক জায়গায় অযীফার ন্যায় আওড়াতো, তাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্মৃতিতেও কথাগুলো এসে যায়। যখন তিনি সূরায়ে নাজমের উপরোক্ত আয়াত গুলো পাঠ করেন। তখন ভুলক্রমে সে কথাগুলোও তাঁর মুখ থেকে বের হয়ে আসে। যথাঃ

وقيل ان المشركين كانوا اذا ذكروا آلهتهم وصفوهم
بذالك فعلق ذالك بحفظه صلى الله عليه وسلم فجرى
على لسانه لما ذكرهم سهواً - اه

কেউ বলেন, মুশরিকরা যখন নিজেদের দেব-দেবীদের স্মরণ করতো তখন তারা এসব কথায় দেবতাদের গুণ কির্তন করতো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্মৃতি শক্তিতেও একথাগুলো অংকুরিত হয়ে যায়। তিনি যখন উপরোক্ত আয়াত পড়লেন তখন তাঁর স্মৃতি থেকে সে কথাগুলো ভুল ক্রমে বের হয়ে পড়ে।" এ ব্যাখ্যাও যুক্তিসহ প্রত্যাখাত হয়।

(ফতহুল বারী)

তৃতীয় ব্যাখ্যা

কুরআনের আয়াত থেমে থেমে পড়াই ছিল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিত্য অভ্যাস। এতে করে তাঁর কেরাত ও তিলাওয়াতে ছন্দের পতন ঘটতো এবং পঠনে বিরতি এসে যেতো। একসময় তিনি افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى এখানে এসে যখন কিছুক্ষণের জন্যে থামলেন ঠিক এই বিরতির সময় শয়তান ঐ কথাগুলো হুজুরের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য ধ্বনিতে আওড়ালো। ফলে, শয়তানের আওড়ানো বুলিগুলো স্বয়ং হুজুরের মুখ নিঃসৃত

www.pathagar.com

বাণী বলে কাছাকাছি লোকগণ ভুল করে বসলেন। এরূপ ভুলের ওপর ভিত্তি করেই শ্রোতা সাহাবীগণ কথাগুলো হুজুরের বাণী বলে প্রচার করলেন এবং কথাগুলো রাসূলের বাণীরূপে খ্যাতি লাভ করলো। এটা ছিল রাসূলের ওপর শয়তানের একটি জোচ্চুরী। ইমাম তাবারী, ইবনুল আরাবী, ইবনে হাজর প্রমুখ মনীষীগণ এ ব্যাখ্যা পছন্দ করেছেন এবং এটাকে সুদৃষ্টিতে দেখেছেন।

وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتل القرآن فارتصده الشيطان في سكتة من سكتاته ونطق تلك الكلمات محاكيا نغمته بحيث سمعها من دنى اليه فظنها من قوله واشاعها اھ وهذا احسن الوجوه. وكذا استحسنه ابن العربي وقال قبله ان هذه الآية نص في مذهبنا في براءة النبي صلى الله عليه وسلم مما نسب اليه فاخبر تعالى في هذه الآية ان سنته في رسله اذا قالوا قولا زاد الشيطان فيه من قبل نفسه

فهذا نص في ان الشيطان زاده في قول النبي صلى الله عليه وسلم قاله. قال وقد سبق الى ذالك الطبرى لجلالة قدره وسعة علمه وشدة ساعده في النظر فصوب على هذا المعنى اھ (فتح الباري، ج ٨، ص ٣٥٥)

বলা হয়, হুজুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধীরে ধীরে কুরআন তিলাওয়াত করার সময় শয়তান তাঁর 'সেকতার' (কিছুক্ষণের জন্যে থমকে যাওয়া) অপেক্ষায় থাকতো। তিনি যে মাত্র একটু থামলেন আর অমনি শয়তান হুজুরের সাদৃশ্য আওয়াযে ঐ কথাগুলো পড়ে ফেললো। হুজুরের কাছে বসা লোকগণ একথাগুলোও হুজুরের মুখ নিঃসৃত বাণী ধারণা করে সেগুলোকে হাদীস হিসেবেই প্রচার করেন। এটাই সবার বেশী পসন্দণীয় ব্যাখ্যা। ইবনে আরাবীও এ ব্যাখ্যা পসন্দ করেছেন। ইতিপূর্বে তিনি বলেছেন আয়াতটি আমাদের মাযহাবের দলীল। হুজুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া

www.pathagar.com

সাল্লামের প্রতি যেসব অশোভন কথার সম্বোধন করা হয়েছে তা থেকে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্ত ও স্বাধীন একথার প্রমাণ হলো এই আয়াতটি। কেননা আয়াতটিতে আল্লাহ্ তায়ালা এ কথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, নবী-রসূলগণের ব্যাপারে তাঁর নীতি হলো তার নবীগণ কিছু বললে শয়তান তার নিজের পক্ষ থেকে কিছু অতিরিক্ত কথা বাড়িয়ে দেয়।

এতে প্রতীয়মাণ হলো যে, উল্লেখিত বাক্য শয়তানের নিজস্ব বানানো কথা, আদৌ হুজুরের কথা নয়। ইবনে আরাবী একথাও বলেছেন, ইমাম তাবারী (র) সর্ব প্রথম এই ব্যাখ্যার কথা উল্লেখ করেছেন। কেননা কুরআন-হাদীসের জ্ঞানের প্রসারতা, যুক্তির অকাট্যতা ও দূরদর্শীতার দিক থেকে তিনি ছিলেন অনন্য ও অসাধারণ। সুতরাং তাঁর বর্ণিত অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে।" (ফতহুল বারী, ৮ম খন্ড, ৩৫৫ পৃষ্ঠা)

কাহিনীটি ভুল কি নির্ভুল কিংবা কাহিনীটিকে নির্ভুল প্রমাণ করার প্রয়াসে যেসব ব্যাখ্যার অবতারণা করা হয়েছে সেগুলোর কোনটি গ্রহণযোগ্য আর কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য নয় এ সময়ে এ আলোচনা করা দুষ্কর। আমাদের উদ্দেশ্য শুধু এটা দেখানো যে, কাহিনীটি নির্ভুল হওয়ার সমর্থক আলেমগণ যেসব ব্যাখ্যা পেশ করেছেন সংকীর্ণমনা কোনো অসৎ প্রকৃতির লোক ইচ্ছা করলে সেগুলোর মধ্য থেকে কুফরী ফতওয়াবাজী করার মাল মসল্লা অনায়াসে বের করতে পারে এবং ইসলামের প্রথম যুগের শীর্ষ স্থাণীয় আলেম ও বুযর্গদেরকে ইসলামের গন্ডী থেকে বের করে দূরে নিক্ষেপ করতে পারে। অথবা তাঁদেরকে অন্তত গোমরাহীর বাণে তো আহত করা যাবেই। কেননা, এসব বুযর্গ নবীর প্রতি এমন কথা সম্পৃক্ত করেছেন যাতে মূর্তি ও দেব-দেবীর প্রশংসাসূচক কথা স্বয়ং নবীর মুখ দিয়ে স্বেচ্ছায় বের হয়ে পড়ে। (মায়াযাল্লাহ্) কিংবা নবীর উপর শয়তানের হস্তক্ষেপ করার ধৃষ্টতা প্রমাণ হয়। এ ধরনের সম্পৃক্তি বাহ্যত কোনো মামুলী অপরাধ নয়। কিন্তু এগুলোকে কেন্দ্র করে কেউ কখনো তাঁদেরকে কুফরী বা গোমরাহ হওয়ার ফতওয়া দিয়েছেন এমন প্রমাণ নেই। বরং দলীলের ভিত্তিতে একথার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এগুলোকে রদ করা হয়েছে।

কিন্তু আজকের গোড়ামীমনা অসৎ প্রকৃতির লোকেরা সাহাবায়ে কিরামদের প্রতি শুধুমাত্র ভুল বুঝার সম্পৃক্তি শুনে গোমরাহ হওয়ার অস্ত্র নিয়ে তেড়ে আসে। অথচ এদের এতোটুকু জ্ঞান নেই যে, সম্মানিত সাহাবীদের প্রতি ভুল

www.pathagar.com

বুঝার সম্পৃক্তি কোনো অপরাধ নয়, শরীয়তের সীমাও তাতে লংঘিত হয় না এবং এরূপ তৎপরতা সাহাবীর প্রতি অবজ্ঞা বা বে-আদবীর পর্যায় ভুক্তও নয়।

উপরোল্লেখিত কাহিনীতে আমরা লক্ষ্য করেছি, কাহিনীটির নির্ভুলতা প্রমাণ করার জন্যে যেসব ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে তন্মধ্যে অনেক অভিজ্ঞ আলেমের পসন্দনীয় ব্যাখ্যা বলা হয়েছে, تلك الغرانيق شفاعتهن لترتجى এই বাক্য হুজুরের তিলাওয়াতের মাঝখানে ক্ষনিকের জন্যে থমকে যাওয়ার (সিকতাহ্) সুযোগে শয়তান নবীর হুবহু সাদৃশ্য ধ্বণিতে আয়াতের সাথে অলক্ষে তার বাক্যটি যোগ করে দেয়। হুজুরের কাছে বসা সাহাবীগণ এ বাক্যটিও হুজুরের বাণী বলে ভ্রম করে তা প্রচার করে দেন। অভিজ্ঞ আলেমদের এ ব্যাখ্যায় সাহাবীদের ভুল বুঝা প্রসংগটি দিবালোকের ন্যায় প্রমাণিত। কিন্তু এ ভুলের কারণে তাদেরকে গোমরাহ বলার ধৃষ্ঠতা কেউ দেখাতে পারে কি?

সাহাবীদের প্রতি ভুল বুঝা সম্বোধন করার আরো একটি উপমা

দেওবন্দের উর্ধতন বুযর্গদের সান্নিধ্য প্রাপ্ত, শীর্ষ স্থানীয় আলেমদের অন্যতম, জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের এককালীন জেনারেল সেক্রেটারী হযরত মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেব (র) তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'কাসাসুল কুরআন' এর তৃতীয় খন্ডে প্রসংগটি উল্লেখ করেছেন।

এ বিষয় তাঁর বর্ণিত মত এবং মরহুম মাওলানা মওদূদীর (র) অনুসৃত মতের মধ্যে কেশাগ্র পরিমাণ পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। এতদসত্ত্বেও মরহুম হিফজুর রহমান সাহেবের বর্ণিত রায়ের উপর মরহুম মাওলানা মওদূদী সাহেবের মতের ন্যায় চুল-চেরা সমালোচনা করার দুঃসাহস আজ পর্যন্ত কেউ করেনি। আমরা বুঝতে পারছি না যে, একই মাসআলায় একই মত ওলামায়ে কিরামদের জামায়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো হযরতের পক্ষ থেকে পেশ করা হলে তার ভূয়সী প্রশংসা করা হয়, অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী বিশেষণে তাকে ভূষিত করা হয় এবং চমকপ্রদ ভাষায় তাকে অভিনন্দন দেয়া হয়। কিন্তু অনুরূপ মত অনুরূপ মাসআলায় এমন একজন আলেমের কথা ও কলমে জনসমক্ষে প্রকাশ পেলে তাঁকে কখনো গোমরাহ কখনো সাহাবীর প্রতি অশ্রদ্ধাশীল, কখনো বে-আদব, বে-তমীয আবার কখনো গোমরাহকারী বিশেষণে আখ্যায়িত করা হয়। কারণ এ লোকটি ঐ সব আলেমের জামায়াতের

www.pathagar.com

সাথে সম্পৃক্ত নন কিংবা রাজনীতিতে ভিন্ন মতাবলম্বী অথবা কতিপয় খুটিনাটি ব্যাপারে তাদের সাথে একমত নয়। পরিশেষে এমন নীতি সম্পর্কে এ ছাড়া আর কিইবা বলা যেতে পারে যে, বর্তমান যুগের বিশেষ প্রকৃতির আলেমদের অনুভূতি এমন নাযুকতা ও তেজী ভাব ধারণ করেছে যে, ছোটখাটো ও রাজনৈতিক ব্যাপারে তাদের থেকে ভিন্নমনা আলেমদেরকে এ সকল হুজুরদের পক্ষে সহ্য করা কঠিন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাঁদেরকে যে অধিকার দিয়েছেন সেটাও তারা দিতে প্রস্তুত নয়। ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام নিশ্চয়ই তোমাদের জান, তোমাদের মাল, তোমাদের ইজ্জত-আব্রু নষ্ট করা তোমাদের উপর হারাম করা হলো।

মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উপরোক্ত হাদীসটির তাৎপর্য এ সকল হযরতেরা কি বুঝেছেন তাও আমাদের বোধগম্য নয়। এ প্রসঙ্গে মরহুম মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেবের রায় নিম্নে পেশ করা হলোঃ

আসহাবেকাহাফ

কুরআনে সুরায়ে কাহাফে 'আসহাবে কাহাফ' এবং রাকীমের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আসহাবে কাহাফ এবং আসহাবে রাকীম দুটি আলাদা ব্যক্তিত্ব আর কুরআনে কেবলমাত্র আসহাবে কাহাফের ঘটনা বিবৃত হয়েছে; সে ঘটনার সাথে আসহাবে রাকীমের কোনোই সম্পর্ক নেই অথবা ঘটনা দু'টো এক ও অভিন্ন এবং কুরআনে বর্ণিত ঘটনা দু'টো ঘটনাকে কেন্দ্র করেই বিবৃত হয়েছে, এসব কথায় আলেমগণ মত পার্থক্য করেছেন। জমহুরের মতে দু'টি ঘটনা এক ও অভিন্ন; কুরআনেই দু'টো ঘটনার কথাই বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হজরের (র) ভাষ্য-

وقال قوم اخبر الله عن قصة اصحاب الكهف ولم يخبر عن
قصة اصحاب الرقيم (قلت) وليس كذالك بل السياق يقتضى
ان يكون اصحاب الكهف هم اصحاب الرقيم -الخ

"একদল লোক বলেছেন আল্লাহ আসহাবে কাহাফের কাহিনী বর্ণনা করেছেনঃ আসহাবে রাকীমের কথা বলেননি। আমি বলি একথা সঠিক নয়। বরং কুরআনের পূর্বাপরের দাবী অনুযায়ী আসহাবে কাহাফ ও আসহাবে রাকীম একই হওয়া উচিত।" (ফতহুল বারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৯৩ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

অপরদিকে ইমাম বুখারীর (র) মতে দুটো ঘটনা ভিন্ন ও আলাদা। কুরআনে কেবলমাত্র আসহাবে কাহাফের ঘটনাই বিবৃত হয়েছে। আর 'আসহাবে রাকীম' বলতে বনি ইসরাঈলের সেই তিন জন সাথীর কথা বুঝায় যারা পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া পাথর দ্বারা গুহার মুখ বন্ধ হওয়ায় গুহাবন্দী হয়ে পড়ে। ইমাম বুখারী (রঃ) 'হাদীসুল গার'–এ এই কাহিনীটির কথা বর্ণনা করেছেন। 'কাসাসুল কুরআন' এর রচয়িতা মরহুম মাওলানা হিফজুর রহমান আলেমদের এই মত পার্থক্যের কথা আলোচনা প্রসংগে ইমাম বুখারীর (র) উপরোক্ত রায় পেশ করতে গিয়ে লিখেছেনঃ

"ইমাম বুখারী (রঃ) তাঁর রচিত 'সহীহ বুখারী'তে আসহাবে কাহাফের উপরও একটি পরিচ্ছেদ কায়েম করেছেন। কিন্তু উপরোক্ত ঘটনা (আসহাবে কাহাফের ঘটনা) সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ হাদীস (হাদীসটি মরহুম গ্রন্থকার আগেই উল্লেখ করেছেন) তাঁর শর্তানুযায়ী প্রমাণিত নয়। এ কারণে তিনি সূরায়ে কাহাফের আয়াতের আলোচ্য বিষয়ের তাফসীর ঐ হাদীসের মাধ্যমে করেননি। অবশ্য তিনি বনি ইসরাঈলের অপর একটি ঘটনাকে—যা হাদীসুল গার শিরোনামে উল্লেখিত—সামনে রেখে এটা বুঝলেন যে, 'আসহাবে কাহাফ' এবং 'আসহাবে রাকীম' দুটি আলাদা সত্তা। 'আসহাবে রাকীম' তাঁরা যাদের কথা 'হাদীসুল গার'–এ উল্লেখ করা হয়েছে। এর উপর ভিত্তি করেই তিনি হাদীসুল গারকে আসহাবে রাকীমের তাফসীরে উল্লেখ করেছেন।" (কাসাস ৩ খন্ড , ২৯৩ পৃষ্ঠা)

হাদীসুল গার সম্পর্কে স্ববিস্তারে বর্ণনা করার পর মরহুম মাওলানা বলেছেনঃ

"এই রেওয়ায়েতের ব্যাখ্যায় ইবনে হজর (র) লিখেছেন, বাযযার (র) ও তিবরানী (র) হাসান সনদসহ নোমান বিন বশীর থেকে ঠিক এই রেওয়ায়েতটিকেই (হাদীসুল গার) উল্লেখ করেছেন। এতে অতিরিক্ত কথা এতোটুকু যে, নোমান বিন বশীর বলেছেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 'রাকীম' শব্দের উল্লেখসহ গুহাবন্দী লোকদের কাহিনী বর্ণনা করাতে শুনেছি। সম্ভবত এর উপর ভিত্তি করেই ইমাম বুখারী 'রাকীম' এর ব্যাখ্যায় হাদীসে গারের রেওয়ায়েত করেছেন।"

(ফতহুল বারী ৬ খন্ড, হাদীসুল গার)

www.pathagar.com

উপরোল্লেখিত আলোচনার সারাংশ

উপরোক্ত আলোচনার উপর চিন্তা করলে তিনটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

একঃ 'আসহাবে কাহাফ' এবং 'আসহাবে রাকীম' অভিন্ন সত্ত্বা নাকি আলাদা দু'টি ঘটনা এ নিয়ে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। ইমাম বুখারী (র) বলেছেন দুটি ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ আলাদা। কুরআনে আসহাবে কাহাফের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। আর বনী ইসাঈলের তিনজন বুযর্গকে কেন্দ্র করে যে ঘটনা তা হলো 'আসহাবে রাকীম'। তিনি একথা হাদীসুল গারে উল্লেখ করেছেন।

দুইঃ ইমাম বুখারীর (র) এ মতের ভিত্তি হলো হাদীসে গারের অতিরিক্ত বর্ণনা যা বাযযার (র) এবং ইমাম তিবরানী (র) হাসান সনদসহ নোমান বিন বশীর থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। নোমান বলেছেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 'রাকীম' উল্লেখ করতঃ গুহাবন্দী তিনজন লোকের ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছি।

তিনঃ ইমাম বুখারী (র) অতিরিক্ত অংশের দ্বারা একথা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনী ইসরাঈলের তিনজন লোকের ঘটনা শুনানোর সময় 'রাকীম' শব্দের উল্লেখ করেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, হুজুর 'আসহাবে রাকীম' এর তাফসীর স্বরূপ বনী ইসরাঈলের তিনজন ব্যক্তির ঘটনা ব্যক্ত করেছেন। আর নোমান বিন বশীরও এরূপ বুঝেছেন।

সমালোচনা

ইমাম বুখারী (র) এবং নোমান বিন বশীরের গৃহীত এই মতের ওপর মরহুম হিফজুর রহমান সাহেব চার কারণে সমালোচনা করেছেন।

অতপর তাদের মত ভুল এবং দলীল সঠিক নয় বলে তিনি লিখেছেনঃ

(১) "কিন্তু বিগত আলোচনায় কুরআন, কতিপয় আসারে সাহাবী এবং ইতিহাস দ্বারা যখন প্রমাণিত হলো যে, 'আসহাবে কাহাফ পাহাড়ের যে গুহায় অদৃশ্য হয়ে যায় সে জায়গা বা শহরের নাম 'রাকীম'। তাহলে মসনদে বাযযার এবং মুজামে তিবরানী বর্ণিত অস্পষ্ট শব্দাবলীর দ্বারা আসহাবে কাহাফকে আসহাবে রাকীম থেকে আলাদা মনে করা ঠিক নয়। (২) বিশেষ করে

www.pathagar.com

নোমানের রেওয়ায়েতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসহাবে রাকীমের কথা বলতে গিয়ে আসহাবে কাহাফের ঘটনার কথাও ব্যক্ত করার সম্ভাবনা যখন বর্তমান আছে এবং পরবর্তীতে রাবীর (নোমান) ভুলক্রমে এরূপ বুঝা যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে গারের ঘটনা প্রকৃতপক্ষে আসহাবে রাকীমের তাফসীরে বলেছেন। (৩) অধিকন্তু আরবী ভাষায় 'রাকীম' (رقيم) শব্দের অর্থ মৌলিক বা রূপক কোনোভাবেই যখন গুহা হতে পারে না তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক (رقيم) 'রাকীম' শব্দ দ্বারা হাদীসে গারের তাফসীর করার বর্ণনা কিভাবে সঠিক হতে পারে; তা বরং রাকীমের ধারণা মাত্র। (৪) যদি একথা সহীহ রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে সুস্পষ্ট ভাষায় 'রাকীম' এর তাফসীর করেছেন তাহলে খ্যাতনামা অভিজ্ঞ তাফসীরকারগণের এ বিষয়ে নিজেদের চিন্তা প্রসূত বিভিন্ন উক্তি করা কিভাবে সম্ভব হতে পারে? এমনকি হাফেজ ইবনে হজর (র) নিজেও রেওয়ায়েতটির খেলাফ একথা বলার দুঃসাহস করতেন না যে, সঠিক ও নির্ভুল হলো আসহাবে কাহাফ ও আসহাবে রাকীম উভয়ই এক ও অভিন্ন। এ পর্যায়ে তিনি লিখেছেনঃ

وقال قوم اخبر الله عن قصة اصحاب الكهف ولم يخبر
عن قصة اصحاب الرقيم (قلت) وليس كذالك بل السياق
يقتضى ان اصحاب الكهف هم اصحاب الرقيم الخ (فتح ج ٦ ص ٣٩٥)

আর একদল বলেছেন—আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে আসহাবে কাহাফের ঘটনাতো শুনিয়েছেন, কিন্তু আসহাবে রাকীমের কথা শুনান নাই। (তাই আমি বলি-) এ ঘটনা সঠিক নয়। বরং আসহাবে কাহাফ ও আসহাবে রাকীম অভিন্ন হওয়াই আয়াতের পূর্বাপর অবস্থার দাবী।

(কাসাস, ৩য় খন্ড, ২৯২ পৃষ্ঠা)

ফলাফল

যারা একগুয়েমী রোগে আক্রান্ত নয়, দলীয় গোড়ামীর কারণে প্রতিপক্ষের সব কথাই বর্জণীয় এবং নিজ দলীয় সব কথাই করণীয় ও আকর্ষণীয় মনে করে না; বরং ইনসাফপ্রিয়, উদার, প্রতিপক্ষ, নিজপক্ষ সকলের কথা ন্যায়ের মানদন্ডে যাচাই-বাছাই করণে অভ্যস্ত তারা যদি মরহুম মাওলানা হিফজুর

www.pathagar.com

রহমান সাহেবের উধৃতিগুলো মনোযোগ সহকারে পাঠ করার চেষ্টা করে তাহলে নিম্নবর্ণিত কথাগুলো স্বচ্ছ হয়ে সামনে ধরা দিবেঃ

একঃ উপরোল্লেখিত বিতর্কিত মাসআলায় ইমাম বুখারী (র) আসহাবে কাহাফ ও আসহাবে রাকীম দু'টি ভিন্ন, স্বতন্ত্র সত্ত্বা ও ঘটনা হওয়ার যে মত প্রকাশ করেছেন তা মরহুম মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেবের মতে ভুল। তিনি যুক্তিগ্রাহ্য দলীলের ভিত্তিতে ইমাম বুখারী অনুসৃত মতের সমালোচনা করেছেন।

দুইঃ ইমাম বুখারী (র) তাঁর মতের স্বপক্ষে নোমান বিন বশীরের (রাঃ) রেওয়ায়েত দলীলরূপে পেশ করেছেন সেটাকেও হিফজুর রহমান (র) সাহেব ভুল বলেছেন। কেননা এই রেওয়ায়েতে শুধুমাত্র এতোটুকু অতিরিক্ত কথা আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'রাকীম' এবং 'আসহাবে কাহাফের' ঘটনা একসাথে উল্লেখ করেছেন। এরূপ কথায় আসহাবে কাহাফের ঘটনা আসহাবে রাকীমের ঘটনার জন্যে তাফসীর হওয়া অনিবার্য নয় কিংবা হুজুর তাফসীর হিসেবেই ঘটনা বর্ণনা করেছেন এমনও নয়।

তিনঃ নোমান বিন বশীর (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে 'রাকীম' এর কথা শুনেই সেটাকে আসহাবে কাহাফের তাফসীর মনে করাটা ছিল আসলে ভুল বুঝা। কেননা, তিনি তাফসীর স্বরূপ কখনো একথা বলেননি।

শিক্ষণীয় বিষয়

নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ইনসাফের ভিত্তিতে দয়া করে বলুন, এই বাক্যে ইমাম বুখারীর (র) সমালোচনা সুস্পষ্টভাবে হয়েছে কিনা? তদ্রুপ নোমান বিন বশীর (র) সাহাবীর প্রতি ভুল বুঝার সম্পৃক্তি এখানে পরিদৃষ্ট হচ্ছে কিনা? এখানে কি সুস্পষ্টভাবে বলা হয়নি যে, রাবী [নোমান বিন বশীর (রাঃ)] ভুলক্রমে হাদীসে গারের ঘটনাকে আসলে আসহাবে রাকীমের তাফসীর হিসেবে মূল্যায়ন করেন। অধিকন্তু আরো কি বলা হয়নি যে, এটা রাবীর [নোমান (রাঃ] কল্পনা প্রসূত উক্তি?

www.pathagar.com

অভিযোগকারী হুযুরানদের প্রতি একটি জিজ্ঞাসা

এখন মরহুম মাওলানা মওদূদী (র) সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগকারী হযরতগণের খেদমতে আমাদের সনির্বন্ধ আরজ হলোঃ

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ উপরোক্ত আয়াতে হযরত সুলাইমানের (আঃ) যে পরীক্ষামূলক ঘটনার প্রতি ইংগীত করা হয়েছে এবং আয়াতের তাফসীরে হযরত আবু হোরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত যে রেওয়ায়েতের কথা বলা হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে যদি মরহুম মওদূদী (র) সাহেব লিখেনঃ

"সম্ভবত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনি ইসরাঈলের অন্যান্য ভিত্তিহীন ঘটনাবলীর ন্যায় এ ঘটনাও উল্লেখ করে থাকবেন আর রাবী [আবু হোরাইরাহ (রাঃ)] ভুল বুঝলেন যে, সম্ভবত হুজুর (সাঃ) আয়াতের তাফসীর হিসাবে এ ঘটনার অবতারণা করছেন।"

তাহলে এ কথায় এবং মরহুম মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেবের উপরোল্লেখিত বাক্যাবলী ও তাঁর লেখার মধ্যে উল্লেখযোগ্য এমন কোন্ পাথক্য দেখা দিল? অনুরূপভাবে আবু হোরাইরার (রাঃ) রেওয়ায়েত সম্পর্কেও যদি মরহুম মাওলানা মওদূদী সাহেব লিখেনঃ

"এই রেওয়ায়েতে একথার উল্লেখ নেই যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়াতের তাফসীর স্বরূপ এই ঘটনারই বর্ণনা করেছেন।"

তাতে তিনি এমন কোন্ ভয়ানক অপরাধ করে বসলেন? এতে সাহাবীর অবজ্ঞাই বা কেমন করে হলো? যাতে তিনি গোমরাহ ও ফাসেক হওয়ার অনবরত ফতওয়া পেতে লাগলেন! আর জামায়াতে ইসলামীর সাহিত্য ভান্ডার বাজেয়াপ্ত করার জন্যে আলেমদের সভায় প্রস্তাব গ্রহণের ধারা বিরামহীন গতিতে চলতে লাগল?

ধরে নিলাম, ঘটনাটি যদি অমার্জণীয় অপরাধ হিসাবে সাব্যস্তই হয় এবং প্রকৃতপক্ষে সাহাবায়ে কিরামের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করার কারণে মরহুম মাওলানা মওদূদীর গর্দান উড়িয়ে দেয়ার যোগ্য বিবেচিত হয় তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের আরয, কবির ভাষায়ঃ این گناہیست کہ در شہر شما نیز کنند

(এ জাতীয় পাপের মহড়া তো আপনাদের দরবারেও অনুষ্ঠিত হয়!)

www.pathagar.com

হযরত দয়া করে আমাদের বুঝিয়ে দেয়া হোক, এরূপ অপরাধে কেবলমাত্র মরহুম মাওলানা মওদূদী (রঃ) সাহেব একাই জড়িত নন বরং আগের যমানার শীর্ষ পর্যায়ের বহু খ্যাতনামা আলেম, মুহাদ্দিস এরূপ অপরাধের সাথে জড়িত ছিলেন বলে লক্ষ্য করা যায়। আপনাদের মহলেরও উচ্চ স্তরের বুযর্গ ও প্রথম কাতারের আলেমগণও এরূপ অপরাধে জড়িত থাকার ব্যাপারে মরহুম মওদুদী সাহেবের সাথে সমভাবে শরীক। তাহলে তাদের সম্পর্কে আপনাদের মতো সুধীজনদের ফতওয়া কি হবে? তারা সকলেই কি আপনাদের এই ফতওয়ার বাণে ক্ষত-বিক্ষত হবেন না? বিশেষত মরহুম মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেব তো মরহুম মাওলানা মওদূদী সাহেবের ন্যায় সুস্পষ্ট ভাষায় 'একই অপরাধ করে বলে উঠলেনঃ "নোমান বিন বশীর (রাঃ) হাদীস শ্রবণ করা কিংবা তাৎপর্য বুঝার ব্যাপারে ভুল করেছেন।" সুতরাং আপনাদের ফতওয়ার তীরে তিনিও সরাসরি ঘায়েল হবেন! আপনারা তাঁকে এই আঘাত থেকে বাঁচাবার কোনো ব্যবস্থা করেছেন কি; করেননি? উপরন্তু অন্যান্য বুযর্গানে দ্বীনকে আপনাদের নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাত থেকে রক্ষা করার উপায়ই বা কি নেয়া হয়েছে?

পরিশেষে আপনাদের একথা উত্তমরূপে হৃদয়ংগম করে নেয়া উচিত যে, রাবীদের প্রতি হাদীস শ্রবণ কিংবা হাদীসের মর্ম বুঝার ব্যাপারে ভুল হওয়ার সম্পৃক্তিকে আজ পর্যন্ত কেউ গুনাহ বা গোমরাহ মনে করেনি। ভুল করার সম্পৃক্ত ব্যক্তি সাহাবী হোন কিংবা সাধারণ রাবী হোন তাতে কোনো পার্থক্য নেই। আপনাদের ন্যায় হযরতগণের পক্ষ থেকে এ কথার উপর গোমরাহ হওয়ার ফতওয়া একবার জারী করে দেয়া হলে উম্মতের খ্যাতিমান আলেম, প্রখ্যাত গবেষক, দূরদর্শী মুহাদ্দিস প্রমুখ বরণীয় ব্যক্তিবর্গও এথেকে নিস্তার পাওয়ার উপায় থাকবে না। অধিকন্তু এহেন সর্বনাশা ফতওয়া বাজীর নতুন অস্ত্র আপনাদের নিজ হাতে সে সকল লোকদের হাতে তুলে দেয়ার শামিল যাদের একমাত্র কাজ হলো সদা সর্বদা আমাদের প্রথম যুগের বুযর্গদের দুর্নাম রটানো আর কুৎসা গেয়ে বেড়ানো। অতএব, নিজেদের অতীত যুগের বুযর্গদের প্রতি অনুগ্রহ করতঃ এরূপ ফতওয়া দানে কিছুটা সাবধানতা অবলম্বন করাই উত্তম নয় কি?

সমাপ্ত

www.pathagar.com

আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১৫১৯১

বিক্রয় কেন্দ্র
৪৩৫/২-এ, বড় মগবাজার,
(ওয়ারলেস রেলগেট)
ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৩৯৪৪২

১০, আদর্শ পুস্তক বিপণী
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।

www.pathagar.com